ত্রি. পু. রা. র

লোকসংস্কৃতি
ও
অন্যান্য প্রসঙ্গ

নির্মল দাশ



অক্ষর পাবলিকেশনস্

প্রধান কার্যালয় ঃ জগন্নাথবাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা

কোলকাতা কার্যালয় ঃ ২৯/৩, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন

কলিকাতা - ১২

Tripura Loksonskriti O Annayanana Prasonga
(A Callection of Articles on Folk life
of Tripura by Sri Nirmal Das)

প্রথম প্রকাশ

জানুয়ারী ২০০০

প্রচ্ছদ

মনোজ ঘোষ

টাইপ সেটিং ও মুদ্রণ

ক্যাক্সটন প্রিন্টার্স, জগন্নাথবাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা

অক্ষর পাবলিকেশনস্-এর পক্ষে শুভব্রত দেব কর্তৃক জগন্নাথবাড়ী রোড, আগরতলা এবং
২৯/৩, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন কোলকাতা-১২ থেকে একযোগে প্রকাশিত।

আগরতলায় নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্র : অক্ষর সেলস্ কাউন্টার, প্যালেস কম্পাউন্ড প্রেস ক্লাব রোড,
আগরতলা, ত্রিপুরা

কলকাতায় প্রাপ্তিস্থান : ২৯/৩, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কোলকাতা-১২

উৎসর্গ

' যে আছে মাটির কাছাকাছি, তারি লাগি'. ..
কবি শ্রী অনিল সরকার
শ্রদ্ধাভাজনেষু।।

' সে করে গেয়েছি আমি তোমার কীর্তনে কৃতার্থ দোহার।'
ডক্টর রমেন্দ্র বর্মণ
পূজনীয়েসু।।

কথামুখ

বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে, মানুষের আবেগের ভাণ্ডার যেন ক্রমশঃ তলানীতে এসে মিশে যেতে বসেছে। মানুষের সংস্কৃতি-ভাবনা নিশ্চিত ভাবেই গতিপথ পরিবর্তনের দিকে পা' বাড়িয়েছে। মানুষ বহুকাল আগে থেকেই যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল একদিন স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে তুলেছিল, সেই লোক সংস্কৃতির বৃন্তেও স্বাভাবিক ভাবেই পরিবর্তনের ঢেউ লেগেছে। যুগ যুগ ধরে মানুষের এই অলিখিত সংস্কৃতিকে লেখ্য রূপ দেবার তথা রক্ষা করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বেশ কিছু আগে থেকেই। যদিও ত্রিপুরা রাজ্যে এ-বিষয়ে তেমন কোন জোরদার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়না। তবু যারা একক প্রয়াসী, হাতে গুনে তাঁদের কথা বলা যায়। এমন একদিন হয়তো আসবে, যেদিন জাতি, পরিচয় সংকটের মুখোমুখি উপনীতহবে। লোকসংস্কৃতির উপাদান সেদিন জাতিকে এই সংকট থেকে ত্রান করতে পারে।

ত্রিপুরা রাজ্যে লোক সংস্কৃতিচর্চার কোন ব্যাপক প্রয়াস অথবা লোকসংস্কৃতি বিষয়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা এখানে করা হয়েছে এমন দাবী কখনোই সঙ্গত নয়। তিনটি বিষয় সূচীতে ভাগ করে লোকসংস্কৃতির খণ্ডিত আলোচনা এখানে করা হয়েছে মাত্র। প্রসঙ্গতঃ এখানে মুদ্রিত বিভিন্ন প্রবন্ধ বিভিন্ন সময়ে ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত সাময়িকী 'গোমতী' ও 'দৈনিক জনপদ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে সেগুলি সংকলিত করে প্রকাশ করা হয়েছে।

এই গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডক্টর রমেন্দ্র বর্মণ সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করেছেন। 'অক্ষর' পাবলিকেশনস্ -এর কর্ণধার শ্রী শুভব্রত দেবের সঙ্গে তিনিই কথাবার্তা বলেছেন। আমার শিক্ষক ড° বর্মণের কাছে আমি যেমন কৃতজ্ঞ, তেমনি শ্রীযুক্ত দেবের কাছেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমার শিক্ষক অধ্যাপক ডক্টর সনৎ কুমার মিত্রের সঙ্গেও গ্রন্থটির বিভিন্ন প্রবন্ধ সম্পর্কে নিয়মিত পরামর্শ গ্রহণ করেছি। ডক্টর মিত্রের সুপরামর্শ ও আশীর্বাদ গ্রন্থ রচনার কাজে প্রেরণা জুগিয়েছে। তিনি গ্রন্থটির ভূমিকা লিখে দেবার জন্য সম্মতি প্রকাশ করলেও-কলকাতা বইমেলাকে সামনে রেখে বই প্রকাশের দ্রুততার জন্য ভূমিকাটি সংগ্রহ করা শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি—এ খেদ রইল।

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ দত্ত তাঁর সুপরামর্শ যেমন আমাকে প্রদান করেছেন, তেমনি প্রবন্ধের জন্য বিভিন্ন তথ্য তাঁর গবেষণা গার থেকে সংগ্রহ করেছি। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। রাজ্যের মন্ত্রী কবি অনিল সরকার জানিয়েছিলেন, 'মানুষের আইডেনটিটি' রক্ষার জন্য এ সংগ্রামকে অবশ্যই এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে— তাঁর এই বক্তব্য এগোবার পথে আমাকে প্রেরণা দিয়েছে। 'অক্ষর' এর কর্মীরা, যারা দিন রাত শ্রম করে এ বই তৈরীর কাজটি সম্পন্ন করলেন, প্রচ্ছদ শিল্পি মনোজ ঘোষ, যিনি সযত্নেও অসীম মমতায় প্রচ্ছদ আঁকলেন। তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ছোট করব না। শ্রীমতি দেবারতি ও শ্রীমান সৌতিক আমার কাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করে, আমাকে, ব্যস্ততার সময়, খেলার সাথি হতে আমন্ত্রন জানায়নি। তাছাড়া বর্ণার সাহায্যের কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এ গ্রন্থ সুধী সমাজে সমাদৃত হলে, তথা আগামী প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করলে, প্রচেষ্টা সার্থক হবে বলে মনে করবো।

নির্মল দাশ

সূচীপত্র

"লোকসংস্কৃতিচর্চার রূপরেখা ঃ বহির্বিশ্বে ও ত্রিপুরায়"

লোকসংস্কৃতি দেশ কালের গন্ডীতে সীমাবদ্ধ কোন বিষয় নয়, আবার লোকসংস্কৃতির স্বতন্ত্র্য বিদ্যাশৃঙ্খলায় ভূষিত হবার সময়সীমাও খুব দীর্ঘ নয়। পন্ডিতেরা বিষয়টির নামকরণকে তেমন গুরুত্ব না দিয়েই এর চর্চার দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন। মুখে মুখে চলেছে অথচ লিখিত হয়নি, আবার যা হারিয়ে যাবার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, সংস্কৃতির এমন ধারাকে যতখানি সম্ভব রক্ষা করার দিকে তাঁরা মনোনিবেশ করলেন। এভাবেই লোকসংস্কৃতি চর্চার গোড়াপত্তন ঘটল। সংগ্রাহকেরা প্রথমে সংগ্রহের কাজ শুরু করলেন। তারপর এসব সংগ্রহকে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে রূপদানের বিষয়টি এসে গেল। ক্রমে ক্রমে লোকসংস্কৃতি যখন একটা বিশেষ বিদ্যার বা ধারাবদ্ধ জ্ঞানের আকৃতি পাচ্ছে তখন এই বিষয়টির বিবিধ জিজ্ঞাসা, তথ্যসংগ্রহ অনুসন্ধান প্রভৃতির নামকরণ হয়ে যায় Folklore। কালে কালে তথ্যানুসন্ধান, সংগ্রহ ও গবেষণার কাজে গতি এসেছে। শুধু তাই নয়, লোকসংস্কৃতি যে একটি পৃথক বিদ্যাশৃঙ্খলা, এ বিষয়েও পন্ডিতরা একমত হয়েছেন। পন্ডিতদের অনেকেই মত প্রকাশ করেছেন যে, লোকসংস্কৃতির বিবিধ উপকরণের মূল শেকড়টি রয়েছে আমাদেরই দেশে। গবেষকেরা লোকসংস্কৃতি আলোচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন জ্ঞাতিবিদ্যাকে কাজে লাগিয়েছেন। সেগুলো হল — নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, সাহিত্য, নন্দনতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি। কিন্তু সবগুলি জ্ঞাতিবিদ্যার কেন্দ্রবিন্দুতে লোকসংস্কৃতির অবস্থান। উল্লিখিত জ্ঞাতিবিদ্যার সঙ্গে লোকসংস্কৃতির সম্পর্ক রয়েছে, কিন্তু লোকসংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। লোক-সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে ফিনল্যান্ড দেশটি পথিকৃতের কাজ করেছে। ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাঁরা প্রবন্ধ, ধাঁধা, লোকসঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়ের উপর বই প্রকাশ করেছেন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা 'ফিনিশ লিটারারী সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেছেন। লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহের জন্য তাঁরা ব্যাপক কর্মসূচীও নিয়েছেন। লোকসংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ ও ঐ দেশের গবেষকদের প্রচেষ্টার ফলে ঐ দেশের অর্থাৎ ফিনল্যান্ডের লোকসংস্কৃতি সংস্থা বিশ্বের লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানীদের কাছে তীর্থভূমিরূপে পরিগণিত হয়েছে।

ভারতীয় উপমহাদেশ লোকসংস্কৃতির উপকরণে সমৃদ্ধ এবং লোকসংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে বহির্বিশ্বের সঙ্গে সুপ্রাচীন কাল থেকেই এ দেশের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। অথচ আমাদের দেশে লোকসংস্কৃতিচর্চা তথা লোক ঐতিহ্য ধরে রাখার বিজ্ঞানসম্মত প্রয়াস বেশীদিনের নয়। ইংরেজরা ভারতে আসার পর, এদেশে লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তার বিশ্লেষণে গতি পরিলক্ষিত হয়। লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ ও সম্পাদনার পর সেগুলি প্রকাশিত হতে থাকে। তারা এদেশে শাসন করার স্বার্থে তথা কিছু পন্ডিত ব্যক্তির আগ্রহে লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহের কাজ শুরু হয়। সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদনার কাজও চলতে থাকে। সে সময় এশিয়াটিক সোসাইটি, সাহিত্য পরিষদ ইত্যাদি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে কেন্দ্র করে এসব কাজ চলছিল। তাছাড়া, সেসময়, তথা প্রাক্-স্বাধীনতাপর্বে লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী চেতনা যুক্ত হয়ে যায়। তখন বুদ্ধিজীবীরা

মনে করেছিলেন, দেশের ঐতিহ্য ও লোকমানসের ইতিহাস সংগ্রহ, বিশ্লেষণ না করলে স্বাধীনতা সম্পর্কে দেশবাসীর উপলব্ধিতে ঘাটতি থেকে যাবে। স্বাধীনতার পর দেশের বিভিন্ন পাঠ্যসূচীতে লোকসংস্কৃতিকে পঠন পাঠনের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়। এর ফলে উপাদান সংগ্রহ বা চর্চার ব্যাপক প্রসার ঘটতে থাকে। তাছাড়াও রয়েছে সংগঠনহীন লোকসংস্কৃতি বা ফোকলোর বিষয়ক সাময়িকী বা পত্রিকাগুলির অবদান। লোকসংস্কৃতি আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে কিছু সংগঠন ও পত্রপত্রিকা এবং শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক (Educational Discipline) কাজ করে যাচ্ছে।

প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এর ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ বিষয়ে সে দেশ আশাতীত সাফল্যও অর্জন করেছে। বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতিবিদ্দের কর্মতৎপরতা অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। এখানে কয়েকটি সংস্থা ও মহাপরিচালকদের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

সংস্থার নাম	মহাপরিচালক	স্থান/জেলা	মুখপত্র
১) বাঙলাদেশ ফোকলোর পরিষদ	ডঃ আসরাফ সিদ্দিকী	সদর/ঢাকা	লৌকিক বাংলা
২) বাঙলা একাডেমী/ফোকলোর বিভাগ	—	সদর/ঢাকা	লোকসাহিত্য
৩) ফোকলোর রিসার্চ ইনস্‌টিটিউট	ডঃ আনোয়ারুল করিম	কুষ্ঠিয়া	লোক ঐতিহ্য/ ফোকলোর (ইং)
৪) লালন একাডেমী	ডঃ আনোয়ারুল করিম	ঈশ্বরদী/ কুষ্ঠিয়া	—
৫) বাঙলাদেশ ফোক মিউজিক রিসার্চ কাউন্সিল	মোস্তাফা জামান আব্বাসী	সদর/ঢাকা	—

এছাড়াও রয়েছেন ডঃ শহীদুল্লাহ, ডঃ এনামুল হক, এস. এম. লুৎফর রহমান প্রমুখ। বাংলাদেশে এরূপ বহু সংস্থা ও লোকসংস্কৃতিবিদ্ রয়েছেন যারা সেখানকার লোকসংস্কৃতি চর্চাকে গতিদান করেছেন।

আমাদের দেশেও সরকারীভাবে পরিচালিত ও বেসরকারী বহু লোকসংস্কৃতি গবেষণা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সেসব প্রতিষ্ঠানগুলির কর্ণধার হলেন এক,— একজন বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদ্। তার একটি খণ্ডিত তালিকা নিম্নরূপ :

সংস্থার নাম	মহাপরিচালক	স্থান
গুজরাট ফোকলোর কমিটি	—	আমেদাবাদ
দি এথনোগ্রাফি এন্ড ফোক কালচারাল সোসাইটি	—	লখনৌ
অল-ইন্ডিয়া ফোক কালচার রিসার্চ ইনসটিটিউট	—	এলাহাবাদ
মহারাষ্ট্র ফোকলোর কমিটি	—	পুনে/মহারাষ্ট্র
ফোকলোর মিউজিয়াম	—	মহীশূর
সেন্ট্রাল ইনসটিটিউট অফ ইন্ডিয়ান লেঙ্গুয়েজেস্	ডঃ জহরলাল হান্ডু	মহীশূর
ইন্ডিয়ান ফোক কালচার রিসার্চ ইনস্টিটিউট	ডঃ ডি কে উপাধ্যায়	বেনারসী
রাজস্থান সেন্টার অব ফোকলোর	ডঃ কোমাল কোঠারী	রাজস্থান
কেরল ফোকলোর একাডেমী	ডঃ চোমার চন্ডাল	ত্রিচুর
লোকবার্তা পরিষদ	ডঃ বাসুদেব করন আগরওয়াল	তিকামগড়/ মধ্যপ্রদেশ

পশ্চিমবঙ্গেও লোকসংস্কৃতিচর্চা একটি ভিন্নমাত্রা লাভ করেছে। সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাগুলি লোকসংস্কৃতির গবেষণায় ব্যাপক খ্যাতি ও পরিচিতি লাভ করেছে। কোন কোন লোকসংস্কৃতিবিদ্ প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা লাভ করেছেন। তাঁদের গবেষণা ও লোকসংস্কৃতি সমৃদ্ধ কর্মপ্রক্রিয়া আন্তর্জাতিক স্তরে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃতি লাভ করেছে। লোকসংস্কৃতি গবেষক-পন্ডিতদের একটি তালিকা এরূপ ঃ ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত, ডঃ সনৎকুমার মিত্র, ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত, ডঃ দিব্যজ্যোতি মজুমদার, ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক, ডঃ নির্মলেন্দু চৌধুরী, ডঃ বরুণ কুমার চক্রবর্তী, ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ সুধীর করণ, ডঃ সুধীর চক্রবর্তী, ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী, ডঃ মিহির কামিল্যা চৌধুরী, ডঃ আশিষ বসু, ডঃ কানন বিহারী গোস্বামী, ডঃ করুণাসিন্ধু দাস, ডঃ চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত, ডঃ চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ জয়শ্রী ভট্টাচার্য, ডঃ অরুণ কুমার বসু, ডঃ তারাপদ সাঁতরা, ডঃ তিমির বরণ চক্রবর্তী, ডঃ দীনেন্দ্র কুমার সরকার, ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, ডঃ নরেন্দু সেন, ডঃ প্রদ্যোৎ ঘোষ, ডঃ প্রবোধ কুমার ভৌমিক, ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী, ডঃ বিজন কুমার মন্ডল, বিনয় মাহাত, ডঃ রেবতীমোহন সরকার, ডঃ মানস মজুমদার, ডঃ মুহম্মদ আয়ুব হোসেন, ডঃ মৃত্যুঞ্জয় গুঁই, ডঃ শীলা বসাক, ডঃ দুলাল চৌধুরী, ডঃ শেখ মকবুল ইস্লাম, ডঃ সুহৃদকুমার ভৌমিক, ডঃ সৌমিত্র বসু, ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী, ডঃ হোসেন আলমগীর, গোপেন্দ্র নাথ বসু, ডঃ অমলেন্দু ভট্টাচার্য (আসাম), শিবতপন বসু (আসাম) প্রমুখ। বলা

বাহুল্য এ তালিকা নিতান্ত অসম্পূর্ণ। তাঁদের অনেকেই এক একটি লোকসংস্কৃতি-প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার। একটি খণ্ডিত তালিকা নিম্নরূপ ঃ

সংস্থার নাম	মহাপরিচালক	স্থান	মুখপত্র
লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ	ডঃ সনৎ কুমার মিত্র	বেহালা/ কলকাতা	লোকসংস্কৃতি গবেষণা Folklore Research Journal
ফোকলোর ইনস্টিটিউট	ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়	কলকাতা	
আকাডেমি অব ফোকলোর	ডঃ দুলাল চৌধুরী	গড়িয়াহাট কলকাতা	লোকসংস্কৃতি
বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি পরিষদ	শৈলেন দাস	মেদিনীপুর	বাকুড়া লোকসংস্কৃতি পরিষদ
লোকায়ত লোকসংস্কৃতি পরিষদ	সুধীর বেরা	মেদিনীপুর	লোকায়ত
মালদহ লোকসংস্কৃতি	ডঃ ফনী পাল	মালদহ	অন্বয়
লোকবিজ্ঞান প্রসার সমিতি	ডঃ অমিত হালদার	২৪-পরাগণা	লোকবিজ্ঞান
উত্তরবঙ্গ লোকযান	শিশির মজুমদার	কৃষ্ণবাটি/পঃ দিনাজপুর	উত্তরবঙ্গ লোকযান সংবাদ

আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে লোকসংস্কৃতিচর্চা সম্পর্কে এবার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যেতে পারে। এই রাজ্যে ভৌগোলিক অবস্থান এমনই যে, এর তিনদিকে রয়েছে বাংলাদেশ। আর একটি মাত্র সড়কপথ ভারতভূমির মূল ভূখন্ডের সঙ্গে সংযোগ সেতুর কাজ করছে। যার ফলে প্রায় বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত এই রাজ্যের মানুষ বাস করছে। আবার দু'টি ভাষা, গোষ্ঠীর মানুষের বাসভূমি এই রাজ্যটি। যার ফলে এই প্রায়-বিচ্ছিন্ন রাজ্যটিতে শিষ্ঠ সংস্কৃতির নিজস্ব একটি ভুবন যেমন গড়ে উঠেছে, তেমনি বিভিন্ন দিক থেকেই রাজ্যটি স্বতন্ত্র্য। রাজ্যটিতে রাজ পরিবারকে কেন্দ্র করে একসময় সাহিত্যচর্চার গোড়াপত্তন হয়েছিল। তারপর একসময় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাদস্পর্শে ধন্য ত্রিপুরায় সাহিত্যচর্চায় জোয়ার এসেছিল। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে তথা পশ্চিমবঙ্গে যখন জনজীবনের অলিখিত সংস্কৃতিকে তুলে ধরার কর্মপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, তখন-এর ঢেউ এই রাজ্যকে স্পর্শ করেনি। মঙ্গলকাব্যের আদলে তখন এই রাজ্যে রচিত হচ্ছিল রাজাদের ইতিহাস। প্রথমে রাজাদের বংশানুক্রমিক ইতিহাস ও তারপর এক একজন রাজা বা শাসকের ইতিহাস যখন রচিত হয়ে চলছিল, তখনই অকস্মাৎ ত্রিপুরার সাহিত্যচর্চায় গতিপথ ভিন্নমুখী হয়। লক্ষনীয় হল, লোকসংস্কৃতি চর্চা কিন্তু সেসময় অবহেলিত হয়েছে। পরবর্তী সময়েও এই ভাবনা চিন্তা থেকে সামান্য ঘুরে দাঁড়িয়ে বৃহত্তর লোকজীবনের

সংস্কৃতিকে তুলে আনা, সংরক্ষণ করা গ্রন্থভুক্ত করার দিকে কেউ সচেতনভাবে প্রয়াসী হননি।

ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিপুরী এবং বাঙ্গালী জাতিগোষ্ঠীর মানুষ সুদীর্ঘকাল ধরে পাশাপাশি বসবাস করে আসছে। একসময় উপজাতি লোকসংস্কৃতিকে জানার আগ্রহ জাগল। সেই আগ্রহ থেকেই গবেষকেরা যেমন উৎসুক হলেন তেমনি, কেউ কেউ উপজাতিদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগাবার জন্য তাদের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার প্রয়োজন ও অনুভব করলেন। কিন্তু, ত্রিপুরার মাটিতে বসবাসকারী বাংলা ভাষা-ভাষী মানুষদের লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে কেউ আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। যদিও বৃহৎ জনগোষ্ঠীর অলিখিত সংস্কৃতি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয়েছে একথাও বলা ঠিক নয়।

ত্রিপুরা রাজ্যকে "বাংলা সাহিত্যচর্চার তৃতীয় ভুবন" বলা হচ্ছে আজকাল। এই তৃতীয় ভুবনে লোকসংস্কৃতিচর্চা কোন গতিতে এগোচ্ছে এবং বর্তমানে তা কোন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই পর্ব নির্ণয়ের প্রয়োজন রয়েছে।

ক্রমাঙ্ক	পর্ব নির্ণয়	কাল নির্ণয়	পর্ব পরিচিতি
প্রথম	সূচনাপর্ব	১৪৫৮ খ্রীঃ	রাজন্য আমল পর্ব
দ্বিতীয়	স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা পর্ব	১৯৪৭ খ্রীঃ— ১৯৮০ খ্রীঃ	ক) পত্রিকা ও সাময়িকী খ) উপজাতি গবেষণাধিকার
তৃতীয়	নবজাগৃতি পর্ব	১৯৮১ খ্রীঃ— বর্তমান কাল	ত্রিপুরার বইমেলা

ত্রিপুরায় সবচেয়ে প্রাচীন যে পুঁথিটির কথা পন্ডিতেরা বলে থাকেন, সেটি হল, ত্রিপুরার রাজাদের ও রাজত্বকালের ইতিহাস 'রাজমালা'। ত্রিপুরার রাজা ধর্মমানিক্যের (১৪৫৮ খ্রীঃ-১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দে) রাজত্বকালে সংস্কৃত ভাষায় এই রাজমালা রচিত হয়েছিল। যদিও এটির কোন অস্তিত্ব নেই, তবু বিভিন্ন কারণে পন্ডিতেরা এর অস্তিত্বের প্রমাণ পেয়েছেন। সুতরাং ত্রিপুরা রাজ্যে লোকসংস্কৃতি চর্চার আদিযুগ তথা সূচনাপর্ব এখান থেকে চিহ্নিত করতে হবে। এরপর ত্রিপুরায় নিরবচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন রাজা শাসন কার্য চালিয়েছেন। ভারতের স্বাধীনতাকাল পর্যন্ত তাতে কোন বাধা পড়েনি। সুতরাং এই সুদীর্ঘ কাল প্রবাহকে 'সূচনাপর্ব' রূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় পর্বটিকে "স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার পর্ব" রূপে চিহ্নিত করা যায়। রাজন্য বর্গের শাসনকাল যখন কালের গতিকে সমাপ্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন উপজাতি জনজীবনে একদল যুবক স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগ্রাম শুরু করেন। পাশাপাশি, রাজ্যে তখন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী প্রকাশিত হতে শুরু করে। একদিকে, উপজাতিদের সংস্কৃতিকে তুলে ধরার একটা প্রবণতা যেমন পরিলক্ষিত হয়, তেমনি রাজন্যবর্গের সংস্কৃতি চর্চার বাইরে একটি সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল গড়ে তোলার দায়িত্ব পত্র-পত্রিকাও সাময়িকীগুলি তুলে ধরার উদ্যোগ

গ্রহণ করে। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষাদপ্তরও বৃহত্তর জনমন্ডলীর লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতিকে পুস্তকাকারে প্রকাশের একটা দায়িত্ব সম্পাদনে ব্রতী হয়। উনিশ শতকের সাতের দশকে এই দায়িত্বের বৃহৎ অংশ অর্পণ করা হয় 'ত্রিপুরা স্টেট ট্রাইবেল কালচার‍্যাল রিসার্চ ইনসটিটিউট এন্ড মিউজিয়ম উর্দ্ধকর্মাকে। এই প্রতিষ্ঠান ত্রিপুরার উপজাতি লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরতে শুরু করে।

এই রাজ্যে ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বইমেলার আয়োজন করা হয়েছিল। বইমেলার সার্বিক দায়িত্ব পালন করেছিল ত্রিপুরা রাজ্য সরকার। আজ পর্যন্ত সরকারই এই দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। বইমেলার ফলে ত্রিপুরাকে বিষয় করে বই রচিত হচ্ছে। এর মধ্যে 'লোকসংস্কৃতি'ও গুরুত্ব পাচ্ছে।

'সূচনাপর্বে' ত্রিপুরার রাজ আমলে রচিত কয়েকটি গ্রন্থের নামোল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু 'লোকসংস্কৃতি' বিষয়টির দিকে লক্ষ্য রেখে এসব গ্রন্থ যে রচিত হয়নি, তা বলাই বাহুল্য। বাংলায় রচিত 'রাজমালা' অনুরূপ একটি গ্রন্থ। সে গ্রন্থটি সম্পর্কে গবেষকদের ধারণা এই যে, রাজমালা -কাহিনী লোক মুখে অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছিল দীর্ঘকাল। কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত মহাশয় রাজমালার সুদীর্ঘ ভূমিকা রচনা করেছেন। তিনি এই ভূমিকায়, উপজাতি লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ছয়খন্ড রাজমালার কথা বলা হলেও এগুলোর কোন খন্ডই বর্তমানে পাওয়া সহজসাধ্য নয়। রাজমালায় লোক-উপাদান সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ রয়েছে।

রাজমালার পর রচিত গ্রন্থটি হল 'কৃষ্ণমালা'। জয়ন্ত চন্তাই'র বক্তব্য শুনে পন্ডিত রামগঙ্গা শর্মা, কৃষ্ণমানিক্যের, জীবন কাহিনী রচনা করেছিলেন। রচয়িতা, ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে মঙ্গলকাব্যের রচনাশৈলী অবলম্বন করেছেন। ইতিহাস অনেকসময় গতি হারিয়ে লোকজীবনের বৃত্তে প্রবেশ করেছে। কবি "মঙ্গলাচরণ" দিয়ে গ্রন্থ সূচনা করেছেন। বহু লোক - উপকরণ এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এটি একাধারে যেমন ইতিহাস, তেমনি কাব্যগুণও রয়েছে এর। আবার এর অভ্যন্তরে রয়েছে বহু লোক-উপকরণ, যাকে কোনমতেই অবহেলা করা যায় না।

'সমসের গাজী' একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি, যিনি একসময় ত্রিপুরা রাজ্য অধিকার করে রাজ্যপাট চালিয়েছিলেন। শেখ মনুহর সমসের গাজীর জীবনী অবলম্বন করে 'গাজীনামা' গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। এখানে কাব্য রচনায় মঙ্গলকাব্যের আদল যেমন গৃহীত হয়েছে, তেমনি এর অভ্যন্তরে লোক উপাদানেরও অভাব নেই। এখানে সমসের গাজীর স্বপ্নদর্শন, দেবীর কৃপালাভ প্রভৃতি অলৌকিক বিষয় স্থান লাভ করেছে।

কবি মহদ্দিন রচিত "চম্পক বিজয়" ত্রিপুরার রাজ-ইতিহাসের অন্যতম উপাদান। এই কাব্যে মীরখাঁর সহায়তায় চম্পকরায়-এর ত্রিপুরা রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা পাওয়া এবং রত্নমাণিক্যের রাজ্য ফিরে পাবার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। মঙ্গলকাব্যের ঢংএ রচিত কাব্যটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বহু লোক উপাদান। অনুরূপ অন্য একটি গ্রন্থ হল 'শ্রেণীমালা'। এটিকে রাজাদের কুলজি

গ্রন্থ বলা হয়েছে। এরকম আরো কিছু গ্রন্থাদি রয়েছে। যেগুলি রাজ আমলে, বিভিন্ন সময়ে রচিত হয়েছে। যেগুলি ইতিহাসের দিকটিকে আলোকিত করলেও লোকজীবনের কৃষ্টিচর্চা অবলম্বন করার বিষয়টি দুর্লক্ষ্য নয়।

ত্রিপুরার রাজন্য যুগ তখনো শেষ হয়নি, এরই মধ্যে ত্রিপুরার উপজাতি জনজীবনে ক্রমে ক্রমে গণমুক্তি পরিষদের আন্দোলন প্রভাব বিস্তার করে চলেছিল। আন্দোলনকারীরা অনুভব করেছিলেন, উপজাতিদের জীবনচর্যা ও লোকসংস্কৃতি প্রায় অন্ধকারে ঢাকা পড়ে রয়েছে। আন্দোলনকে রূপ দেবার সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁরা সে জীবন ও সংস্কৃতির শরীক হয়ে গেলেন। সে প্রয়াসের মুখবন্ধ রচনা করলেন বীরেন দত্ত। ১৯৪০ সালের পর অনতিকালের মধ্যে তিনি যে কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করলেন, সেগুলির বিষয় লোকসংস্কৃতি। এ বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধগুলি যথাক্রমে - ত্রিপুরা রাজ্যের লোকসংস্কৃতি, ত্রিপুরার লোককথা ও লোকসঙ্গীত, জুমচাষের গল্প, বাউল ও ভাটিয়ালী। এছাড়াও সুধন্ব দেববর্মা এ সময়কালের একজন অন্যতম লেখক। উক্ত আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকেও তিনি লোকজীবনের উপকরণ কাজে লাগিয়ে 'হাচুক খুরিঅ' উপন্যাসটি রচনা করেছেন। মহেন্দ্র দেববর্মা নিজে একজন লোকসঙ্গীত শিল্পী ছিলেন। নিজে যেমন গান রচনা ও সুরারোপ করেছেন, তেমনি লোকজীবনের প্রচলিত সঙ্গীতকে জনসমক্ষে তুলে এনেছেন। তাছাড়া লোক সংস্কৃতির সহায়ক জ্ঞাতিবিদ্যা ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কেও তিনি আগ্রহী ছিলেন। তিনি উপজাতি লোকসংস্কৃতি বিষয়ে প্রবন্ধও রচনা করেছেন। যেমন—'ত্রিপুরী লোকসঙ্গীত ও নৃত্য', ত্রিপুরী লোকসঙ্গীত। নৃতত্ত্বের ভিত্তি রচিত তাঁর প্রবন্ধ ঃ আদিম মানবের বংশধর ত্রিপুরা উপজাতি । এই সময়ের কিছু আগেই ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হতে শুরু করে। সেখানে বিভিন্ন লেখক-গবেষক লোকসংস্কৃতি বিষয়ে তথা লোকসংস্কৃতি পাঠে সহায়ক অন্যান্য জ্ঞাতিবিদ্যা বিষয়ে বিভিন্ন মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে। ১৩৩৪ ত্রিপুরাব্দের (১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের) পৌষ সংখ্যার বিখ্যাত 'রবি' পত্রিকায় দীনেশ চন্দ্র সেনের "গীতাবলী"র 'কাঞ্চনমালা' প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩৩৮ ত্রিপুরাব্দে বরদারঞ্জন চক্রবর্তী লিখেছিলেন ত্রিপুরার দেওয়ান সাধক কবি রামদুলাল ও কবি রামপ্রসাদের তুলনামূলক একটি আলোচনা। ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্মার "ত্রিপুরার মঠ ও মন্দির" নামে ত্রিপুরার স্থাপত্য শিল্প বিষয়ক একটি প্রবন্ধ 'রবি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্তও এই পত্রিকায় প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। ১৩৩৮ ত্রিপুরাব্দে 'রবি'র পৃষ্ঠায় ত্রিপুরীদের লোকাচার সমৃদ্ধ "ত্রিপুরায় হসমৃভোজন" প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল। একই বছর 'রবি'র পৌষ সংখ্যায় তাঁর অন্য প্রবন্ধ 'ত্রিপুরায় সতীদাহ' প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩৩৪ ত্রিপুরাব্দে 'রবি'র পৃষ্ঠায় নিরূপমা দেবী একটি লোককাহিনী, "অজগর সাপের গল্প" লিখেছেন। গোলাপফুল দেবী লিখেছেন "সিপিংতুই মাইরুংতুই" লোককাহিনীটি। বিপিন চন্দ্র দেববর্মা লিখেছেন "আকু জোয়ান খাঁ" লোককাহিনীটি। "সিপিংতুই মাইরুতুই" লোককাহিনীটির অনুরূপ একটি লোককাহিনী প্রচলিত আছে মণিপুরী লোকসমাজে। বিপিনচন্দ্র দেববর্মা একটি লোককাহিনী মণিপুরী অনুবাদ তুলে ধরলেন 'মারেম্বি চায়শ্রা' শীর্ষনামে। ১৩৩৮ ত্রিপুরাব্দের পৌষের 'রবি'র পৃষ্ঠায় এই লেখক লিখেছেন "ত্রিপুর পৌরণিক কথা"। এটি হল চৌদ্দ দেবতার কাহিনী। ১৩৪০ ত্রিপুরাব্দের

চৈত্রমাসে 'রবি' পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। ১৩৪২ ত্রিপুরাব্দে হোলিীরা ফাগের লোক উৎসবকে কেন্দ্র করে নতুন একটি পত্রিকা ''ত্রিপুরা'' 'ফাগুয়া সংখ্যা' নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

ত্রিপুরা রাজ্য থেকে প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকা ও দৈনিক - সাপ্তাহিক ইত্যাদির পত্রিকার সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। সেগুলি কম-বেশী লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে একটি সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল, সন্দেহ নেই। দৈনিক থেকে বার্ষিক ১৮৭৬ খ্রীঃ থেকে ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত এরূপ পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীর সংখ্যা ৩৮৯টি। সুতরাং এর সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা এখানে অসম্ভব। তবে বর্তমানে দৈনিক পত্রিকাগুলির মধ্যে ত্রিপুরা দর্পণ, সান্দন, দৈনিক সংবাদ প্রভৃতির 'রবিবাসরীয়' প্রায়ই লোকসংস্কৃতি বিষয়ে তথ্য ও ক্ষেত্র সমীক্ষায় সমৃদ্ধ লেখায় পূর্ণ থাকে। সাময়িকীগুলির মধ্যে লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে 'গোমতী'র ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমন্ডিত। 'গোমতী' প্রথম ১৯৫৮ খ্রীঃ সুরেশ কুমার সিংহের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে এটি পুনরায় প্রকাশিত হতে থাকে। সেসময় সম্পাদক ছিলেন কৃষ্ণপদ দত্ত, গুরুপদ সাও ও সহ সম্পাদক ছিলেন অজয় রায়। এরপর কিছু সময় স্বপন সেন এর সম্পাদনা করেন। পরে কল্যাণ গুপ্তের সম্পাদনাকালে গোমতীর পৃষ্ঠায় লোকসংস্কৃতি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করতে থাকে। সতের - আঠার বছর ধরে তিনি এর সম্পাদনা করছেন এবং এখনও এই দায়িত্বে রয়েছেন। বিভিন্ন সময় গোমতীর পৃষ্ঠায় যারা প্রবন্ধ রচনা করেছেন তাদের নাম ও প্রবন্ধগুলি নিম্নরূপ ঃ জগদীশ গণচৌধুরীর ত্রিপুরার ককবরক ধাঁধা 'ত্রিপুরার লৌকিক দেবদেবী, ত্রিপুরার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে হিন্দু বিবাহের স্ত্রী আচার ও ধবলকৃষ্ণ দেববর্মণের ত্রিপুরার মিশ্র সংস্কৃতি, ত্রিপুরার লোকশিল্প, ডঃ কার্তিক লাহিড়ীর ত্রিপুরার পুতুল নাচ ঃ একটি সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা, ডঃ শিশির কুমার সিংহ ও জগদীশ গণচৌধুরীর গাজন এবং চড়কের উৎসব ও গান, দুলাল চক্রবর্তীর ছড়িয়ে ছড়া অঙ্গণে, দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্তের গোমতী ও ডুম্বুর পুরান, কমলকুমার সিংহের ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির আলোকে ত্রিপুরার আদিবাসী সম্প্রদায়, দুলাল চৌধুরীর চাকমা সমাজে বিবাহ বৈচিত্র্য, প্রবাদের বিচিত্রলোকে, সুরেন দেববর্মণের ত্রিপুরার কারু ও চারুশিল্পচর্চা, ত্রিপুরা ও পূর্বোত্তর গারো উপজাতি জীবন, রিয়াংদের কথা, ত্রিপুরা ও ত্রিপুরা দ্বিভূজা দুর্গাপূজা ও অন্যান্য উৎসব, আদিবাসী জীবন, হালামদের ইতিবৃত্ত, লুসাই ঃ পার্বতী ত্রিপুরার উপজাতি জীবন, লোকায়ত জীবনের সংস্কৃতিচর্চা প্রসঙ্গে, রমাপ্রসাদ দত্তের ত্রিপুরা উপজাতি লোকসঙ্গীত, ত্রিপুরার বৈশাখী মেলা, লৌকিক দেবী মনসা ও রমাপ্রসাদ দত্তের ত্রিপুরা উপজাতি লোকসঙ্গীত, ত্রিপুরার বৈশাখী মেলা, লৌকিক দেবী মনসা ও মনসামঙ্গল লোককাব্য, ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন তথ্যে হাতি প্রসঙ্গ, ত্রিপুরার উপজাতি রূপকথাও সামাজিক মূল্যায়ন, নির্ঝরিণী দেবরায়ের ত্রিপুরার লোকসংস্কৃতির বিচিত্রধারা, নিরঞ্জন চাকমার বিবর্তনের আলোকে চাকমাদের বিঝু উৎসব ও চাকমাদের লৌকিক ধর্ম ও পূজাপার্বণ, পূর্বোত্তর ভারতের আদিবাসী লোককথা প্রসঙ্গে, ননীগোপাল চক্রবর্তীর ঢাকী ঃ মিশ্র সংস্কৃতি ও সমাজজীবনঃ ত্রিপুরার অবহেলিত প্রত্ন উপাদান, পুরঞ্জন প্রসাদ চক্রবর্তীর রাজগী ত্রিপুরার কয়েকটি কৌলিক প্রথা, রঞ্জিত দে'র রবীন্দ্রনাথও লোকসংস্কৃতিচর্চা, মনসামঙ্গলের ঘোষা ঃ লোকসংস্কৃতির অন্যতম বলিষ্ঠ দিক,

সুবিমল রায়ের ত্রিপুরার হস্তশিল্প ঃ মিশ্র সংস্কৃতির অপূর্ব প্রকাশ, দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ গোস্বামীর চতুর্দশ দেবতার প্রাচীন মন্দিরের সন্ধানে, কসবার দুর্গাবাড়ী, ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির প্রসঙ্গে, জ্যোতিপ্রসাদ রায় চৌধুরীর লক্ষীন্দর, কালনাগিনীঃ একটি রহস্য, সুরেশ চন্দ্র পালের কবিয়াল ঃ উনবিংশ শতাব্দী, দিলীপ কুমার সাহার বনকুমারী ঃ আরণ্যক ত্রিপুরার এক লৌকিক দেবী, বাঘের সিন্নি ঃ সুপ্রাচীন সমবেত জীবনের চিত্র, প্রেতদাহ ঃ কার্তিক সংক্রান্তির লৌকিক অনুষ্ঠান, মনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের ত্রিপুরার প্রাচীন ও ঐতিহ্যপূর্ণ বসন্ত উৎসবও হোলির গান, ত্রিপুরার শারদ উৎসবের সেকাল ও একাল, চৈতন্যের উত্তরাধিকারী সন্ন্যাসীও ফকির, ত্রিপুরা রাজ্যের রথযাত্রা, রমেন্দ্র নারায়ণ সেন এর লোকায়ত জীবনে লোকসংস্কৃতির সন্ধানে, মলসমদের জীবন ও সংস্কৃতি, রাজ্যে একটি জনজাতি মলসমঃ পার্বতী জীবনের বমা সঙ্গানুসঙ্গ, নির্মল দাশের লোককাহিনীর বিশ্ব পরিক্রমা, বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও অন্য প্রসঙ্গ, লোকসংস্কৃতির আলোকে ত্রিপুরী লোককাহিনী, সমাজ বাস্তবতা শিল্পরূপে ত্রিপুরী লোককথা, রবীন্দ্র সৃষ্টিতে লোক-সংস্কৃতির প্রভাব, আশিষকুমার বৈদ্যের মিলন মহোৎসব খারচি ও কের, পান্নালাল রায়ের কবি কাহিনী ও গৌরী ত্রিপুরার মাণিক্য পরিবারের সেই সময়, ইতিহাস কিংবদন্তীর যুগলবন্দী ঊনকোটি ঃ রমনীয় জম্পুই, পার্থ সেনগুপ্তের ত্রিপুরার চা বাগানের শ্রমিক বেনজারদের বর্ণময় জীবনধারা। গোমতীর প্রায় প্রতিটি সংখ্যায় লোকসংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ স্থান করে নিয়েছে ; যার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও রাজ্য থেকে প্রকাশিত বহু সাময়িকী রয়েছে যাদের উল্লেখ এখানে করা সম্ভব হল না। আবার বইমেলার শুভ সূচনার পরও অনেক সাহিত্য-সাময়িকীর প্রকাশ ঘটেছে। যারা লোকসংস্কৃতিতে পৃথক গুরুত্ব দিয়েছেন।

এছাড়াও কিছু সাময়িকী রয়েছে, লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে যাদের ভূমিকা উল্লেখ করার মত। ত্রিবেগ, ব্রততী, সমকাল, পূর্বাভাস ঘাসমুখ, দেয়া, ভাস্কর প্রভৃতি। পূর্বাভাস এর পৃষ্ঠায় মুদ্রিত দু'একটি লোকসংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ, যেমন—উত্তর-পূর্বাঞ্চলের লোককথায় সমমর্মীতা, ত্রিপুরার উপজাতি লোককথা : সমাজমানসের চিত্র, তাছাড়া 'ঘাসমুখ' সাময়িকীতে প্রকাশিত বর্তমান আলোচকের খনা ও লোকসংস্কৃতি, মনোরঞ্জন বিশ্বাসের 'বামুটিয়ার লোকসংস্কৃতি, দেয়া (বিলোনীয়া) পত্রিকায় দেবাশিস চক্রবর্তীর লোকসাহিত্যের বুলবুলিরা, ভাস্কর সাময়িকীতে অজয় দেববর্মার ত্রিপুরার রূপকথা, শক্তি হালদারের ত্রিপুরার দেবায়তন ও দেবমূর্তি, প্রদীপ দেবের ত্রিপুরার পূজা পদ্ধতি, নিশেন্দু বিকাশ রায়ের ত্রিপুরার আদিবাসী বিবাহ ও সামাজিক প্রথা, নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মার আধুনিকতা ও উপজাতীয় সংস্কৃতি, অনাদি ভট্টাচার্যের ত্রিপুরার মন্দির ও স্থাপত্য, ত্রিবেগ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ দাশের মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের ঝুলনগীতি, ভাস্কর পত্রিকায় মহেন্দ্র দেববর্মার ত্রিপুরী নৃত্য, বিলোনীয়া থেকে প্রকাশিত শব্দছবি পূজা বার্ষিকীতে রণেন্দু দাশগুপ্তের গ্রামীণ ধর্মানুষ্ঠানে লোকসঙ্গীতের ভূমিকা, ননীগোপাল চক্রবর্তীর লুপ্তপ্রায় লোকঔষধ ঃ আমাদের দায়িত্ব, ডঃ রঞ্জিত দে'র দক্ষিণ ত্রিপুরার চড়কপূজা ও সঙ্গীত, আশিসকুমার বৈদ্যের প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে পিলাক সভ্যতা প্রভৃতি। তাছাড়া ত্রিপুরায় শতাব্দীর প্রবন্ধ চর্চা গ্রন্থে বনবিহারী মোদকের আরণ্য ত্রিপুরার ক্ষয়িষ্ণু লোকসংস্কৃতি' ইত্যাদি বিভিন্ন প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া ত্রিপুরায় প্রেরিত আসাম রাজ্যের দূত রত্নকন্দলী ও অর্জুন দাস

রচিত 'ত্রিপুর দেশের কথা' (অনুবাদক : ত্রিপুর চন্দ্র সেন) গ্রন্থে 'ত্রিপুরায় মদন পূজা ও মোট খেলা' অধ্যায়ে একটি প্রাচীন খেলা ও লুপ্ত 'মদন পূজা'র বর্ণনা রয়েছে।

এককালে যে দায়িত্ব ত্রিপুরা শিক্ষাদপ্তর পালন করতো, তা পরে ত্রিপুরা উপজাতি গবেষণাধিকারের হাতে অর্পণ করার ফলে কাজে কর্মে ব্যাপক তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। তার আগে শিক্ষা দপ্তর ক্ষীরোদ প্রভা দেববর্মা 'তালনি বছাজলা' গ্রন্থটি প্রকাশ করে (১৯৬৩ খ্রীঃ। এটি একটি ত্রিপুরী লোককাহিনী। কাহিনীটির সঙ্গে মাঝে মাঝেই ত্রিপুরার উপজাতি জনজীবনে গীত হয় এমন কিছু সঙ্গীতও স্থান পেয়েছে। সাতের দশকের শুরুতে উপজাতি গবেষণাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে গবেষণাধিকার গ্রন্থ প্রকাশ করতে শুরু করে। সে সময় থেকে উপজাতি - লোকসংস্কৃতি চর্চার ব্যাপক অগ্রগতি ঘটতে থাকে। তাদের প্রকাশিত গ্রন্থগুলির নামোল্লেখ করা যেতে পারে। শশধর বিক্রম কিশোর দেববর্মার The Tribes of Tripura - A dissertation, Irrojuk (Folklore), Nakhapilini - Hamjakma (Folklore), Takhugnue (Folklore), Chhengthungfa Naithokbi (Folklore)। সমাজতত্ত্ব ও অর্থনীতিকে ভিত্তি করে রচিত হল Socio-Economic Survey of Noatia Tribes - Dr. S B Saha, Socio-Economic Survey of Tribals in Sadar Sub-Division - Os Adhikari। অবশ্য এই গ্রন্থগুলিতে লোকসংস্কৃতির উপকরণও রয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য গ্রন্থ The Kukis of Tripura - R.G. Singh, Treatise an Traditional Social Institute of the Tripura - D.P. Debbarma, The Jamatias of Tripura - P. N. Bhattacharjee, Tribal Folktales of Tripura - D.K. Tyagi প্রভৃতি। বাংলায় রচিত গ্রন্থগুলি - গড়িয়া পূজা—রাজেন্দ্র জিৎ দেববর্মা, ত্রিপুরার লুসাই কুকিদের ইতিকথা — রমাপ্রসাদ দত্ত, ত্রিপুরার রূপকথা — শান্তিময় চক্রবর্তী, লোকবৃত্তের আলোকে কলই সম্প্রদায় — পি. এন. ভট্টাচার্য, সাধারণ সমীক্ষার আলোকে উচই — শ্যামলাল দেববর্মা, প্রাচীন ত্রিপুরার লোকসঙ্গীত— নরেন্দ্র দেববর্মা, ত্রিপুরার উপজাতি নৃত্য—ডঃ পদ্মিনী চক্রবর্তী, ত্রিপুরার উপজাতি সংস্কৃতি ও তান্ত্রিক চিকিৎসা— অলীন্দ্রলাল ত্রিপুরা, অরুন্ধতী রায়ের ত্রিপুরার উপজাতি লোককথাঃ সমাজ ও তত্ত্বরূপ, কৃষ্ণা দাসের ''আদিবাসী ত্রিপুরার লোককথা, লোকগীতি, প্রবাদ-প্রবচন ও ধাঁধা।Treatise on Traditional Social Institution of the Tripuri–D.P. Debbarma, The Jamatias of Tripura – P. N. Bhattacharjee, Tribal Folktales of Tripura –D. K. Tyagi প্রভৃতি। ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগী হয়ে যারা এ রাজ্যে লোককৃতি চর্চা করেছেন তাঁদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। রমাপ্রসাদ দত্তের "ত্রিপুরার লোকসঙ্গীত" এরূপ একটি লোককৃতি - বিষয়ক সমৃদ্ধ সংগ্রহকর্ম। তাছাড়া তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত 'হোলি' কেন্দ্রিক লোকগীতি সমৃদ্ধ গ্রন্থটি হল "ত্রিপুরার হোলি : রাজঅন্তঃপুর থেকে রাজপথে"। ডঃ রক্ষিত দে'র 'লোকসংস্কৃতি ও জনজীবন' গ্রন্থে ত্রিপুরার উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের লোকসংস্কৃতি তুলে ধরেছেন তিনি। ডঃ দে'র একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য কর্ম হল 'লোকসংস্কৃতি' শীর্ষক সাময়িকীটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক তিনি। এই সাময়িকীটি নিয়মিত প্রকাশিত হয় না। তবে ত্রিপুরায় 'লোকসংস্কৃতি' বিষয়ক এটিই একমাত্র পত্রিকা। অনাদি ভট্টাচার্য ককবরক ভাষা বিশেষজ্ঞ। তাঁর লোকসংস্কৃতি বিষয়ে সমৃদ্ধ অনেক লেখা বিভিন্ন পত্র-

পত্রিকার রবিবাসরীয়তে নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। প্রণব বর্ধন 'বাংলা' প্রবাদ বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বই রচনা করেছেন। ডঃ রমেন্দ্র বর্মণের লোকগায়ক ব্রজলাল অধিকারীর লোকসঙ্গীত কেন্দ্রিকঃ লাল জবা ও লাল পলাশের গান' একটি লোকসঙ্গীত সংগ্রহ গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে বাংলা ভাষায় রচিত গানের সঙ্গে ককবরক অনুবাদও রয়েছে। ত্রিপুরার লোকশিল্প বাঁশ বেতের কাজকে বিষয় করে সুবিমল রায় একটি গ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন। অশোকানন্দ রায় বর্ধন প্রকাশ করেছেন "ত্রিপুরার লোকসমাজ ও সংস্কৃতি"। তাছাড়া, 'গোমতী' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধকে কোন কোন গবেষক পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছেন। যেমন জগদীশ গণচৌধুরীর 'চড়ক', ত্রিপুরার লৌকিক দেবদেবী; সুরেন্দ্র দেববর্মার "ত্রিপুরার উপজাতি : লৌকিক জীবন ও সংস্কৃতি "। লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে নিজেই একটি প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা পেয়েছেন কুমুদকুন্ডু চৌধুরী। কগবরক ভাষা গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লোককৃতিচর্চার ক্ষেত্রেও তিনি সমানভাবে সফল গবেষকের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তাঁর, 'ত্রিপুরার রূপকথা কেরেঙ কথমা' একটি গবেষণাধর্মী লোককাহিনী সংকলন গ্রন্থ। তিনি বলেছেন যে, তিনি লোককাহিনী দু'ভাবে সংগ্রহ করেছেন। প্রথমতঃ টেপ্‌রেকর্ডারের সাহায্যে, দ্বিতীয়তঃ যেখানে টেপরেকর্ডার ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি, সেখানে রূপকথাগুলো কথকদের মুখ থেকে বারবার শুনে Phonetic Transciption এ কগবরক ভাষায় লেখা হয়েছে। তিনি তাঁর 'তিপ্রা উপজাতির টোটেম ও তিপ্রাখর নওয়ারীখরের কাহিনী' প্রবন্ধটিতে তিপ্রাদের টোটেম সন্ধান করেছেন। একটি বিশেষ ধরনের কচ্ছপ 'তিপ্রাখর'কে তাদের জলজগোষ্ঠী দেবতা বা Water borne clan-God বলেছেন তিনি ।

লোকসংস্কৃতি বিষয়ে কোন কিছু না লিখেও লোকসংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছেন রাজ্যের মন্ত্রী অনিল সরকার। এ রাজ্যে জীবন সংগ্রামরত মানুষের লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতি মনসামঙ্গল, গাজন নৃত্য, গরিয়া, ধামাইল, নৌকাবাইচ প্রভৃতি চর্চাকে রক্ষার স্বার্থে তাঁর উদ্যোগ প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা পেতে পারে। রাজ্যের লোকশিল্পী সুবল দাস বৈষ্ণব, রাসমনি বৈষ্ণবী, গৌরদাসী বৈষ্ণবী, বিষ্ণু দত্ত, রামপদ জমাতিয়া, সদাগর দেববর্মা প্রমুখদের লোকগীতি মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্য মঞ্চ নির্মাণ করে লোকসংস্কৃতি চর্চার পৃষ্ঠপোষকতা করছেন তিনি।তাঁর এ প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

বিষয় লোকসংস্কৃতি নয়, অথচ লোকসংস্কৃতির জ্ঞাতিবিদ্যা ও উপাদান যোগানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এমন কিছু সংখ্যক বই পত্রাদি, গবেষণামূলক নিবন্ধ বিভিন্ন সময়ে নিবন্ধ রচিত হয়েছে। ত্রিপুরাকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরার লোকজীবন তথা লোকযান সম্পর্কে পাঠগ্রহণে এ সব গ্রন্থ যথেষ্ট সহায়ক। চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদের ত্রিপুরার শিলালিপি সংগ্রহ, উদয়পুরে প্রাপ্ত মুদ্রার বিবরণ, মহারাজ ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্মণের ত্রিপুরার মঠ ও মন্দির, ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্তের ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিশ বছর - উদয়পুর বিবরণ, ধর্মনগর ও খোয়াই এর (পৃথকভাবে) বিবরণ, প্যারীমোহন দেববর্মার উনকোটি তীর্থ, সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মার ত্রিপুরার স্মৃতি, দ্বিজেন্দ্র চন্দ্র দত্তের রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা, কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্তের কিরাত দেশ ও তার অবস্থান,

তাম্রশাসনে তথ্যানুসন্ধান, পন্ডিত শীতল চক্রবর্তীর আদি আর্যভূমি, প্রাচীন ত্রিপুরার ইতিহাস প্রভৃতি প্রবন্ধ গ্রন্থ। তাছাড়াও কৃষ্ণপদ দত্তের ত্রিপুরার ইতিকথা, জীতেন্দ্র পালের ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত, মোহিত পুরকায়স্থের ত্রিপুরার বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, আশিস কুমার বৈদ্যের ত্রিপুরার প্রত্ন উপাদান সম্পর্কিত পিলাক সভ্যতা ও ঊনকোটি বিষয়ে দু'টি গ্রন্থ রয়েছে।

ত্রিপুরায় বইমেলা রাজ্যের সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে নতুনমাত্রা সংযোজন করেছে। বইমেল'কে কেন্দ্র করে সাহিত্যচর্চা নিয়ে নতুন আঙ্গিকে ভাবনা চিন্তা হচ্ছে। তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য যে উদ্যোগ তার ফলে পন্ডিতজনেরা নিজস্ব বিষয় নিয়ে যে চর্চা, তাকে লেখ্য রূপদানের একটা মানসিকতা ক্রমশঃ তীব্র হচ্ছে। সাহিত্যের বহুমুখী চর্চা সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই, কিন্তু লোকসংস্কৃতির প্রতি উদাসীনতা অত্যন্ত বিস্ময়কর। আগে যেসব প্রবন্ধ ও গ্রন্থগুলিকে এই আলোচনায় স্থান দেয়া হয়েছে, তার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভাগ বইমেলা উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছে। এ সম্পর্কে একটি পৃথক আলোচনা প্রাসঙ্গিক। একটি কথা উল্লেখের প্রয়োজন যে, রাজ্যে একটি উপজাতি গবেষণাধিকার থাকলেও বাঙ্গালীদের লোকসংস্কৃতি চর্চার পক্ষে সহায়ক কোন সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান নেই। কর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন সরকারী আনুকূল্যে পুষ্ট বহু বেসরকারী সংস্থা রয়েছে, কিন্তু লোকসংস্কৃতি চর্চা, উপকরণ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে তারা অনাগ্রহী। বিশ্বজুড়ে ব্যাপক পরিবর্তনের ঢেউ লেগেছে। সংস্কৃতির জগতও নানাভাবে তার স্থান পরিবর্তন করে চলেছে। আর, এর ফলে, সবচেয়ে বেশী বিপজনক ভাবে, বিলুপ্তির দিকে অগ্রসর হচ্ছে এই লোক-সংস্কৃতির জগৎ। এর স্বাভাবিক প্রবণতা ও গতিপথে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা অসম্ভব কর্ম প্রায়। তবে একে সংগ্রহ কর্ম, সংরক্ষণ ও যথাযথ বিন্যাস কর্মের দ্বারা গুরুত্ব প্রদান করা যায়। কিন্তু অভাব হল, সঠিক ভাবনা, পথ নির্ধারণ ও কর্মসূচী রূপায়ণ করা। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক লোকসংস্কৃতি বিষয়ে পাঠ্যসূচী নির্মাণ করার আবশ্যকতা রয়েছে। এর পঠন পাঠনে ও ক্ষেত্র গবেষণার ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (NGO) গুলি এ ব্যাপারে সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। সরকারী আনুকূল ও সহৃদয়তাও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নিঃসন্দেহে।

তথ্য সংগ্রহ ঃ

(১) রমাপ্রসাদ গবেষণাগার (রমাপ্রসাদ দত্ত)

(২) কল্যাণগুপ্ত ঃ সম্পাদক গোমতী

(৩) ফোকলোরের স্বরূপ ঃ চিত্ত মন্ডল (কলকাতা, ১৯৮৩)

‘লোকসংস্কৃতির আলোকে ত্রিপুরায় সংহতি ভাবনা

আমাদের এই পৃথিবী গ্রহটি যেমন বিশাল, এর সমস্যাও তেমনি নিতান্ত স্বল্প নয়। আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে বাস করছি — এর বিবিধ সমস্যা আমাদের ভাবনার জগৎকে আলোড়িত করে প্রতিনিয়ত। এই রাজ্যে যারা মানুষের সমস্যা নিয়ে ভাবেন, রাজ্যের বর্তমান অশান্ত পরিস্থিতি উপলব্ধি করে অত্যন্ত ভাবিত তাঁরা। রাজ্যে মানুষে মানুষে সম্প্রীতি রক্ষা এবং সংহতির প্রয়োজনে যথার্থই সরব তাঁরা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে মানুষের অগ্রগতি যখন কল্পনাকে স্পর্শ করতে চলেছে, তখন এই রাজ্যে মানুষে মানুষে দূরত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক একজন মানুষ যেন এক একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের অধিবাসী হয়ে যাচ্ছে। এই বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা তীব্র গতি লাভ করেছে। পাশাপাশি মানবতাবাদী মানুষদের চেতনা ক্রমশঃ বানীরূপ লাভ করছে। সংহতির স্বাভাবিকত্ব রক্ষার জন্য, যে কোন মূল্যে সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে—এটাই তাঁরা বলতে চাইছেন। সংহতি কোন বস্তুমাত্র নয়, যাকে হাত বাড়ালেই আমরা পেতে পারি। আমরা প্রাক-ইতিহাস ও ইতিহাসের সুদীর্ঘপথ মাড়িয়ে নতুন শতাব্দীতে উপনীত হয়ে, আমাদের পূর্বপুরুষদের দিকে তাকিয়ে বিষ্মিত হচ্ছি। আমাদের আদিম প্রপিতামহ মানুষেরা বন্য বা বর্বর হয়েও সংহতির এক অদৃশ্য বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। তাদের সংহতি ভাবনা দেশ - রাজ্যের কোন ভৌগোলিক পরিমন্ডলে গন্ডীবদ্ধ ছিল না। তারা ছিলেন লোকজীবনের অধিবাসী। অথচ বিশ্বব্যাপী পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও সাদৃশ্যপূর্ণ সংস্কৃতি ভাবনায় জারিত হতেন তারা।

আমাদের আদিম, বন্য ও বর্বর প্রপিতামহ-প্রপিতামহীরা কোন্ ধাঁচের সমাজে বাস করতেন, আর কেমন তারা সাংস্কৃতিক ভাবনা তাদের মাতিয়ে রাখতো — তারজন্য সমাজ বিজ্ঞানীরা, নৃতত্ত্ববিদেরা, লোকসংস্কৃতিবিদেরা বিস্তর ভাবনা-চিন্তা করেছেন। তাঁরা তাদের ভাবনার ফসল লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন এমন পুঁথিপত্রের সংখ্যাও অগুণতি। লোকসংস্কৃতিবিদেরা ঐ সব মানুষদের সংস্কৃতিচর্চায় সমৃদ্ধ জীবনচর্যার চিত্র সেখানে লিপিবদ্ধ করেছেন। সেদিন মানুষ প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে; প্রকৃতিকে খুশী করার জন্য বিভিন্ন পন্থা-পদ্ধতি অবলম্বন করেছে । এক গোষ্ঠীর সংস্কৃতি ভাবনার সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর সংস্কৃতি ভাবনার সাদৃশ্য পরস্পর সম্পর্কযুক্ত না থেকেও, নিতান্তই বিস্ময়ের বিষয়।

সঙ্গত কারণেই আদিম সমাজগঠন, প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও সংস্কৃতি-ভাবনার স্বরূপ উপলব্ধি করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এটাই ঘটনা যে, প্রকৃতিকে জয় করার সংগ্রামে মানুষ সফল হয়েছিল। যেদিন এই আধিপত্য অর্জনে সাফল্যের ইঙ্গিত মিলল, সেদিন থেকেই মানুষের সভ্যতারও সূচনা ঘটল। শিকার করার মধ্য দিয়ে মানুষের এগিয়ে চলা শুরু হল। এরপর পশুপালন করা -- সে সঙ্গে চাষবাস, সুতো কাটা, কাপড় বোনা, ধাতু শিল্পকে গ্রহণ করা, মৃৎশিল্পের বিস্তৃতি ঘটানো, প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে চলা, শুধুই এগিয়ে চলা।

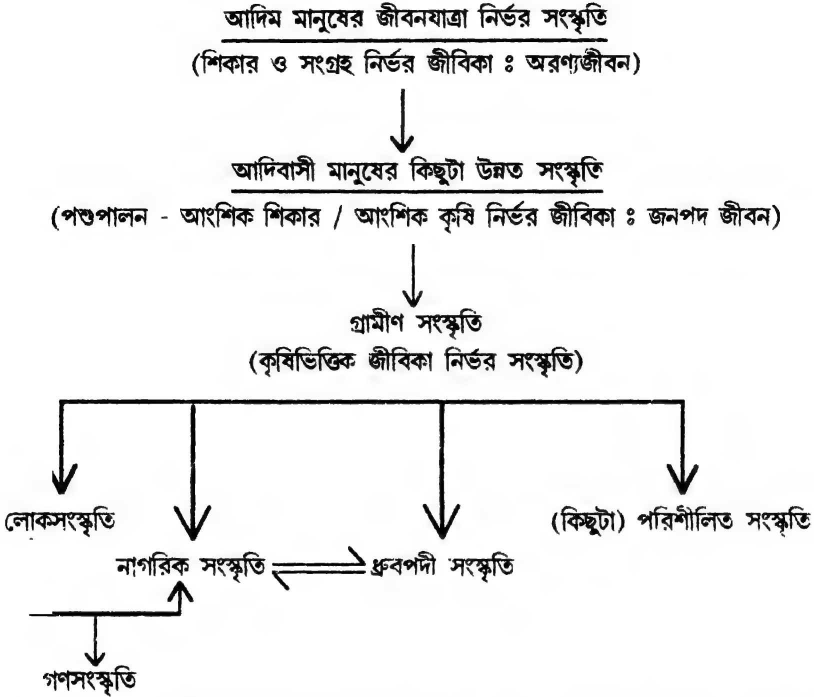
লোকসংস্কৃতি কখনো একক প্রচেষ্টা বা কৃতির ফসল নয়। সমষ্টির যৌথ প্রয়াসে স্বতঃই যে সাহিত্য সৃষ্টি হয়, তাকেই লোকসংস্কৃতি বলা যায়। সে সৃষ্টি গ্রহণে লোকজীবন সব সময়

প্রস্তুত থাকে। অতীত কাল থেকেই এই প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। একই গোষ্ঠী বলয়ে যে সংস্কৃতি স্বাভাবিকভাবে সৃষ্টি হয়, সে সংস্কৃতি, নিকটস্থ গোষ্ঠীবলয় কখনো কখনো কোন না কোন ভাবে গ্রহণ করে। আবার গ্রহণকালে সে জনসমষ্টি হয়তো কিছু না কিছু 'ঘটনা অনু' পাল্টে দেয়। কিন্তু সংস্কৃতি চর্চার বিষয়বস্তুতে সাদৃশ্য প্রায়ই থেকে যায়। এই যে একগোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর সঙ্গে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান, গ্রহণ-বর্জন-এর প্রক্রিয়া চালিয়েছে তার সূচনা ঘটেছিল স্মরণাতীত কাল থেকেই। কিভাবে এই প্রক্রিয়া চলছিল তার জন্য গবেষকেরা কিছু সূত্রও আবিষ্কার করেছেন। সে যাই হোক, প্রকৃত বক্তব্য হল, যৌথ জীবনের যে সংস্কৃতি অর্থাৎ লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান গ্রহণ বর্জনের প্রক্রিয়াটি জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়েছিল। ত্রিপুরার বুকেও এই প্রক্রিয়াটি চলেছিল। একটা সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে সুদীর্ঘকাল ধরে এ রাজ্যেও চলেছিল। মূল বিষয়ে যাবার আগে প্রাসঙ্গিক কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব আলোচনায় আনা দরকার।

মর্গ্যানের তত্ত্ব ঃ নৃতত্ত্ববিদ্ তথা সমাজবিজ্ঞানী লুইস্ হেনরী মর্গ্যান তাঁর গবেষণার জন্য শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছেন। এমন একটা সময় ছিল যখন আমাদের পূর্ব পুরুষেরা প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে, অথবা আপোষ করে বেঁচে থাকার জন্য পথ সন্ধানের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। সে সময় মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধভাবে অবস্থানের প্রয়োজনীয়তা যেমন অনুভব করেছিল, তেমনি কোন সুনির্দিষ্ট গন্ডীতে আবদ্ধ ছিল না তাদের বসবাস করা। সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্র মাত্রই হেনরী মর্গ্যানের এই তত্ত্বটি সম্পর্কে অবগত আছেন। সবকালে সব দেশ ও সমাজের মানুষের সভ্যতার বিবর্তন ঘটেছে। এই বিবর্তনের গতি অব্যাহত রয়েছে। এক স্তর থেকে অন্য স্তরে যাবার মাধ্যমে ঘটে চলেছে এই বিবর্তন প্রক্রিয়া। হেনরী মর্গ্যান সভ্যতার স্তর পর্যন্ত ছয়টি স্তরের কথা বলেছেন। কোন কোন জাতিগোষ্ঠী পরিবেশ, অর্থনৈতিক বিকাশ অথবা অন্য কোন কারণের জন্য বিবর্তনের কোন কোন ধাপ হয়তো অতিক্রম করতে সক্ষম হয়নি। পক্ষান্তরে, অপর কোন জাতি বা কোম সে স্তর অনেককাল আগেই অতিক্রম করে গেছে। আবার তৃতীয় কোন গোষ্ঠী উপযুক্ত পরিবেশিক ও অর্থনীতিক সুযোগের অভাবে ঐ স্তর পেরোতেই পারেনি। যারা সভ্যতার স্তরের শেষ ধাপে উপনীত হবার সক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি, সেন্সাসের খাতায়, খবরের কাগজে অথবা নৃবিজ্ঞানের ভাষায় 'আদিবাসী অভিধায়' চিহ্নিত হন তারা।

সংস্কৃতির সোপান ঃ 'সংস্কৃতি' কথাটির ব্যাপকতা ও গভীর তাৎপর্য রয়েছে। সাধারণভাবে প্রচলিত ধারণা হল নাচ-গান-অভিনয়-আবৃত্তি ইত্যাদি ব্যবহারিক কলাবিদ্যা। আর একটু এগিয়ে ভাবলে এর সঙ্গে সাহিত্য কলা ভাস্কর্য-স্থাপত্য ইত্যাদি যুক্ত হয়। সর্বোপরি নানাবিধ ব্যবহারিক কলাবিদ্যা বা এর থেকে গভীর তাৎপর্যবাহী বিষয় জড়িত আছে এর সঙ্গে । 'সংস্কৃতি' কথাটি দ্বিবিধ ব্যঞ্জনা বহন করে। একটি হল স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্ট কোন প্রত্যয় বা ধারণা যা পরিবার সমাজ পরিবেশের প্রভাবে গড়ে উঠে; অন্যটি পরিশীলিত, পরিমার্জিত তথা সুবিন্যস্ত। হেনরী মর্গ্যান অগ্রগতির স্তর বিন্যাস করেছেন। তিনি বলেছেন, বর্বর যুগের শেষে কৃষির পত্তন ঘটেছে। মানুষের ধর্ম-বিশ্বাস, দেবকল্পনা, সামাজিক বিধি, রীতি-সংস্কার এই সময় পরিবর্তনের

মুখে এসে দাঁড়াল। ব্যবহারিক সংস্কৃতি ও মানস সংস্কৃতি — উভয়ক্ষেত্রে তা সাধিত হতে থাকল। সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ধারা অন্বেষণে সহায়ক সারণী নিম্নরূপ ঃ



মানুষের অনন্ত জিজ্ঞাসার অন্তর্কাঠামোর প্রেক্ষিতে চারটি বর্গ রয়েছে। তাহল ঃ অদৃশ্যশক্তি, ম্যাজিক, টোটেম ও ট্যাবু ; লোকচার ও লোকসংস্কার।

অদৃশ্য শক্তি ঃ মানুষ অলক্ষ্য শক্তিকে ভালমন্দের সংগঠকরূপে বিবেচনা করে এসেছে দীর্ঘকাল। ঝড়, বৃষ্টি, ভূমিকম্প, বন্যা, খরা, অজস্র নৈসর্গিক ঘটনা সব কিছুর পশ্চাতে যে অদৃশ্য শক্তির অসামান্য ভূমিকা তা পৃথিবীর তাবৎ আদি মানবের ভাবনায় সক্রিয় ছিল। অলক্ষ্য শক্তির কল্পনাকে ই. বি. টাইলর বলেছেন, অ্যানিমিজম (animism) বা সর্বপ্রাণবাদ। অথবা পরবর্তীকালে আর. আর. ম্যারেট বলেছেন অ্যানিমেটিজম অথবা জড়সত্ত্বাবাদ। সর্বপ্রাণবাদ বা জড়সত্ত্বাবাদকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় ঃ

(ক) জড়বস্তু ও নিসর্গ ব্যাপারগুলোর মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন সব শক্তি সম্পর্কে বিশ্বাস,

(খ) মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীদের জীবিত ও মৃত অবস্থায় একটি /একাধিক সত্ত্বা কিংবা আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস।

(গ) অনির্দেশ্য কিছুর অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে বিশ্বাস।

সর্বত্র আত্মার উপলব্ধি মতবাদের উপর animism প্রতিষ্ঠিত। এই মতবাদ অনুসারে আদিম মানুষ বিশ্বাস করতো পৃথিবীর জীবজন্তু, লতাপাতা, গাছপালা, নদ-নদী ইত্যাদি সবকিছুরই প্রাণ আছে।

ম্যাজিক ঃ আদিম মানুষ থেকে আজকের মানুষ পর্যন্ত ম্যাজিক বা জাদুশক্তিতে বিশ্বাসের ভাবনা থেকে সরে আসেনি। অবশ্য সে ভাবনায় পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে না এমন নয়। জাদু বিশ্বাসের ফলশ্রুতি (প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ) হল — ধর্মবিশ্বাস, আচার, সংস্কার, প্রথা ইত্যাদি। বস্তু ও ঘটনার বৈজ্ঞানিক কার্যকারণ না জানা থাকলে তাকে জাদুশক্তি বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। ঘটনা যখন মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধির অগম্য হয়, তখন অদৃশ্য শক্তিতে তুষ্ট করার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। জাদু বিশ্বাসের এটাই আদি কথা। বাস্তবে ঘটতে পারে বা ঘটা স্বাভাবিক তাকে প্রত্যাশা করে কিছু ঘটনার অভিনয় বা অনুকরণ করলে তা সত্যসত্যই ঘটে যাবে এরূপ বিশ্বাস করা হয়। মন্ত্র তথা গান, ভঙ্গিমা ওরফে নাচ, এগুলি হল অনুকৃতিমূলক রিচুয়াল, তার লব্ধ ফল হল জাদু। ব্রতপালন করতে গিয়ে ধানছড়া, পুকুর, মাছ, ঘর ইত্যাদি আঁকা হচ্ছে। ব্রতের সিদ্ধি হলে অনুকৃতিমূলক বস্তুচিত্রগুলি বাস্তবে রূপ পাবে।

সেঁজুতি ব্রতের আলপনা

('মেয়েলি ব্রতের আলপনার ইতিহাস (প্রবন্ধ)ঃ ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত' থেকে স্কেচটি সংগৃহীত হয়েছে।)

এর সঙ্গে উপাচার — ঘট, সিঁদুর, হলুদ, পান, সুপারি, চাল, কলা, বাতাসা, ফুল ইত্যাদি যুক্ত হয়। সঙ্গে রয়েছে মনস্কামনা পূরণের জন্য প্রার্থনা, মন্ত্র; পালনীয় বিধি — স্নান, উপবাস ইত্যাদি। এসবই যাদুশক্তির শুভকারী দিক। অশুভকারী জাদু হল ব্ল্যাক আর্ট বা ডাকিনী বিদ্যা। আদিম যুগ থেকেই মানুষ একে ভয় ও বিশ্বাস করে এসেছে।

টোটেম ও ট্যাবু ঃ পৃথিবীর আদিম মানুষদের বিশ্বাস ছিল যে. তারা প্রত্যেকেই কোন না কোন মনুষ্যেতর কোন প্রাণী বা প্রাকৃতিক কোন বস্তু বা ব্যাপারকে দাঁড়া করানোর চেষ্টা, একে বলা হয় টোটেম বিশ্বাস। একদল মানবগোষ্ঠী একেকটি মনুষ্যেতর প্রাণী বা প্রাকৃতিক কোনবস্তু বা ব্যাপারে নামেই পরিচিত ছিল। সারা পৃথিবীতে বিপুল সংখ্যক 'টোটেম' অধীন মানবগোষ্ঠীর পরিচয় পাওয়া গেছে। যেমন, ভাল্লুক, শুকর, নেকড়ে, সাপ, কোন কোন পক্ষী, বজ্র. লাল (রং), মহিষ, হরিণ, ঈগল, পেঁচা, কচ্ছপ, কাক, সমুদ্র, সূর্য, খরগোশ ইত্যাদি।

'ট্যাবু' বলতে বোঝায় সতর্কতামূলক নিষেধ বা আপত্তি। নিষিদ্ধ বা আপত্তিকর কত কী ই না হতে পারে। নর-নারী, মানবেতর প্রাণী, বস্তুনাম, কাজ, গ্রহ-নক্ষত্র, ক্ষণ, তিথি, বার, মাস ইত্যাদি অনেক কিছু। কিন্তু যে কোন নিষেধ রীতিই ট্যাবুর অন্তর্গত বলে গণ্য হয় না। যে কাজ বা যে ব্যক্তি অথবা যে বস্তু কোনও না কোনওভাবে কিছু একটা অলৌকিক শক্তির দ্বারা সম্পৃক্ত হয়ে আছে, তার বাবদে কিছু নিষেধাজ্ঞা প্রচলিত থাকলে তবেই সেটা ট্যাবু বলে

গণ্য হবে। কোনও জিনিসের পবিত্রতা বা অপবিত্রতার ধারণা থেকেই ট্যাবুর বিকাশ। ট্যাবু যতখানি ব্যক্তিগত তার থেকেও বেশী পুরো সমাজের।

লোকাচার ও লোকসংস্কার ঃ মানুষের বস্তুগত দিকের সঙ্গে আচার-অনুষ্ঠানের নিবিড় সম্পর্ক বর্তমান। শাস্ত্রীয় তথা ধর্মীয় এবং লৌকিক এই দুইভাগে বিভক্ত। শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে অতীন্দ্রিয় শক্তি ও দেবদেবীকে তুষ্ঠ করাই হল শাস্ত্রীয় তথা ধর্মীয় লোকাচারের লক্ষ্য। আবার লোকায়ত সমাজের অক্ষরজ্ঞানহীন বা অল্পশিক্ষিত এমনকি শিক্ষিত জনগোষ্ঠী ঐতিহ্যগতভাবে ঐকান্তিক নিষ্ঠায় কখনো ব্যক্তিগতভাবে, কখনো দলবদ্ধভাবে কোন পার্থিব কামনার লক্ষ্যে প্রচলিত বিধি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট দেবদেবী, অপদেবতা, পীর ফকিরকে তুষ্ঠ করতে কিংবা অপ্রাকৃত অথবা প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে যে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া করে তা হল লৌকিক আচার অর্থাৎ লোকাচার।

উল্লিখিত বিষয়গুলি আলোচনার পর, প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যেতে পারে। ত্রিপুরা রাজ্যে দু'টি জনগোষ্ঠী বসবাস করছে সুদীর্ঘকাল ধরে। একটি হল ঃ বাংলা ভাষাভাষী বাঙ্গালী জনগোষ্ঠী, অন্যটি — ককবরকভাষী ত্রিপুরী (বৃহত্তর অর্থে) জনগোষ্ঠী। এই উভয় জনগোষ্ঠী নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল। নিজস্ব সংস্কৃতিকে তারা যেমন বহন করে চলেছে, তেমনি সাংস্কৃতিক ভাবনা তাদের ঐতিহ্য ও পরিচিতিকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। এখন দেখা যেতে পারে, দুই জনগোষ্ঠী কিভাবে "অনন্ত জিজ্ঞাসার অন্তর্কাঠামো"র মধ্যে (অর্থাৎ অদৃশ্যশক্তি, ম্যাজিক, টোটেম ও ট্যাবু, লোকাচার ও লোকসংস্কার) থেকে স্বতঃই লোকজীবনের অধিবাসী হয়ে গেছে।

কের পূজা ঃ প্রাক্-ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক সাদৃশ্যের অন্তর্কাঠামো ঃ

'সর্বত্র আত্মার উপলব্ধি'র ভাবনা থেকেই ত্রিপুরার উপজাতি লোকজীবনে 'কের পূজা'র উদ্ভব হয়েছিল। ত্রিপুরার উপজাতিদের জীবনে কেরপূজা একটি অসামান্য ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। এই পূজার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষ যেদিন রুখে দাঁড়িয়েছিল, আবার প্রকৃতির অসীম শক্তিকে শ্রদ্ধা করে, বিবিধ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে এই পূজা করতে শুরু করেছিল তারা। যে কারণে এখানে মানুষের আদিম বিশ্বাস, জাদু, ট্যাবু তথা লোকাচার প্রভৃতি জিজ্ঞাসার অন্তর্কাঠামোর সন্ধান মিলবে।

গবেষক কের পূজার পদ্ধতি বর্ণনায় বলেছেন, "The Chantai stands in the ground infront of the wathap, the symbolic representation of the lampra deities, when a jari is shown in his hands. The jari is a sacred pot made of brass like a Kamandulu or jar with a curved pipe on the middle of it. The jhari is filled with water and a branch of Kumplai tree along with its flower and leaves Chanting the mantras the chantai sprinkles the water on the banana leaves, standing before the owathap the galim takes his position on the left side of the chantai hold a Kharga in his hands. The Chantai drops a considerable quantity of water on the Kharga, pigeon and eggs."

দীর্ঘ এই উদ্ধৃতিকে সামান্য বিশ্লেষণ করলে যা পাওয়া যাবে, (ক) চন্তাই ওয়াথপের (দেবপ্রতীক) সামনে মাটিয়ে দাঁড়িয়ে, লাম্প্রা দেবতার প্রতিনিধি হল ওয়াথপ, (খ) তার হাতে রয়েছে ঝাড়ি, যা কমন্ডলু'র সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত (গ) ঝাড়িটি জলে পূর্ণ, কুমপ্লাই গাছের শাখা এর মধ্যে ডুবানো রয়েছে, সঙ্গে রয়েছে ফুল ও পাতা (ঘ) চন্তাই মন্ত্র পড়ে জল ছিটাচ্ছেন (ঙ) গালিম চন্তাই'এর বামদিকে হাতে খড়্গ নিয়ে প্রস্তুত হয়েছেন, (চ) চন্তাই মন্ত্রপূত জল অল্প অল্প করে খড়গ, পায়রা ও ডিমের উপর ছড়িয়ে দিচ্ছেন, ইত্যাদি। মানুষের আদিম বিশ্বাস অনুসারে সব কিছুতে দেব অস্তিত্ব এখানে প্রকাশ পেয়েছে। আবার বৃক্ষপূজা অর্থাৎ সর্বপ্রাণবাদ- এর প্রভাব এখানে সুস্পষ্ট। এই পূজা ত্রিপুরাব জনগণ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। এর সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত কিছু আদিম ভাবনা ও পূজা অনুষঙ্গ যুক্ত রয়েছে যা প্রতিবেশী সংস্কৃতি ভাবনার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। বাঙ্গালী কর্মধারায় বৃক্ষপূজা, বলিপ্রথা আদিম বিশ্বাস অনুসৃত ভাবনার ফসল। সর্বোপরি, ভারতীয় শাক্ত সাধনার সঙ্গে বহিরঙ্গে ও অন্তরঙ্গে কেরপূজার সাদৃশ্য বিস্ময়কর। জাদু বা মন্ত্রতন্ত্রের ব্যবহার করছেন পুরোহিত বা চন্তাই, তার অধীনস্থ গালিম। গোষ্ঠীবদ্ধজীবনে অশুভ শক্তির কুপ্রভাবকে বাধা দেবার জন্য মন্ত্র পাঠ আবশ্যিক অঙ্গ। একে বাদ দিয়ে ঐ পূজার অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। তেমনি বাঙ্গালী জনজীবনে মন্ত্রতন্ত্রের যে বিশ্বাস তা মার্জিত রূপ পেলেও সে ধারাটি আজ পর্যন্ত রক্ষিত হচ্ছে।

ট্যাবু বা সতর্কতামূলক নিষেধ কের পূজার ক্ষেত্রে কোনগুলো তার একটি তালিকা গবেষক প্রস্তুত করেছেন। সেগুলো হল (১) কেউ কের পূজার গন্ডীবদ্ধ অঞ্চলের ভেতর বা অঞ্চলের বাইরে যেতে পারবেন না, (২) অন্ততঃ ৩২ ঘন্টা পর্যন্ত এই নিষেধ মান্য করে চলতেহয়, (৩) অসুস্থ বা আসন্ন প্রসবা মহিলা পূজা - আবদ্ধ স্থানে থাকতে পারেন না, (৪) জন্ম বা মৃত্যু এ স্থানে হতে পারবে না, (৫) জুতো পরিধান, ছাতা ব্যবহার, ঐ পূজা চলাকালীন সময়ে নিষিদ্ধ। গবেষক বলেছেন ঃ 'These kind of taboos are effective not only in the case of tribals of Tripura but the whole North-East India. The tribes of the different countries of the world are also following the taboos.' অনুরূপ ট্যাবু বাঙ্গালী জনসমাজ বিভিন্ন পূজাপার্বনে যথাসম্ভব সতর্কতা সহ অবলম্বন করে থাকেন। পূজার ব্রতীরা জন্ম ও মৃত্যুকালীন অশৌচ মান্য করেন, পূজার বিশেষ মুহূর্তে নীরবতা অবলম্বন করা অর্থাৎ সে সময় কোন শব্দ না করা বিশেষ বিধি। সবাই যেমন মন্দিরে প্রবেশ করেন না, তেমনি বাঙ্গালী হিন্দু বিধবাদের মাছ-মাংস না খাওয়া, লাল শাড়ি পরিধান না করা, সিঁদুরের টিপ ব্যবহার না করা, নারায়ণ শিলা স্পর্শ না করার মতো বিভিন্ন 'ট্যাবু' মান্য করা হয়ে থাকে। ট্যাবুর আদিম চরিত্র পরবর্তীকালে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত ও অর্থনীতিক কারণে পরিবর্তিত হয়েছে। ট্যাবু সংখ্যাহীন, তবে এর দ্বারা আভ্যন্তরীণ সাদৃশ্য রেখাটি অঙ্কন করা যায়।

লোকাচার ও লোকসংস্কার ঃ জাদু সঞ্জাত আচার-অনুষ্ঠানের পরিবর্তিত রূপ হল লোকাচার ও লোকসংস্কার। বিষয় দু'টি মানুষের মনে বিপ্রতীপ ভাবনার জন্ম দেয়। একদল মানুষের কাছে ধর্ম প্রত্যয়, অন্য দল মানুষের কাছে তা অন্ধ-কুসংস্কার বলে পরিলক্ষিত হয়।

সারা পৃথিবীজুড়ে সংস্কৃতির অজস্র বলয় রয়েছে। যেখানে মানুষ অজস্র লোকাচার ও লোকসংস্কারের গন্ডীতে আবদ্ধ। এগুলি তো জাদুসঞ্জাত ভাবনার রূপান্তর ছাড়া অন্য কিছু নয়। বিবাহে আচরণীয় যে সংস্কার তার মধ্যে রয়েছে আদিম মানুষের সুখ দুঃখ, লজ্জা-দ্বিধা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, জয়-আনন্দ ইত্যাদি বিবিধ মানসিক আবেগ, যাকে বলা হয়েছে "ফসিলাইজড্ এক্সপ্রেশ্যনস্"।

কের পূজায় ব্যবহৃত যে উপকরণের তালিকা রয়েছে, তার সঙ্গে (যা লোকাচারের অঙ্গীভূত) বাঙ্গালী জীবনে বিভিন্ন পূজা পার্বনে সাদৃশ্যযুক্ত লোক উপকরণ এর তুলনা নিম্নরূপঃ

কের পূজায় ব্যবহৃত লোক-উপকরণ	প্রাসঙ্গিক সংযোজন
ঘট/মালসা বাঁশের চোঙ্গ	বাঙ্গালী - উপজাতি উভয় সম্প্রদায়ের ঈশ্বর ভাবনার সঙ্গে যুক্ত পূজা উপাচারে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এগুলো। (বাঁশের চোঙটি অবশ্য উপজাতি পূজা উপাচারে ব্যবহৃত হয়)
পাঁঠা/হাঁস/পায়রা	বলিদান করা উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ পূজার আবশ্যিক তথা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ মনে করে থাকেন।
ডিম তুলা/সুতা/টুকরা-সাদা কাপড়	বাঙ্গালীর বিবাহ-পার্বনে ডিম প্রাসঙ্গিক উপাদান। পূজা-পার্বনে প্রয়োজনীয় উপকরণ হিসাবে পূজার কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে (বাঙ্গালী-উপজাতি উভয়-এর ক্ষেত্রেই)।
মদ - লাঙ্গি	বাঙ্গালী (হিন্দু) কালীপূজায় অপরিহার্য উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উপজাতি জনজীবনে-এর ভূমিকা বহু ব্যাপক।
ধান/আদা/সরিবা কলা/বাতাসা/চাল	উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ পূজা পার্বণে এসব উপকরণ ব্যবহার করে থাকেন।
সিঁদুর	Prots-Australoid বংশোদ্ভুত সম্প্রদায়ের লোকেরা সিঁদুরের ব্যবহার ভারতীয়দের মধ্যে আমদানী করেছিল, ভারতের সর্বস্তরের মানুষ তাকে গ্রহণ করেছে।

আদিম মানুষের জিজ্ঞাসার 'অনন্ত অন্তর্কাঠামোতে' জাতি গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবনার কোন সুস্পষ্ট প্রভাব ধরা পড়ে না। তাই এখানে কোন কোন ক্ষেত্রে যে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় তার মূল্য অপরিসীম।

খারচী পূজা : সমন্বয়ের ঐতিহ্য ও ঐতিহ্যের সমন্বয় :

বহু আগে থেকে ত্রিপুরার উপজাতিরা খারচী পূজা করে আসছেন। এটাকে ব্যতিক্রমধর্মী দেব ভাবনাই বলতে হবে। এসব দেবতাদের শরীর নেই। অশরীরী আত্মাকে মানুষ আদিম কাল থেকে কল্পনা করে আসছে। তাই দেব কল্পনায় শরীর গুরুত্বহীন হয়েছে, অথবা অশরীরী

আত্মাকে মূর্তরূপ দিতে গিয়ে না-শরীরী ভাবনাই প্রাধান্য পেয়েছে। তাই চৌদ্দজন দেবদেবীর সবাই শরীরহীন। পরবর্তীকালে হিন্দু-রীতি অনুসারে এসব দেবদেবীর হিন্দু নামকরণও হয়েছে। উপজাতিদের পূজিত দেবদেবীদের হিন্দুত্বকরণ প্রক্রিয়াটি একদিন - দু'দিনে সংগঠিত হয়নি। শুধু তাই নয়, দেব-দেবী আরাধনা প্রক্রিয়ায় একদিকে যেমন উপজাতিদের নিজস্ব পদ্ধতি সযত্নে রক্ষিত হয়েছে, তেমনি বহুক্ষেত্রেই হিন্দু-রীতির প্রাধান্যও উল্লেখ করার মতো।

শষ্য উৎপাদনভিত্তিক ধর্মধারার সঙ্গে সম্পর্কিত উৎসব পৃথিবীর সর্বত্র কোন না ভাবে পালিত হয়ে থাকে। আবার পাশাপাশি উর্বরতাকেন্দ্রিক ধর্মধারাও মানুষ কোন না কোনভাবে পালন করে থাকে। নতুন বর্ষণধারায় পৃথিবী স্নাত হতে থাকে। বর্ষা সূচনায় এই বর্ষণধারা ঋতুমতী নারীর ঋতুস্নাতা হবার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। ঋতুর পরবর্তী দিনগুলি নারীর জন্য সন্তানধারণের পক্ষে প্রশস্ততম। পৃথিবীরও অনুরূপ ঋতুমতী হবার দিন হল অম্বুবাচী। এ সময় বর্ষাধারায় সিক্ত হয়ে পৃথিবীর মাটি শস্য ধারণের উপযুক্ত হয়। ঠিক এমনি সময়ে পালিত হয় খারচী পূজানুষ্ঠান। একাধারে শস্য উৎপাদনভিত্তিক (Re-productive) ও অন্যদিকে প্রজনন বা উর্বরতা-কেন্দ্রিক (Firtility) উৎসব হল এই খারচীপূজা। সারা দেশজুড়ে উৎপাদন ও প্রজনন ভাবনার যে ধারা, তার সাদৃশ্য এক্ষেত্রে আশ্চর্যজনকভাবে রক্ষিত হচ্ছে।

খারচি পূজাকেন্দ্রিক সাতদিনব্যাপী যে মেলা বসে তার একটা গৌরববয় দিক আছে। মাটির সঙ্গে সম্পর্কিত মানুষের ভীড়ে ভীড়ে উপচে পড়ে মেলা প্রাঙ্গণ। এর শেকড় অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত। তাই অস্থায়ী অথচ অনিবার্য সামাজিক মেলবন্ধন ঘটে থাকে এই মেলাতেই। এই মেলার সঙ্ঘবদ্ধতার যে শক্তি তা আপাত-বিশৃঙ্খল জনতাকে আন্তরিক শৃঙ্খলে গ্রথিত করে। মেলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে একটি অর্থনৈতিক ভাবনা। কিন্তু মেলার অর্থনীতি কিংবা অর্থনীতির মেলা. মেলার মৌলিক ভাবনা নয়। মেলায় সম্মিলনের যে আকুতি তা আর্থিক প্রশ্ন থেকে উৎসারিত নয়। মেলার মূলে রয়েছে, লোকবৃত্তের বৃহৎ পরিমন্ডলে বসবাসকারী মানুষের সামাজিক মিলনের আকাঙ্খায় আত্মার উৎসজাত প্রেরণা।

মানুষের ধর্মভাবনা আদিম। অনেক অনেক কাল পরে ধর্মভাবনার কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছে মন্দির বা সমার্থক বিশিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠান। তাই প্রায় সমস্ত লোক উৎসব বা মেলা কোন না কোনভাবে ধর্মাশ্রয়ী। বহু মেলার পেছনেই লৌকিক কিংবা পৌরাণিক দেবদেবীর সংস্কারগত বিশ্বাস ক্রিয়াশীল। এমন মেলার তালিকা নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়। এসব মেলায় কখনো পৌরণিক, কখনো গ্রামীণ দেবদেবী, কখনো আঞ্চলিক লোকায়ত বৈভব-বৈচিত্র্য ও ভাবনা নিয়ে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। ত্রিপুরার খারচী পূজাকেন্দ্রিক সাতদিনব্যাপী মেলায় ধর্মভাবনা যুক্ত রয়েছে। সমাজে যখন ধনের বৈষম্য প্রকট হয়ে উঠেনি, তখন গ্রাম্য মানুষেরা নিজস্ব গন্ডীর অতিরিক্ত কিছু ভাবার অবকাশ পেতো না। সেসময় সামাজিক মিলন ক্ষেত্ররূপে মেলার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। ত্রিপুরায় খারচী পূজাকেন্দ্রিক মেলার বয়সের হিসাবে না গিয়েও বলা যায়, সে মেলার গৌরব বৃদ্ধি পেয়েছে, সর্বোপরি, উত্তরোত্তর তা বেড়ে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি উদ্ধৃতি এখানে প্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে। তিনি বলেছেন, "প্রতিদিন মানুষ ক্ষুদ্র, দীন,

একাকী; কিন্তু মেলার দিনে মানুষ বৃহৎ, সেদিন মানুষের সঙ্গে একত্র হইয়া বৃহৎ, সেদিন সে সমস্ত মনুষ্যত্বের শক্তি অনুভব করিয়া মহৎ।" (উৎসব/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

খারচীপূজা শুধু রাজ্যের ককবরক ভাষাভাষী মানুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বাংলাভাষাভাষী তথা রাজ্যের অন্যান্য ভাষাগোষ্ঠীর মানুষেরাও একে নিজের বলে গ্রহণ করেছেন। এই প্রক্রিয়া কয়েক শতক ধরে শুরু হয়েছে। আর এখন তাই খারচী পূজা প্রাঙ্গন মানুষের মহামিলনের প্রাঙ্গণরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। হাটে বাজারে বিরল, নিজস্ব গন্ডীতে সম্ভব নয়, মানুষে মানুষে যেভাব ও মত বিনিময়, এখানে তাই ঘটে চলেছে বহুকাল ধরে। আমোদ-প্রমোদের মধ্যে যা রয়েছে তার মধ্যে রামায়ন গান, কৃষ্ণকথা, কবিগান, মঙ্গলকাব্য পাঠ, বাউল গান, যাত্রাভিনয়, গড়িয়ানৃত্য, লেবাং বুমানি নৃত্য, যাদুকলিজা, লোককাহিনী নির্ভর নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে নিছক চিত্ত-বিনোদন নয় এবং লোকসংস্কৃতির ধারাটির পুষ্টি সাধিত হচ্ছে। বৃহত্তর জনমন্ডলীর চর্চিত সংস্কৃতিকে ধরে রাখা তথা কোন না কোনভাবে রক্ষা করা ও সমৃদ্ধ করার এই প্রক্রিয়া অঞ্চলগতভাবে সম্প্রীতি রক্ষা করা আর বৃহত্তর অর্থে সংহতি রক্ষার সহায়ক হয়ে উঠেছে।

গড়িয়া পূজা ঃ

নবান্নের উৎসব, নববর্ষের সূচনা — কেবলমাত্র ত্রিপুরার উপজাতি জনজীবনে নয়, বৃহৎ-বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে ভারতের প্রায় সর্বত্র কোন না কোনভাবে পালিত হচ্ছে। ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত বলেন, কৃষিকেন্দ্রিক সভ্যতার মূল অর্থনীতিক ভিত্তি যা, সেই শস্য যখন নতুন থাকে, তখনকার চন্দ্রসূর্যের অবস্থানকে তিথিগতভাবে হিসাব করে একদা পৃথিবীতে নববর্ষের প্রথা চলিত হয়েছিল। শস্য ঘরে তোলা উপলক্ষে আদিবাসীদের মধ্যে যে ধরণের উচ্ছ্বাস উৎসাহ দেখি, তারই সমধর্মী নববর্ষের উৎসব। উর্বরতাকেন্দ্রিক সংস্কৃতিরই লব্ধফল এটি। আদিম থেকে প্রাচীন, তার থেকে মধ্যযুগ—এমনকি একাল অবধি মানুষের মনে যে যাদু বিশ্বাস সক্রিয় ছিল এবং আছে, উৎসবের অঙ্গ হিসাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠান তাকেই প্রতিফলিত করে। চীনে একসময় পুরনো বছরের প্রতীক কাগজের ড্রাগন পুড়িয়ে 'পুরাতন বৎসরের জীর্ণক্লান্ত রাত্রি'কে ভষ্মসাৎ করাই হোক, আমাদের বিঘ্ন - বিনাশন (এক বিঘ্নরাজ) গণপতির পূজা করাই হোক, আর পশ্চিম আফ্রিকার কোনো কোনো উপজাতির মধ্যে নতুন ফসল, নতুন বছরের মঙ্গল কামনায় ক্ষেতে নারী-পুরুষের মিলনোৎসবই হোক —সবের পেছনেই এই জাদুর প্রত্যয়।" গড়িয়া দেবতা হিসাবে একটি বাঁশকে বেছে নেওয়া হয়। দেবতাকে বাঁশ প্রতীকরূপে পূজা করা সর্বপ্রাণবাদের উৎসবের নির্দশন। রঘুবীর সিন্‌হা তাঁর Religion and culture of North Eastern India গ্রন্থে বলেছেন, It is important to note that the bamboo tree occupies the same high position as enjoyed by the bel tree.............I would like to give a faithful example from West Bengal, like the Garia Puja, a slander bamboo pole with the brances and the leaves are also adored in the gambhira festival."

গড়িয়া পূজার দেবকল্পনা থেকে শুরু করে ধর্মভাবনার প্রতিটি ক্ষেত্রে যে সংস্কৃতি ভাবনা বিজড়িত রয়েছে, তার সঙ্গে সংলগ্ন সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে আশ্চর্য সাদৃশ্য আমাদের বিষ্মিত

করে। গড়িয়া দেবতাকে কেন্দ্র করে মদ্যপানের এরকম খোলামেলা আসর অন্যত্র হয়ত বসে না।' কিন্তু 'নতুন চালে রসে' মত্ত হওয়া, 'চাঁদের রাতে প্রান্তরে চাষার নাচ' ও নবান্নের ঘ্রাণ নিয়ে বিবশ হওয়া তো বাঙ্গালী সমাজেও দেখা যায় না এমন নয়। গড়িয়াকে কেন্দ্র করে যে নাচ-গান, আজ প্রকাশ্যে আসার সুযোগ লাভ করেছে। দেবতাকে স্বাগত জানানো, তার গুণকীর্তন করার জন্য গানকে অবলম্বন করার পদ্ধতি সর্বত্রই চালু রয়েছে। গড়িয়া নৃত্যের কাঠামোর সঙ্গে কেউ কেউ ধামাইল নৃত্যের সাদৃশ্যের কথা বলে থাকেন। গড়িয়া কৃষিভিত্তিক দেবতা। তাই এই লোকনৃত্যের অন্তর্কাঠামোতে কৃষি জীবনের প্রতিচ্ছবি ধরা পড়েছে। মানুষ প্রথমে গাছ-পাথর ইত্যাদির মধ্যে দেবত্ব আরোপ করেছে। সর্বপ্রাণবাদ ভাবনার প্রভাব সঞ্জাত এই গড়িয়া দেবতার পূজা, যেখানে বাঁশকে দেব-প্রতীক ভাবা হয়ে থাকে। আবার, যদিও তা নয়, তবু গড়িয়াকে গণেশ পূজাও বলা হয়ে থাকে। সম্প্রতি একটি তথ্য হাতে এসেছে। তাহল, গড়িয়ার মূর্তি কল্পনাও করা হয়েছে।[২] প্রাথমিকভাবে ছবি এঁকে গড়িয়ার রূপদান করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, চন্তাই 'প্রথা' মান্য করে গড়িয়া প্রতীক ছবি ('মূর্তি'কে, ধরে নেওয়া যায়) কে অর্ঘ প্রদান করেছেন। আবার গড়িয়ার আনন্দ আসরে প্যান্ট-শার্ট পরিহিত যুবক যুবতীরা নৃত্যে রত হয়েছেন।[৩] এখানে সংস্কৃতির যে মেলবন্ধন তা বহুব্যাপকতা প্রাপ্ত হয়েছে।

আলোচনার গতি ভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে দিলে, বাংলার লোকসংস্কৃতির তত্ত্বগত শ্রেণী বিভাজনের কথা উল্লেখ করতে হয়। ডঃ দুলাল চৌধুরী কৃত বিভাজনে বাংলার লোকসংস্কৃতির চব্বিশ পর্বের কথা বলা হয়েছে। ত্রিপুরার উপজাতি লোকসংস্কৃতির আঙ্গিকগত অনুরূপ বিভাজনের জটিলতায় প্রবেশ না করেও বলা যায়, ত্রিপুরী লোকসংস্কৃতির জগৎকেও অনুরূপ বিভাগে ভাগ করা যেতে পারে। তার মধ্যে একটি বিশিষ্ট ও সমৃদ্ধ শাখা হল লোককাহিনী। ত্রিপুরার উপজাতি লোককাহিনী সংগ্রহের ভান্ডার তেমন সমৃদ্ধ নয়। তথাপি, বর্তমানে যে সংগ্রহ রয়েছে, সে সংগ্রহটির মূল্যও অপরিসীম। আবার লক্ষ্যনীয় হল, আন্তর্জাতিক মোটিভ (Type and Molif Index) এর তালিকা বহির্ভূত নয় এগুলো। অর্থাৎ, ত্রিপুরী উপজাতি লোককাহিনীগুলির পাঠ অন্যত্রও পাওয়া যায়। যেমন, একটি লোককাহিনী হল ''বানরবর''। অনুরূপ একটি কাহিনীর উল্লেখ করেছেন ডঃ দীনেন্দ্র কুমার সরকার তাঁর '' মানবসভ্যতার কুমারীবলি'' গ্রন্থে। 'কুমারীর বানর স্বামী' বা 'The girl who married a monkey' এই কাহিনী আসামে লাখের জনগোষ্ঠীর বলে উল্লেখ রয়েছে তাঁর গ্রন্থটিতে। লুসাই পাহাড়ে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই কাহিনীটি প্রচলিত রয়েছে। এই যে লোকসংস্কৃতির জগতের সূত্র ধরে পারস্পরিক সম্পর্কের অন্তর্প্রবাহ এর গুরুত্ব অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

স্মরণাতীত কাল ধরে লোককাহিনী বলার এই যে প্রবণতা, যা প্রতিটি জাতি গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে প্রচলিত, তা কোন না কোনভাবে একে অন্যের মধ্যে সম্পূর্ণ বা খন্ডভাবে হলেও মিলে মিশে গেছে। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষ সমভাবনায় ভাবিত হয়ে অথবা মুখেমুখে বাহিত হয়ে বা অন্য কোন মাধ্যমের দ্বারা লোককাহিনী বিভিন্ন চেহারায় যত্রতত্র ছড়িয়ে পড়েছে। এইসব লোককাহিনীর অন্তর্কাঠামোগত সাদৃশ্য একটি উদাহরণের সাহায্যে তুলে ধরা যেতে পারে।

দিব্যজ্যোতি মজুমদার তাঁর "বাঙলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেকস্' গ্রন্থে 'পান্তাবুড়ির গল্প' টিকে স্থান দিয়েছেন। পান্তাভাত-চোরকে শাস্তি দেবার জন্য সাহায্য করেছিল শিঙি মাছ, বেল, গোবর ও ক্ষুর। অনুরূপ একটি লোককথা রয়েছে ত্রিপুরার রূপকথা বা 'কেরেং কথমা' গ্রন্থটিতে। এখানে 'মুরগীর পিঠে বানানোর গল্পে" পিঠে চোর বেড়ালকে শাস্তি দিয়েছিল মুরগী। আর মুরগীকে সাহায্য করেছিল ডিম, শিঙ মাছ, চটার (বাঁশের পাতলা অংশ) ছুরি। এখানে বেল আর ডিমের ভূমিকা এক। এখানে অবশ্য গোবরের কোন ভূমিকা নেই। বাংলা গল্পটিতে আন্তর্জাতিক টাইপ ও মোটিফ্ বিন্যাস এরূপ ঃ-

টাইপ ঃ ২১০ ক — শিঙি, বেল, গোবার, ক্ষুর (এখানে বাঁশের ফালি)

মোটিফ ঃ

(১) বি ৪৭০ — উপকারী মাছ

(২) বি ২৭১ — মানুষের জন্য পশু কাজ করে

(৩) এফ্ ৮১৪.৩ — কথা বলা ফল

(৪) কে ৩০১.১ — চোর

(৫) কে ৭৩৫ — ফাঁদে ফেলে বন্দী করা

একই কাঠামো লোককথা দু'টির, অথচ মোড়ক দু'টি পৃথক। কিন্তু আভ্যন্তরীণ সাদৃশ্য ঘটে গেছে মানুষের অজ্ঞাতে । বলা বাহুল্য, এককালে যে পারস্পরিক সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের সম্পর্ক, তা দুর্লক্ষ্য নয়। অনুরূপভাবে, প্রবাদ প্রবচনেরও একটি সম্পর্কযুক্ত জগৎ রয়েছে, যার গন্ডী বিশ্বব্যপ্ত। মানুষের অভিজ্ঞতা, মূল্যবোধ, পছন্দ - অপছন্দের মানদন্ড যেহেতু প্রায় একই রকম, তাই এক্ষেত্রে সাদৃশ্যও লক্ষনীয় দিক। বলা হচ্ছে, 'আং হামবাই বেবাং কাহাম' বাংলায় বলা হচ্ছে, 'আমি ভাল হলে জগৎ ভাল'। ককবরকে বলা হয়, 'উষ্ঠা খুকাই লামা চিনিও' অর্থাৎ হোঁচট লাগলে পথ চেনা হয়। আবার 'তল হুংকাই ফিকুং' অর্থাৎ 'বাকী হল ফাঁকি' ইত্যাদি। লোকসংস্কৃতির জগতে পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে যে সাদৃশ্য তার ঐতিহ্য দীর্ঘকালের।

লোকসংস্কৃতির আরো বহু উপাদান রয়েছে, যার সাহায্যে দু'টি সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্ক আবিষ্কার করা কঠিন নয়। এই রাজ্যে দীর্ঘকাল ধরে দু'টি সম্প্রদায়ের মানুষের সহাবস্থানের ফলে অধিক সংখ্যক মানুষের যে সংস্কৃতি, তার মধ্যে সাদৃশ্য গড়ে উঠেছিল। আর যে কারণে সহাবস্থানের ক্ষেত্রে কোন বাধার সৃষ্টি হয়নি। লোকসংস্কৃতি তার স্বাভাবিক গতি অনুসারে এগিয়ে চলবে, এটাই স্বাভাবিক। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার প্রভাবে তথা বিশ্বায়নের প্রভাবে সমাজ পরিবর্তনের ধারায় সংস্কৃতির জগতেও ঢেউ লেগেছে। পারিপার্শ্বিকতার দ্রুত পরিবর্তনে ঐতিহ্যবাহিত সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে উঠেছে। নতুন কালের প্রভাবে পুরাতন তাৎপর্য বর্জন ও নতুন তাৎপর্য গ্রহণ লোকসংস্কৃতির জগৎ ক্রমে ক্রমে বদলে দিচ্ছে।

আবার সমাজজীবনে যখন কোন না কোনভাবে আলোড়ন সৃষ্টি হয়, তখন যে কোন ধরনের সংস্কৃতিচর্চাই ব্যাহত হয়। স্বতঃস্ফূর্ত রূপান্তর তো দূর অস্ত, তাকে রক্ষা করাই তখন কঠিন হয়ে পড়ে। তবু লোক সংস্কৃতির উপাদান 'লোকরত্ন' সংগ্রহ করে রাখার প্রবণতা

ইদানিংকালে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ত্রিপুরাতেও একসময় একটা জোয়ার এসেছিল— লোক-সংস্কৃতির উপাদন সংগ্রহ করা এবং লোকসংস্কৃতির চর্চা তখন গুরুত্ব লাভ করেছিল। ফিন্ল্যান্ড নাম দেশটি এরূপ লোক উপাদান সংগ্রহ করে পরবর্তী গবেষণার দ্বারা প্রমাণ করেছে, সেখানে কোন জাতিগোষ্ঠী বিচ্ছিন্ন নয়, চিন্তা-ভাবনায় তথা সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্প্রীতির অন্তর্প্রবাহ প্রবহমান রয়েছে সেখানে।

পারস্পরিক প্রীতি ধরে রাখার স্বার্থে অধুনা সরকারী তথা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের উদ্যোগ অত্যন্ত আশাসঞ্চারক। এক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতি একটি মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। তবে যথার্থ লোক উপাদানকেই যেন এখানে কাজে লাগানো হয়। অন্যথায় তা লোকবিকৃতি (Fakelore) হবে। দুনিয়াব্যাপী মানুষের অন্তরের সঙ্গে অন্তরের সম্পর্ক, যে সংস্কৃতি স্মরণাতীত কাল থেকে বহন করে চলেছে তা হল লোকসংস্কৃতি । সুতরাং, সম্প্রীতি রক্ষায় এই বিশাল সম্ভাবনাময় দিকটি কিভাবে কাজে লাগানো যায় তা ভাবা দরকার। শুধুমাত্র একটি রাজ্যের সম্প্রীতিরক্ষা যেখানে কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেখানে আন্তর্জাতিক ঐক্যস্থাপনের সহায়ক শক্তিরূপে লোকসংস্কৃতি একটি কার্যকরী ভূমিকা পালনে সক্ষম। লোকসংস্কৃতিবিদ্ Alan Dundes তাঁর Ways of studying Folklore গ্রন্থে বলেন, "The point is that since so much of Folklore is international in distribution, the sutdy of it must be of equal scope. It is a great pity that most of the peoples of the world do not realize how much folklore they have in common; it could be an important unifying force."

সহায়ক গ্রন্থ ঃ

(১) ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত — পুজা পার্বনের উৎসকথা (কলকাতা ১৯৮৪)

(২) ঐ — লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ (কলকাতা ১৯৯৫)

(৩) ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়— লোকসংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও স্বরূপসন্ধান (কলকাতা ১৯৮৫)

(৪) Pradip Bhattacharjee – Tribal Pujas and Festivals in Tripura

(৫) কুমুদ কুন্ডু চৌধুরী — কেরেং কথমা (আগরতলা-১৯৯৪)

(৬) ঐ — ত্রিপুরী টোটেম ককবরক প্রবাদ ও অন্যান্য (আগরতলা-২০০)

(৭) দিব্যজ্যোতি মজুমদার — বাংলা লোককথার টাইপ ও মটিফ ইনডেকস্ (কলকাতা ১৯৯৩)

(৮) সনৎ কুমার মিত্র (সম্পা.) — লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা (নিরবচ্ছিন্ন সংখ্যাগুলি)

(৯) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — উৎসব

(১০) গড়িয়ার ছবি সংগ্রাহক ঃ শ্রীমান রথীন দেববর্মা বিক্রম দেববর্মা ও রণবীর দেববর্মা সন্তোষ দেববর্মা । স্থান ঃ সদরের লেফুঙ্গা থানাধীন হাবিলদার পাড়া। তারা সবাই দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র। (২০০২)

‘প্রসঙ্গ ঃ ত্রিপুরী লোককথা’

গল্প বলা এবং গল্প শোনার রীতি ও অভ্যাস মানুষের মধ্যে প্রচলিত ছিল সুদূর অতীত কাল থেকে। আমরা এ যুগকে ‘আধুনিক’ অভিধায় নির্দেশ করলেও গল্প বলা এবং গল্প শোনার অভ্যাস ত্যাগ করতে পারিনি আজও। এই ‘বলা’ ও ‘শোনা’র মাধ্যম পাল্টেছে, সঙ্গে সঙ্গে এর ধরণ ধারণও বদলেছে। সময়ের ব্যাপারটাও সংকুচিত ও প্রসারিত হয়েছে প্রয়োজন অনুসারে। কোন স্থানের মানুষ গল্প বলেনি এবং গল্প শোনেনি প্রাক্ ইতিহাসের যুগ থেকে অতি সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত এমনটি কখনোই ঘটেনি। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তা সম্ভব নয় বা হয়নি। বৃহৎ বঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শুরু করে আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া, আফ্রিকার, মানুষ গল্প বলেছে। এই গল্প বলার রীতি তর্কাতীতভাবে অত্যন্ত প্রাচীন।

গল্প-কথকেরা গল্প বলার কাজটি করতেন। এসব গল্প বলিয়েদের কাছ থেকে গল্প শুনতো বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রোতারা। তাদের বয়সের ভিন্নতা আছে, স্ত্রী-পুরুষ উভয় লিঙ্গের মানুষ গল্পের আসরে বসে গল্প-কথকের বলা কাহিনীর রস আস্বাদন করতো। কথকেরা তাদের বলার যাদুতে ঘন্টার পর ঘন্টা মুগ্ধ করে রাখতো সমস্ত শ্রোতাদের। রামায়ণে ও এমন গল্প কথকের সন্ধান পাওয়া যায়। মাতুলালয়ে বিষণ্ণ ভারতকে ‘আলাপিনি’ বা কথা ব্যবসায়ী বা বৃত্তি ভোগী গল্প কথক গল্প বলে আনন্দ সঞ্চারের চেষ্টা করেছেন। বৌদ্ধ যুগে মালিনীরা অন্তঃপুরবাসীদের বসন ভূষণ পরিধান, কেশ বিন্যাস প্রভৃতি কাজের সঙ্গে সঙ্গে গল্প বলার কাজও চালিয়ে যেত। বৌদ্ধ পাল রাজাদের গুণকীর্তন করতেন আলাপিনীরা পুরবাসীদের কাছে। তারা সেগুলো গানের আকারে পরিবেশন করতেন। “ঢাকা সাভারের ভারতচন্দ্র রায় নামক এক কথা ব্যবসায়ীও এই সেদিন ৬০ টাকা বেতনে ত্রিপুরার রাজসভায়রাজা, রাজপুত্র ও রাজপরিবারের সকলকে নির্দিষ্ট সময়ে গল্প শোনাতেন।” (লোকসাহিত্য ১ম খন্ড ঃ আশরাফ সিদ্দিকী, মুক্তধারা, ১৯৭৭)। উপনিষদ জাতক, কথা-সরিৎসাগর, হিতোপদেশ , পঞ্চতন্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত এইভাবেই বলেছেন গল্প-কথকেরা বিভিন্ন সময়ে। সেগুলোর লেখ্যরূপ তো অনেক পরের বিষয়। তেমনিভাবে ‘ত্রিপুরার ইতিহাস’ অর্থাৎ ‘রাজমালা’র অনেকটাই লোকসংস্কৃতির উপকরণে সমৃদ্ধ। যার মধ্যে লোক পুরাণ (Myth), লোককথা ও কিংবদন্তী (Tale ও Legend) যেমন আছে তেমনি লোকসংস্কৃতির অন্যান্য বিষয়গুলোও এর মধ্যে রয়ে গেছে। যেখানে গল্প কথক হলেন দুর্লভেন্দ্র চন্তাই। তিনি যা বলেছেন গল্পাকারে, রাজার সভাপন্ডিত শুক্রেশ্বর ও বানেশ্বর তা লিপিবদ্ধ করেছেন ছন্দোবদ্ধরূপে।

গল্প-কথকেরা মেধার অধিকারী ও প্রকাশের ক্ষমতায় দক্ষ। তিনিও হয়তো সে গল্প-কাহিনী শুনেছেন অন্যকোন গল্প-কথকের কাছ থেকে। সবই যে গদ্যাকারে বর্ণিত হয় তা নয়, এর মধ্যে মিশে আছে ছন্দোবদ্ধ কোন কোন অংশ আবার সেগুলো কখনো কখনো সংগীতও। পুরুষানুক্রমে গল্প কথক ও শ্রোতার মধ্যে বলা এবং শোনার সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে। সেই শ্রোতাই আবার সে রকম দক্ষ হলে গল্প-কথক হয়ে গল্প পরিবেশন করেছেন। বলার ফাঁকে

এর অভ্যন্তরে নতুন কোন "গল্প-অনু" স্থান করে নিয়েছে। এইভাবে সেই কাহিনী সঞ্চারণশীলতা বা ভ্রাম্যমানতা লাভ করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিগত শতাব্দী থেকে এইসব গল্প-কাহিনী বা লোককাহিনী, তথা সামগ্রিকভাবে লোকসংস্কৃতির উপাদানসমূহ সংগ্রহের জন্য ব্যাপক তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। আবার সেগুলোকে অবলম্বন করে গবেষণার কাজও শুরু হয়েছে। সেইসব গবেষণার ফলে জানা গেছে বিশ্বের সমগ্র লোককাহিনীর মধ্যে একটি অন্তর্লীন যোগসূত্র রয়েছে।

বৃহৎ বঙ্গের অন্তর্গত ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিপুরী উপজাতি মানুষেরা বাস করছেন দীর্ঘকাল ধরে। তাদের মধ্যেও গল্প বলার প্রবণতা আছে স্বাভাবিকভাবেই। এখানেও শ্রোতা গল্প-কথকের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। আর সেই সাহিত্য সম্পদ এতকাল ধরে গল্প কথক ও শ্রোতার মধ্যে বেঁচে আছে। এইসব মুখে মুখে প্রচলিত গল্প-কাহিনী অল্পকাল ধরেই সংগ্রহের একটা প্রচেষ্টা চলছে। ত্রিপুরী-উপজাতিদের লোককাহিনী সংগ্রহের ইতিহাস যেমন নবীন, তেমনি সংগৃহীত লোককাহিনীও সংখ্যায় খুব বেশী নয়। অল্প হলেও, যথাযথভাবে সংগ্রহের ফলে ঐ সব লোককাহিনী যেমন রক্ষা পেল, তেমনি একটি লিখিত রূপও পাওয়া গেল এদের।

লোককাহিনীগুলোর স্রষ্টা হলো মানুষের সৃষ্টিশীল মনন। প্রবহমান কাল ধরে জনসমাজের মধ্যে প্রচলিত থেকে 'গল্প-অনু' সংযোজিত হয়েছে এসব কাহিনীগুল্যোতে, আবার এদের কাঠামো ঠিক রয়ে গেছে। সব কাহিনী একই সময়ে সৃষ্টি হয়নি, আবার নিশ্চিত করে এদের কাল নির্দ্ধারণ করাও কঠিন কাজ। এগুলোর কোন কোনটির মধ্যে লোকপূরাণের বা মিথের উপকরণ রয়ে গেছে। লোককাহিনীর মধ্যে মিথ বা লোকপূরাণই প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল কোন গল্প-কথকের ভাবনায়, যা গল্পাকারে শ্রোতাদের কাছে পরিবেশিত হয়েছিল। তার পরবর্তীকালে জন্ম হয়েছে লোককথা ও কিংবদন্তী। গল্প-কথক (Tale ও Legend) তথা স্রষ্টাদের মনন আবিস্কারের দায় পাঠকের রয়েছে, আবার লোককাহিনীগুলোর মধ্যে সময় যে ছাপ রেখে গেছে তা আলোচনার বিষয় হয়ে উঠতে ও বাঁধা নেই।

'কুকী'দের মধ্যে একটি লোককাহিনী হল 'ভূমিকম্প'। মাটির নীচে বাস করে এক কচ্ছপ। সে পৃথিবী ধারণ করে রেখেছে তার পিঠে। তার আছে এক গোবরে পোঁকা— সেটি তার চাকরের দায়িত্ব পালন করে। পৃথিবীর উপরের জীবজন্তুর বিষ্টা কচ্ছপকে এনে দিলে তা সে খায়। এইভাবে সে বেঁচে আছে। গোবরে পোঁকা বা 'খেবুং' একদিন আলস্য বশে বলে যে উপরের সব প্রাণী মরে গেছে। কিন্তু কচ্ছপ তা মানতে চায় না। তাই কথাটির সত্যতা যাচাই এর জন্য কচ্ছপ গা-ঝাড়া দেয়। এর ফলে ভূমিকম্প হয়। উপরের প্রাণীরা চেঁচিয়ে বলে যে তারা সবাই বেঁচে আছে।' এই পর্যন্ত বলে, একটি গল্প অনু যুক্ত হয়েছে। 'ভূমিকম্পের ফলে মুরগীর ডিম নষ্ট হয়ে যায়'।

লোককাহিনীর প্রধান শাখা লোকপুরাণ বা মিথ। আবার লোকপুরাণের শ্রেণী বিভাজনে বলা হয়, সর্বপ্রথমে সৃষ্টি হয়েছিল সৃষ্টি ও প্রলয় বিষয়ক লোকপুরাণ। আদিম মানুষের অপরিণত বুদ্ধি এক সময় প্রকৃতির রহস্যভেদের কৌতুহলে মগ্ন থেকেছে। তখন যা মানুষের জ্ঞান, বিদ্যার

অতীত, যার কারণ ব্যাখ্যা করা সম্ভব ছিল না মানুষের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে তার ব্যাখ্যা হয়েছে এভাবেই। ইরোকোয়া রেড ইন্ডিয়ানদের মধ্যে প্রচলিত একটি লোকপুরাণে আছে, 'কাছিম-বুড়োর খোলের ওপর সমস্ত পৃথিবীটাই রাখা আছে। বুড়ো একটু যেই নড়াচড়া করে, কয়েকদিন পরে - পরে, অমনি ভূমিকম্প হয়।' (লোকপুরাণে সৃষ্টি ও প্রলয়ের তত্ত্ব-মাধুরী সরকার)।

ভূমিকম্প হবার কারণ যে কচ্ছপের নড়াচড়া করা, দুটো লোকপুরাণেই তা ব্যক্ত হয়েছে। এই দুটো স্থানের দূরত্ব যথেষ্ট, অথচ দু'স্থানের মানুষের ভাবনার সাযুজ্য আমাদের বিস্মিত করে। পৃথিবীকে কূর্মপৃষ্ঠের সঙ্গে তুলনা করে দেখার ভাবনা মানুষের মাথায় অনেক আগেই এসেছিল। মহাভারতে সৃষ্টি ও ধ্বংস সম্পর্কিত যে বিবরণ আছে সেখানে ও অনুরূপ ভাবনাই ব্যক্ত হয়েছে। আবার ডিমকেও পৃথিবীর আকারের সংগে তুলনা করা হয়েছে কোন কোন লোকপুরাণে।

'বানর বর' একটি বিখ্যাত লোককাহিনী। জুম-চাষ নির্ভর কৃষি জীবন এই কাহিনীর পটভূমি। ভ্রাম্যমান চাষবাস নির্ভর জীবনযাপন আদিম উপজাতি জনগোষ্ঠীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আদিম উপজাতি জনজীবন ছিল মাতৃতান্ত্রিক। এমনি সমাজে মেয়েরা শুধুমাত্র জুমে ফসল সংগ্রহেই যাচ্ছে না বরং জুম চাষের কাজে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। বানরকে চাষের জমি থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্য কুকুর সারাক্ষণ ঘেউ ঘেউ করছে । জুমে শ্রান্ত মেয়েরা তাদের চিরাচরিত পোষাক রিয়া রিগনাই (বক্ষাবরনী, শাড়ী) খুলে রিতুকু পরিধান করে জলে স্নান করতে নামে। একটি বানর প্রতিশোধ নেবার সুযোগ খুঁজছিল। সে এসে চুপিসারে মেয়েদের সমস্ত কাপড় তুলে নিয়ে গাছের উঁচু ডালে চেপে বসে। বেগুনের বদলে প্রথম ছয় জন মেয়েকে কাপড ফেরত দিয়ে দেয়। কিন্তু বুদ্ধিমান বানর সপ্তম মেয়েটির উপর রাগান্বিত ছিল অতিমাত্রায়। কারণ সে-ই কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল। বানরটি শেষ মেশ মেয়েটিকে কাঁধে তুলে নিয়ে পালিয়ে যায় গভীর বনে।

বানরটি শুধুমাত্র বুদ্ধিমান নয়, সে মেয়েটিকে বিয়ে করে সংসার পাততেও আগ্রহী। এখানে, 'বানরের মানুষকে বিয়ে' লোককাহিনীর 'কাহিনী অংশ' বা Motif যার একটি আন্তর্জাতিক রূপ আছে। 'শেষ পর্যন্ত মেয়েটি বাধ্য হয়ে বানরের সঙ্গে সংসার করতে থাকে। আর তাদের একটি পুত্র সন্তান জন্মায়। তার নাম রাখা হয় 'ততে'। মেয়েটি কিন্তু পালাবার চেষ্টা করতেই থাকে। একদিন টকফল খাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে বানর দূরে চলে যায় তা সংগ্রহ করার জন্য। মেয়েটি পালাবার সুযোগ পেয়ে যায় কিন্তু তার মন, তার সংসারের জন্য বেদনায় টন টন করে উঠে।

বানরতো স্ত্রী-পুত্রকে না পেয়ে পাগলের মত হয়ে যায়। কন্যা হরণ করে বিবাহ করা তো সব সমাজেই প্রচলিত আছে। তাই বানর এটাকে স্বাভাবিক মনে করেছিল। বানর দুঃখ- সঙ্গীত গাইতে গাইতে রাস্তায় বেড়িয়ে আসে। 'কথা বলা বানর' একটি Motif বা কাহিনী অনু (বি ২১১.২.১০)। বানরের 'দং দরং' সঙ্গীতে স্ত্রী-পুত্রকে কাছে না পাবার বেদনা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত সে তার স্ত্রী পুত্রকে পেয়ে যায়। শ্বশুরবাড়ীতেও সে আদর যত্ন পেতে

থাকে। জামাই এর আসাকে কেন্দ্র করে শ্বশুর বাড়ীতে পান-ভোজনের উৎসব শুরু হয়ে যায়। সবার সংগে বানরও যথেষ্ট নেশা করে ফেলে। তাই তার স্ত্রী হাত ধরে টং ঘরে তাকে ঘুম পাড়ায়। যেখানে টং এর পাটাতনের এর মুখ খোলা, সে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ে। রাতে তার স্ত্রী তাকে বলে আরো সরে ঘুমাবার জন্য। এইভাবে বার বার সরতে সরতে ততের বাবা একসময় ফাঁক দিয়ে নীচে পড়ে যায়। নীচে ছিল কাঁদা আর শুকরের পাল। বানর কাদায় গেঁথে যায় আর শুকরগুলো ধারালো দাঁত দিয়ে বানরের শরীর ছিন্নভিন্ন করে দেয়।

বানর যে মানুষের আদি-পুরুষ, কাহিনীতে তার একটা স্বীকৃতি আছে। কিন্তু মানুষের আভিজাত্য বানরকে স্বীকৃতি দিতে রাজী নয়। মানুষ 'বানরের সমগোত্রীয়' এই সত্যটুকু কাটিয়ে উঠতে চাইছে। তাছাড়া বানর ভিন্ন টোটেমের মানুষও হতে পারে। যার সামাজিক রীতিনীতি ভিন্ন হওয়ায় তার শ্বশুর বাড়ির লোকজন তাকে গ্রহণ করতে পারেনি। তাই তার পরিণাম হয়েছিল মৃত্যু। গল্পে সামাজিক রীতি-নীতির উল্লেখ আছে। বানর বর প্রথম শ্বশুর বাড়িতে এলে তাকে কেন্দ্র করে পান-আহার ও আনন্দ উল্লাস শুরু হয়ে যায়। বানর হয়েও তার মধ্যে মানবিক গুণের উপস্থিতি, এই কাহিনীর মধ্যে দেখা যায়। বরং কাহিনীর অন্তিমে মানসিকভাবে পীড়িত বানরের প্রতি সহানুভূতি নয় আছে একধরনের আদিম উল্লাস। প্রসঙ্গতঃ লোককাহিনীটির একটি বিশেষ **Motif** হল কৃতজ্ঞ পশু অকৃতজ্ঞ মানুষ ডবলিও. ১৫৪.৮, স্বামীকে স্ত্রীর প্রতারণা (বিশ্বাসঘাতিনী বৌ)- কে.২২১৩।

'অচাই' বা 'পুরোহিত' গল্পটির কাঠামোর সংগে বাংলার ব্রতকথার একটা আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। এই লোককাহিনীটির পটভূমি হল জুমচাষের প্রস্তুতি পর্ব। জুম চাষের জন্য টিলাভূমি প্রস্তুত করাটা এক বিরাট কর্মযজ্ঞ। বিভিন্ন পরিবারের স্ত্রী পুরুষ, প্রতি পরিবারে জুমের জমি তৈরীর জন্য শ্রমদান করেন । এক গরীব বিধবা মায়ের অলস ছেলে মায়ের ঘাড়ে বসে দিব্যি খায়-দায়। কিন্তু কাজে যেতে চায় না। এমন ছেলে জুম চাষের প্রস্তুতি পর্ব সম্পর্কে কতদূর খবর রাখতে পারে? দরিদ্র সংসারে এমন অলস ছেলেরা বরাবরই সমস্যা বা বিপদ সৃষ্টি করে থাকে।

হাতে তৈরী কারুশিল্প অনেক আগে থেকেই লোকজীবনে ব্যবহৃত হত। এসব বাঁশ বেতের জিনিস। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে বাঁশ বেত মূল্যবান উপকরণ হিসেবে কাজে লেগেছে। আর তাই দেবতার আসনে বাঁশকেই প্রতীকরূপে পূজা করেছেন উপজাতি জনসমাজ। এই গল্পে 'চেম্পাই' (ছোট খাড়া, যাতে করে ছোট ছোট দরকারী জিনিস বয়ে নেয়া হয়) এমনি একটি প্রয়োজনীয় সামগ্রী। মাথায় টান রেখে পিঠে চেম্পাই ঝুলিয়ে ছেলে জুমে যায়। তারপর আবার দ্রুত ফিরেও আসে। একটি মাত্র জংলী 'ঘিলা' লতা কেটে সে চলে এসেছে। লতা শুকিয়ে এসেছে। মা ছেলেকে ঠেলে ঠুলে বনে পাঠায়। জুম পোড়া দেবার দিন বিধবা সাত জুমের মাটি, সাত পুকুরের জল, সাতটা মশাল বেঁধে দিলে। লোককাহিনীতে সংখ্যার একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। এক, তিন, পাঁচ, সাত প্রভৃতি বেজোড় সংখ্যাগুলি অনেক ক্ষেত্রে শুভ-প্রতীক বহন করে। আবার এক ডাকে সাড়া দেওয়া অশুভ, বা বাংলাদেশে এক শালিখ দেখা,

এক চোখে হাত দেওয়া প্রভৃতি বিভিন্ন অশুভ দ্যোতনা 'এক' সংখ্যাটি বহন করে। এখানে 'সাত' সংখ্যাটি শুভ হয়ে দেখা দিয়েছে।

কাহিনীতে দেখা যায় বৃদ্ধা মা ছেলেকে বন্দনা মন্ত্র শিখিয়ে দিয়েছে। এ মন্ত্র দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়েছে। যেখানে জুমে আগুন দেবে সেখানে দেবগণ বা অশরীরি আত্মার বাসস্থান থাকতে পারে। যাদু বা মন্ত্রের ব্যবহার অত্যন্ত প্রাচীন। শুধুমাত্র বাংলাদেশে নয় হাজার বছর আগেও রোম, গ্রীস ও মিশর প্রভৃতি অঞ্চলে মন্ত্রের ব্যবহার ও এসবের উপর বিশ্বাসের কথা জানা যায় বিভিন্ন সূত্র থেকে। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি, উপজাতির মধ্যে মন্ত্রের ব্যবহার ছিল, আজও তার ব্যবহার রয়ে গেছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে।

বিধবা মা ছেলেকে মন্ত্র পড়ার বা মন্ত্রের দ্বারা দেবতার বন্দনার কথা বললেও তা করেনি সে। তার ফলে অনর্থের সূত্রপাত। ছেলেটি মায়ের নিষেধ অমান্য করেছে। এই নিষেধ অমান্য করা হল 'টাবু-ভঙ্গ' করা। যাকে লোকসংস্কৃতি বিদগণ সি. ০-৯৯৯ এর মধ্যে শ্রেনীবদ্ধ করেছেন। বন্দনা মন্ত্র প্রয়োগ না করায় নাগরাজের সন্তানেরা পুড়ে মারা গেল। নাগরাজা ক্ষিপ্ত হয়ে বুড়ির বাড়ি সাতপ্যাচে আবদ্ধ করে ফেলল। বৃদ্ধা বিধবা এবার ছেলেকে মামা'র শরণাপন্ন হতে বলল। যাকে পূজো দিতে হলে চাই কাল মোরগ, কিছু খই, এক বোতল মদ, একটু হলুদ। দা, কলাপাতাও লাগবে। দেবতাকে আহ্বান জানাতে হবে। মোরগ এবং মদ্য উপজাতি জনজীবনে যেমন অপরিহার্য, তেমনি বাংলার ব্রতকথায় বা বাঙ্গালী পার্বণে ব্যবহৃত, হলুদ, কখনো কখনো খই, এর ব্যবহার আবশ্যিক অঙ্গ। এখানে আশ্চর্যজনকভাবে দেবতার পূজা উপকরণের সাদৃশ্য ঘটে গেছে। বেলা শেষে দেবতা লুঙ্গা থেকে (ঢালু বা নীচু জমি থেকে) সাড়া দিলেন। তাকে 'মামা' ডাকা, দেবতার সংগে নৈকট্য তৈরী করা বা তাকে তুষ্ট করার বৈশিষ্ট্য হওয়া বিচিত্র নয়। দেবতা শুনলেন, নাগরাজের সাতপাকে বাড়ী ঘেরাও করে রাখার সংবাদ। তিনি এবার বিভিন্ন পদ্ধতির আশ্রয় নিলেন। বিভিন্ন লোককাহিনীতে এরূপ ম্যাজিকের প্রয়োগ রয়েছে। যে ম্যাজিকের দ্বারা এ কাহিনীর 'মামা দেবতা' কলাপাতা কেটে দিলে সাপের সাত পাক কেটে টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

খুব অল্পে তুষ্ট হয়ে যান এই দেবতা, যিনি হলেন বুড়ো দেবতা। আর এই ছেলেটি তারই পুত্র। এখানে স্বর্গভ্রষ্ট দেবতার সঙ্গে একটা সাদৃশ্য যেন খুঁজে পাওয়া যায় এই বিধবার পুত্রটির সঙ্গে যেমনটি বাংলার ব্রতকথায় আমরা দেখতে পাই। এই দেবতা রক্ষা করেন অসুখ বিসুখ থেকে, বিপদ-আপদ থেকে। সেদিন থেকে চালু হল 'বুড়ো দেবতা'র পূজা।

'সজারুর বুদ্ধি' লোক কাহিনীটিতে ক্ষুদ্র অথচ নিরীহ, আপাত দৃষ্টিতে ভয়ংকর প্রাণীর বুদ্ধির সাহায্যে বাজীমাৎ করা বা হাতীর কাছে জয়ী হয়ে যাবার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এরূপ লোককাহিনী বাংলাতেও রয়েছে। ঠিক ঠিক 'সজারুও হাতির গল্প'টি না হলেও যেমন, শিয়াল ও কুমীর (টাইপ. ৫), কুমীর শিয়ালের শিক্ষক (টাইপ ৫৬ সি, মোটিফ কে. ৯৩১), শিয়াল ও মোরগ (টাইপ ৬২) প্রভৃতি।

উল্লিখিত লোককাহিনীটিতে, হাতি নদীতে ঘোলা জল দেখে ক্ষিপ্ত হয়। আর যে জল

ঘোলা করেছে, হাতিটি তাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হয়। আর প্রথমেই সজারুকে দেখতে পায়। সজারু সবে স্নান করে তার গর্তে ঢুকছে। সজারুও গর্তে শরীর রেখে মাথা বের করে হাতিকে বকে দেয়। হাতি অধিক রেগে দম্ভ জাহির করতে চায়। সজারু হাতিকে আরো ক্ষেপিয়ে দিতে জানায় তিনটি হাতি সজারুর এক বেলার খাবার। হাতি আগে সজারু দেখেনি। আর এমনভাবে কেউ তো তাকে এমন কথা বলেনি। সজারুর মুখটা মাত্র দেখেছে সে। এবার সজারু একটা গায়ের কাটা হাতির দিকে ছুড়ে দিয়ে তা মেপে দেখতে বলে। তা নাকি সজারুর গায়ের লোম। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত হাতি পলায়ন করে বাঁচে।

কাহিনীটিতে জন্তুদের উপর মানবিক গুণ আরোপিত হয়েছে। ভারতে প্রচলিত এমন অনেক কাহিনী রয়ে গেছে যার মধ্যে পশুর উপর মানবিক গুণ - দোষ আরোপিত হয়েছে। এসব কাহিনীগুলো এককথায় টেল বা লোককথার পর্যায়ভুক্ত। যে সব কাহিনীতে দেবতার অমোঘ উপস্থিতি নেই, ম্যাজিক বা ইন্দ্রজালিকতা অনুপস্থিত, মানুষ বুদ্ধি সচেতন এবং সঙ্গে সঙ্গে পশু বা জন্তুরাও মানুষের মতই গুণ বা দোষে সমৃদ্ধ। শুধুমাত্র মানুষের স্থানে জন্তু জানোয়ারেরা কাহিনীর পাত্র পাত্রী হয়ে উঠেছে।

চারটি লোককাহিনীর আলোচনামাত্র এখানে স্থান পেয়েছে। যেখানে প্রথমে আলোচ্য 'ভূমিকম্প' একটি মিথ্। দ্বিতীয় লোককাহিনীটিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার চিত্রটি ধরা পড়েছে প্রাঞ্জলভাবে। তাছাড়া বানরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের দিকটি তখনও যে অজ্ঞাত ছিল না তা ধরা পড়েছে। লক্ষণীয় হল, বানর বর লোককাহিনীটিতে কোন কোন অংশ বা 'গল্প-অণু' বিশ্বের অন্যান্য দেশে প্রচলিত লোককাহিনীর 'গল্প-অনু'র সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। 'অচাই' লোককাহিনীর সঙ্গে বাংলার ব্রতকথার সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে। বাংলার ব্রতকথাগুলি আশ্চর্যজনকভাবে রক্ষণশীল ধর্ম ধরে রাখতে পেরেছে। 'অচাই' কাহিনীর সঙ্গে ব্রতকথার এই সাদৃশ্য, একে অন্যের দ্বারা সাংস্কৃতিক অন্তর্লীন মেল বন্ধনের কথাই মনে করিয়ে দেয়। 'সজারুর বুদ্ধি' লোককাহিনীটি তুলনামূলকভাবে নবীন এবং এরূপ কাহিনী ভারতীয় অন্যান্য ভাষায় রয়েছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ
১. শ্রী রামপ্রসাদ দত্ত (প্রবন্ধ ঃ ত্রিপুরার রূপকথা প্রসঙ্গে — স্পন্দন ১৯৮৯ অক্টোবর)
২. ত্রিপুরা উপজাতি গবেষণাধিকার — ত্রিপুরার রূপকথা ।
৩. বাংলার লোকসাহিত্য — ডাঃ আসরাফ সিদ্দীকি (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড) — ।
৪. মাধুরী সরকার— লোকপুরাণ সৃষ্টি ও প্রলয়ের তত্ত্ব।
৫. ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত (সম্পা) — লোকপুরাণ ও সংস্কৃতি ঃ ।

সমাজ বাস্তবতা শিল্পরূপে ত্রিপুরা লোককথা

পৃথিবীর তাবৎ জনগোষ্ঠী সুদীর্ঘকাল ধরে লোকসংস্কৃতি চর্চা করেছে। এই সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগৎ বহুকাল মানুষকে হাসিয়েছে - কাঁদিয়েছে, জ্ঞানের ভান্ডার পূর্ণ করতে সহায়তা করেছে। সভ্যতার চূড়ান্ত উন্নতির মুহূর্তে দাঁড়িয়ে, বলতে দ্বিধা নেই, সেই সুদীর্ঘকালব্যাপী অলিখিত ব্যাপক জনসমষ্টির সংস্কৃতি গুরুত্ব লাভে সমর্থ হয়নি। যতটুকু সংগৃহীত হয়েছে, তার পরিমাণ তুলনায় খুব বেশী নয়। লোককাহিনীগুলি গল্পকথক বলে থাকেন, আর শ্রোতারা সে কাহিনীর রসাস্বাদন করেন। ত্রিপুরার উপজাতি লোককাহিনীর সংগ্রহ ভান্ডার তেমন বিশাল নয়। কিন্তু সংগৃহীত লোককাহিনীগুলির স্বাদ বৈচিত্র্য পাঠকদের আনন্দ দান মাত্র করে না, সর্বোপরি ভাবনার বহুমুখীনতায় নিমজ্জিত করে।

লোককাহিনীগুলিকে সময়ভিত্তিক বিভাজন করেছেন গবেষকগণ। সেগুলো হল যথাক্রমে (ক) লোকপুরাণ বা **Myth** (খ) লোককথা বা **Tale** (গ) কিংবদন্তী বা **Legend**। এ বিষয়ে বিস্তৃত বিশ্লেষণের ক্ষেত্র ভিন্ন। তবে এটুকু বলা যায় যে, লোকপুরাণ যদি হয়, "বিজ্ঞান মনস্ক মানুষের প্রাক্-বিজ্ঞান যুগের বিজ্ঞান-কল্পনা," তবে লোককথা অবশ্যই ভেঙ্গে পড়া লোকপুরাণ"। লিজেন্ডের উৎস হল মূলতঃ ধর্মীয় সংস্কার। লোকপুরাণ বা লোককথার দূরত্ব বেশী নয়।

তবে নিজস্ব ভাবনার উপর ভর করে লোকপুরাণ ও লোককথার আপাত বিভাজন অবশ্যই করা চলে। দু'টি ত্রিপুরী লোককাহিনী আলোচনাকালে, লক্ষণীয় যে, এখানে মানব-মানবী চরিত্র অধিক গুরুত্ব লাভ করেছে। পাশাপাশি দেব-চরিত্রকে অনেকদূর অতিক্রম করে মানব-মানবি চরিত্রগুলি সমাজের বাস্তব প্রতিচ্ছবি ও জীবন্ত হয়ে উঠতে পেরেছে। শুধুমাত্র এই বিষয়কে গুরুত্ব প্রদান করে আমি আলোচ্য লোককাহিনী দু'টিকে লোককথা বা টেল বলতে চাই।

নং	লোককথা বা টেল	লোককথা বলার কারণ
১	নাঐ পাখির গল্প	মানব/মানবী বাস্তবোচিত; দেব অস্তিত্ব প্রায় নেই।
২	ছাতিম গাছের কাহিনী	মানব/মানবী চরিত্র জীবন্ত; দেব প্রাধান্য অতিক্রম করেছে।

'নাঐ পাখির গল্প' এক জুমিয়া পরিবারের বড় মেয়েটির পাখি হয়ে যাবার কাহিনী। স্ত্রী ও এক কন্যা নিয়ে জুমিয়া চাষীর পরিবার। আচমকা মৃত্যু হল চাষী বৌ এর। মেয়ে 'খুমতি'কে নিয়ে চাষী পড়ল মহা সমস্যায়। চাষীকে আবার বিয়ে করতে হল। নতুন বৌ- এর হলুদ বর্ণের এক সুন্দরী মেয়ে জন্মাল। নাম রাখা হল 'করমতি'। ছোট বোনটিকে কাজে কর্মে কখনো পিছনে ফেলতে পারে না খুমতি। তাছাড়া বিমাতার সংসারে তার প্রতি অবহেলা আছে বৈ কি। একদিন জুমে গিয়ে ফসল দিয়ে লাঙ্গা ভরে ফেলে করমতি। কিন্তু খুমতির লাঙ্গা খালি পড়ে থাকে। ছোট বোনের তুলে আনা ফসলে সে নিজের লাঙ্গা ভরে ফেলতে চায়। কিন্তু বড় বোন যেহেতু ফসল

তুলেনি, যা পেয়েছে খেয়েছে; তাই ছোটবোন নিজের লাঙ্গা থেকে তাকে ফসল দিতে রাজী নয়। তাছাড়া লাঙ্গা ভারী হয়ে গেলেও করমতি তা বহন করতে পারবে বলে জানায় খুমতিকে। এইভাবে তারা পথ এগোতে থাকে। খুমতির মনে খুব রাগ হয়, কিন্তু সে তা প্রকাশ করে না। বাড়ী যাবার পথে একটি নদী। সেটি পেরিয়ে তবে বাড়ি যেতে হয়। নদীর পাড়ে বটগাছ, তাতে অসংখ্য ঝুড়ি। বড় বোন ছোট বোনকে ধাক্কা দিয়ে নদীতে ফেলে দেয়। তারপর স্নান সেরে লাঙ্গা দিয়ে বাড়িতে ফিরে আসে সে। কাঁচা হলুদের বরণ করমতির ছোঁয়া পেয়ে নদীর জল হলুদ হয়ে যায়। খুমতির ঠাকুরমা নদীতে স্নান করতে এসে হলুদ রং-এর জল দেখে অবাক হয়। বুড়ি কাপড় কাঁচতে বসে। তখন করমতি চেঁচিয়ে উঠে। শেষে বুড়ি বুঝতে পারে এ অবশ্যই করমতি। শেষে বুড়ি তার বৃদ্ধ স্বামীকে জুম থেকে ডেকে এনে বোয়াল মাছের পেট থেকে করমতিকে উদ্ধার করে। বাড়িতে সব জানাজানি হলে করমতির বাবা খুমতিকে খাঁচায় বন্দী করে। তার খাবার-দাবার বন্ধ করে দেয়। ক্ষুধা তৃষ্ণায় খুমতি দুর্বল হতে থাকে। কিন্তু করমতির মনে দিদির জন্য দুঃখ হয়। সে নিজের খাবার থেকে লুকিয়ে খুমতিকে খেতে দেয়। এইভাবে সে দিদিকে বাঁচিয়ে রাখে।

খুমতির ইচ্ছা হয় পাখি হয়ে উড়ে যেতে, নাঐ পাখিরা আকাশে উড়ে বেড়ায়। খুমতি নাঐ পাখিদের মত আকাশে উড়ে বেড়ানোর শক্তি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে। সে করুণ সুরে কেঁদে কেঁদে পাখিদের কাছে তাদের মত উড়ে যাবার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করে। পাখিরা তাকে সাহায্য করে তাদের পাখা, ঠোঁট, নখ প্রভৃতি দিয়ে। সেগুলো দিয়ে সে জামা বানিয়ে পরা মাত্র পাখি হয়ে যায়। তারপর খাঁচা ভেঙ্গে সে আকাশে উড়ে যায়।

লোককথাটিতে অলৌকিকতা আছে। কিন্তু একজন সচেতন পাঠক বা শ্রোতা এই অলৌকিকতা ততোখানি গুরুত্ব দেবেন না, যতোখানি মেয়েটির বন্দী জীবনের কাতরতা ও তার মানস ক্লিষ্টতাকে গুরুত্ব দেবেন। খুমতির 'মানুষ থেকে পাখী হয়ে যাওয়া' একটি আন্তর্জাতিক মোটিফ্। এই লোককথাটি গল্প কথকের পরিবেশনে একটি খুঁতহীন রূপ পেয়েছে । যার ফলে সেটির লাবণ্যও পাঠককে মুগ্ধ করে । শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করেন না পাঠক, যে অলৌকিকতার আগমন এ কাহিনীতে প্রত্যাশিত ছিল। লোককথাটির প্রয়োজনে এই পথটিই বেছে নিয়েছেন গল্প কথক । একজন আধুনিক গল্পকার এ ক্ষেত্রে কি করবেন তা বির্তকের অপেক্ষা রাখে, কিন্তু ঠিক এই অলৌকিকতার সংযোজন ঘটার ফলে এটি একটি আধুনিক গল্প না হয়ে লোককথা হয়ে উঠেছে । তথাপি খুমতির জন্য অনেক আগে বসে একজন কাহিনী শ্রোতার যে বেদনা তার সংগে আধুনিক কালের একই 'কাহিনী-পাঠকের' অন্তর-বেদনার খুব একটা দূরত্ব নেই হয় তো ।

খুমতি ছোট বোন করমতিকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল । খুমতির মনে প্রতিহিংসা ছিল । আবার এর মধ্যে শিশু সুলভ মানসিকতা কি নেই ? এখানে খুমতির শিশু মানসিকতা ও প্রাপ্তবয়স্কের মানসিকতায় দ্বন্দ্বও লক্ষণীয় । যা একসময় পূর্ণতায় উপনীত হয়েছে । এটাই স্বাভাবিক, শিশু মানসিকতা স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে না । যদি তা করে তবে ব্যতিক্রম

নিশ্চয়। তাই বোনকে ঠেলে ফেলে দেবার আগের মন এবং পরবর্তী মন এক বিন্দুতে অবস্থান করে না। বোনকে নদীর জলে ফেলে দিয়ে মনের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠে খুমতি। করমতিকে গল্প-কথক এমন ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন, যেন কাহিনীতে তার স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয়। বড়বোনকে করমতি (তার স্বাতন্ত্র্যের জন্য অবশ্যই) দোষারূপ করেনি বা প্রতিহিংসাময়ী হয়ে উঠেনি। করমতি উপর গল্পকথক লোককথাটির ভারসাম্য রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। খুমতির বিপরীতে তার অবস্থান হলেও, খুমতিকে সে কিন্তু অতিক্রম করতে পারেনি।

খুমতির তড়িৎ সিদ্ধান্তে পাঠক চমকিত হন। সে ছোট বোনকে নদীতে ফেলে দিয়ে আসে। আবার পাঠক তার প্রতি নির্দয় হবার আগেই পিতা-মাতা তাকে ততোধিক চরম শাস্তি প্রদান করেছিল। পাঠকের যে ক্রোধ খুমতির উপর বর্তাবার কথা ছিল, তা দিক্ পরিবর্তন করে তার পিতা-মাতার দিকে। সৎ মায়ের পরামর্শে পিতার নির্মিত পিঞ্জরায় আবদ্ধ হয় খুমতি। সৎ মায়ের অত্যাচারী হওয়া একটি আর্ন্তজাতিক মেটিফ্। আবার সামাজিক ক্ষেত্রেও এ বিষয়টি সত্য অনেক ক্ষেত্রে। এখানে বাস্তবের সঙ্গে কাহিনীতে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। বাস্তবকে একটুও রং না চড়িয়ে কাহিনীতে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। সৎমায়ের সংসারে পিতাও তার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন।

করমতি এবং কখনো কখনো তাদের ঠাকুরমা নিজেদের খাদ্য থেকে করমতিকে ভাগ দিয়েছে। করমতি প্রতিদিনের খাদ্য খুমতিকে দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে তাকে। করমতি তার স্বভাবের গুণে খুমতির ভুলকে গণ্য করেনি। ছোটবোনের প্রতি খুমতির হিংসার প্রকাশ এবং পরবর্তী সময়ে তা ভুলে গিয়ে ছোটবোনের জন্য স্নিগ্ধ ভালবাসার জোরে ক্রমে ক্রমে খুমতির মানবিক বৃত্তিগুলি প্রকাশিত হচ্ছিল এইভাবে নতুন এক খুমতির আর্বিভাব ঘটেছে, যার ফলে সে সম্পূর্ণ মানবীতে রূপান্তরিত হয়েছে। ভাবের এই বিচিত্র উত্থানপতন যেন বহতা এক নদী।

বন্দী জীবন থেকে মুক্তির তৃষ্ণা একটি স্বাভাবিক ঘটনা। অন্যায়ের জন্য শাস্তি অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তুলনায় অন্যায় অপেক্ষা শাস্তির পরিমাণ বেশী হয়ে গেলে তার প্রতিক্রিয়াও তীব্রতর হয়। খুমতি তার কৃতকর্মের জন্য শাস্তি পেয়েছে। কিন্তু তার শাস্তি কখনো চিরদিনের জ্যন্যে বন্দীজীবন হতে পারে না। এরূপ শাস্তির জন্য সে কিন্তু প্রতিহিংসাময়ী হয়ে উঠেনি। বরং সে কামনা করে মুক্তি। মনুষ্য জীবনের প্রতি তার বিতৃষ্ণা জন্মেছে। সে পাখি হয়ে যেতে চায়। মুক্তির সংগে পাখির সাদৃশ্য কল্পনাই স্বাভাবিক। খাঁচার দৃঢ় বন্ধন তাকে অনেকখানি শক্তিহীন করেছে কিন্তু পাখি হতে চাওয়ার মধ্যে কোন বাঁধা নেই। পাখির স্বাচ্ছন্দ্য বিচরণ ও নিজেকে পাখিদের স্বাচ্ছন্দ্যের সংগে মিশিয়ে দিতে পেরে তৃপ্তি লাভ করেছে খুমতি। বাস্তব সংসারের প্রতি তার মনে জেগেছে এক ক্রম বিচ্ছিন্নতাবোধ। পাখিদের প্রতি তার এই একাত্মতাবোধ থেকে পাখিদের সে আপন ভাবতে শুরু করে। পাখিদের সাহায্য পেয়ে খুমতি সত্যি একদিন পাখি হয়ে যায়।

খুমতির পাখি হবার কামনাকে গল্পকথক সাকার করেছেন। বাস্তবে যা হতে পারে না, লোককথার কথক তা করেছেন। কিন্তু এ পাখি তো আসলে খুমতির প্রাণপাখি অথবা তার মুক্তি

বাসনার পূর্ণতা। একদিন সে খাঁচা ভাঙ্গে। সে পাখি হবার জন্য অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করেছে— লোককথার ক্ষেত্রে এটাই সত্য। বাস্তব ক্ষেত্রে খুমতির প্রাণপাখি খাঁচা ছেড়ে অথবা শরীর নামক খাঁচাটি ছেড়ে মুক্তি পেয়েছে বললে কি অত্যুক্তি হবে?

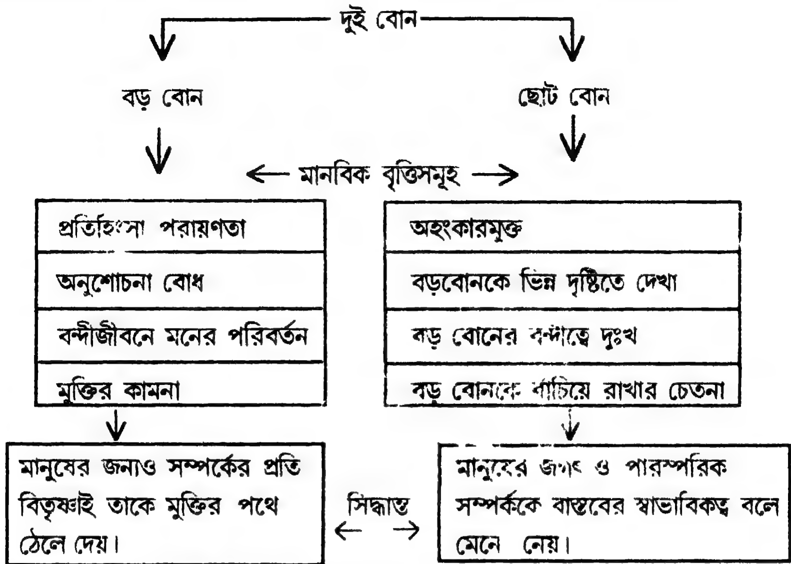
লোককথার শ্রোতা স্বস্তি লাভ করেন যখন কথক ঘোষণা করেন খুমতি পাখি হয়ে উড়ে যেতে পেরেছে। কারণ, এক সময় খুমতি লোককথাটির কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে গেছে এবং শ্রোতা বা পাঠকের সহানুভূতি সে পেয়ে গেছে।

মানুষের পাখি হয়ে যাওয়া লোককাহিনীর আন্তর্জাতিক কাহিনী-অনু বা মেটিফা পাঠকের বা শ্রোতার আত্মতৃপ্তি ও স্বস্তির প্রয়োজনে বন্দী মানুষটির প্রতি যে সহানুভূতি জন্মে তাকে মর্যাদা দিতে খুমতিকে খাঁচা থেকে মুক্তি দিতেই হয়। আধুনিক গল্পকারদের মত ঋজু মানসিকতা লোককথার কথকদের ছিল না। তাই, খুমতি সমস্ত সহানুভূতির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। মানুষ হয়েও খুর্মাত, যে খাঁচা ভাঙ্গতে পারেনি, কল্পনার পাখি সেজে সে তাই করেছে।

গল্পকথক ঘটনাটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যেভাবে ঘটনাসমূহ বিন্যাস করেছেন, তা নিম্নরূপ ঃ

দু'টি চরিত্র	ঘটনার স্তর	মনের অবস্থান	মন্তব্য
বড় বোন	করমতিকে জলে ফেলে দেবার আগে	বাস্তব জগৎ	মনের উত্থান পতনে ছোট বোনকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়া, যা তাকে কাহিনীর প্রধান চরিত্রের মর্যাদা প্রদান করে।
	করমতিকে নদীর জলে ফেলে দেবার পর	কল্পনার জগৎ (যা ক্রম উর্দ্ধ-গামী)	
ছোট বোন	নদীর জলে পড়ে যাবার আগে ও পরে মনের দিক থেকে পরিবর্তনহীন	বাস্তব	লোককথার প্রধান চরিত্র হতে গিয়েও ব্যর্থ

গল্পকথক দু'টি বোনের চরিত্রে যে সব মানবিক বৃত্তিসমূহ সংযোজন করেছেন ‐



'ছাতিম গাছের কাহিনী' একটি ভিন্ন স্বাদের লোককথা। ভাই-বোন জুমে যাচ্ছে। আগে বোন পেছনে ভাই। একটি নদী পেরিয়ে যাবার সময় 'রিগ্নাই' বা পরিধেয় কাপড় ভিজে যাবার ভয়ে সে তা উরু পর্যন্ত তুলে নেয়। দাদা তার ধব ধবে সাদা উরু দেখতে পায়। ভাবান্তর ঘটে তার। সে নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দেয়। দিন-রাত মুখ ভার করে থাকে সে। কাউকে কিছু বলে না। জিজ্ঞাসা করেও কেউ কোন উত্তর পায় না। শেষে ঠাকুরমাকে বলে, সে বিয়ে করতে চায়। তার বোনই হল তার পছন্দের পাত্রী। এই সিদ্ধান্ত থেকে সে নড়বে না। এর ব্যতিক্রম হলে সে আত্মহত্যা করবে।

অগত্যা ছোটবোনকে কিছু না জানিয়ে সব কাজকর্ম গুছিয়ে আনা হয়। আবার বাড়ির লোকজন ছাড়া অন্য কেউ এ সংবাদ জানে না। বাড়ির কেউ তাকে কিছু বলে না। মেয়েটি বুঝতে পারে তার দাদার বিয়ের প্রস্তুতি চলছে। কিন্তু কার সঙ্গে কোথায় বিয়ে হচ্ছে তা তার জানা নেই। বাড়ির উঠানে বিন্নী ধান রোদে দেয়া হয়েছে। ধান থেকে চাল করে তা থেকে মদ তৈরী হবে। নাতনীর চুলের কাঁটা মাটিতে পড়ে শব্দ হয়। ধান পাহারায় ছিল বাড়ির বৃদ্ধা, ছেলে-মেয়ের ঠাকুরমা। বুড়ি চোখেও ভাল দেখে না। নাতনীর চুলের কাঁটার শব্দ শুনে বুড়ি মনে করে ধানে বুঝি পাখি পড়েছে। সে বলে বসে যে, তার নাতি-নাতনীর বিয়ে হবে, ধান রোদে দেয়া হয়েছে। এই কথা অজান্তেই উচ্চারণ করে বুড়ি পাখি তাড়াবার চেষ্টা করে। নাতনী সব শুনে ফেলে।

কিন্তু ভাই বোনের বিয়ে কি করে হবে? তা তো হবার নয়, উচিতও নয়। মেয়ের মনে

দুশ্চিন্তা। সে দুশ্চিন্তা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। রাতে স্বপ্ন দেখে। দেবতা বলছে, "শোন মেয়ে। একটা ছাতিমের চারা এনে পূজো কর। তা হলেই তুই মুক্তি পাবি; তোর দুঃখ দূর হবে।" সে বন থেকে এনে ছাতিমের চারা পুঁতে জল ঢেলে পূজো করে। ছাতিম গাছ সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠে। সে ছাতিম গাছে চেপে বসে। সে ছাতিম গাছকে বলতে লাগল সেটি যেন আরো বেড়ে উঠে। গাছটিও ক্রমশঃ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে লাগল। বাপ-মা সব জানতে পেরে দৌড়ে এল। সঙ্গে প্রতিবেশীরাও এল। তাদের হাতে দা-কুড়ুল প্রভৃতি। ছাতিম গাছটা তখন বেড়ে বেড়ে মেয়েটিকে নিয়ে আকাশের কাছে পৌঁছে গেছে। মেয়ে তো আর নেমে আসছে না। তাই সবাই এবার গাছের গোড়া কোপাতে লাগল। কিন্তু গাছ কেটে শেষ করা যাচ্ছে না।

মেয়ের বাবা বুদ্ধি করে একটা কুকুব মেরে মেয়েকে দেখাল। বাবা জানাল এটা ভাইয়ের রক্ত। কিন্তু গাছের উপরে বসে সে সব দেখে ফেলেছে। সে গুরুজনদের দূর থেকে প্রণাম জানালো। সে এবার সোজা আকাশের গায়ে মেঘের আড়ালে মিশে যেতে থাকল। ভাইটি সব জেনে দৌড়ে এল। গাছে চড়তে লাগল সে। কিন্তু বোনটিও অনেকদূর এগিয়ে গেছে। বোনটি মেঘের উপরে উঠে যাবার আগে মেয়েটি পা দিয়ে ছাতিম গাছের মাথাটি ভেঙ্গে দিয়ে গেল"।

মানুষের সভ্যতার ক্রম বিবর্তনের ইতিহাস বড়ই জটিল। মানুষের সমাজ ভাবনা একদিন বা দু'দিনে গড়ে উঠেনি। মানুষকে এর জন্য অনেক অনেক পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। এই কাহিনীর মধ্যে মিথ্ ভাবনা মিশে রয়েছে। সেগুলি নিম্নরূপ ঃ-

ক) "আকাশে উঠে যাবার সময় পা দিয়ে ছাতিম গাছের মাথাটা ভেঙে দিয়ে গেল মেয়েটি । এক আকাশ ফাটা শব্দে গাছের চূড়াটা মাটিতে ভেঙ্গে পড়ল। সেদিন থেকে আজ অবধি কখনও আকাশে কালো হয়ে কড় কড় করে উঠলেই—সেই ছাতিম গাছের কাহিনী আমাদের মনে করিয়ে দেয়।"

খ) "থেকে থেকে বিজলী চমকালে— মনে হয় যেন সেই মেয়েটি কখনো কোমরের রিগনাইটা ভাল করে এঁটে দেবার সময় পলকের জন্য তার উরুদেশ দেখতে পাচ্ছি।"

গ) "সেদিন থেকে ছাতিম গাছের মাথা নেই— সে যেন ভোতা হয়ে গেছে।" (উদ্ধৃতি ঃ ত্রিপুরার রূপকথা — গবেষণাধিকার, উপজাতি ও তপশিলী জাতি কল্যাণ বিভাগ, ১৯৮০ পৃষ্ঠা-৯১) মানুষের অগ্রগতির কোন না কোন স্তরে (অন্ততঃ বর্বর যুগের নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ পর্যায়ের বিভিন্ন স্তর পর্যন্ত) ভাই-বোনের মধ্যে মিলিত হওয়া বা একত্রে অবস্থান করার ব্যাপারটি অস্বাভাবিক ছিল না। সমাজ গঠনের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রতিটি জাতিকে একই অভিজ্ঞতার পথ অতিক্রম করে অগ্রসর হতে হয়েছে। এ এক জটিল সমাজ ব্যবস্থার বিশেষ অবস্থা। তাই এমনই একটি সমাজব্যবস্থার স্মৃতি বাহিত হয়েছে লোককথাটির মধ্য দিয়ে। তারই পরবর্তীকালে বিভিন্ন কাহিনী-অনু যুক্ত হয়ে লোককথাটিতে বর্ণিত হয়েছে কোন না কোন কথকের মাধ্যমে। লোককথাটির মধ্যে ভাই ও বোন দুই মানসিক জগতের অধিকারী। শুধু তাই নয়, বোনটি তার ভাবনার জগতে নিতান্তই নিঃসঙ্গ। কেননা, সে এই বিবাহ ভাবনাকে যেভাবে গ্রহণ করেছে,

ভাই বা পরিবারের লোকেরা সে বিষয়ে এতখানি ভাবিত নয়। শুধু তাই নয়, ভাই এটাকে স্বাভাবিক ঘটনা বলে মেনে নিয়েছে। ভাই এর চাপে পড়ে, তার ইচ্ছাকে গুরুত্ব দিয়ে পরিবারের লোকেরা শেষ পর্যন্ত একে গ্রহণ করেছে।

এখানে 'যৌনতা' স্বাভাবিকভাবেই কাহিনীর কেন্দ্রে অবস্থান করছে। যৌনতার প্রকাশ এখানে অত্যন্ত নগ্ন। যাকে কেন্দ্র করে লোককথা পল্লবিত হয়েছে— এর গতি অত্যন্ত ঋজু। পুরনো সমাজ ভাঙ্গছে অথবা সমাজ এখনো দানা বাঁধেনি, সমাজ তৈরী হচ্ছে কিন্তু সামাজিক বাধা-নিষেধ তৈরী হয়নি এমনই এক সময়কে লোককথায় স্থান দেয়া হয়েছে। আবার লোককথার পাত্র-পাত্রীদের আচার-আচরণ তুলনায় নবীন। বলা যায়, সমাজের একস্তরে যা ছিল স্বাভাবিক, কেউ কেউ যাকে তখনও আঁকড়ে ধরে রেখেছেন, কেউ আবার তাকে বর্জনীয় মনে করছেন। মেয়েটি এখানে তুলনায় আধুনিক।

মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড মানুষের সৃষ্টি ও ক্রিয়াশীলতাকে মনোবিজ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি এবং তাঁর মতবাদে বিশ্বাসীরা বলেন, চেতনা, অনুভূতি ও উপলব্ধির সমস্ত পর্যায়ে ক্রিয়াশীল রয়েছে যৌনবোধ। এ তো হল যৌন প্রতীকবাদী তত্ত্ব। লোককাহিনীকে এ প্রতীক চিত্রগুলি নির্ণয় করে প্রতিটি প্রতীক থেকে বাস্তবধর্মীতার সন্ধান মেলে। কিন্তু এই লোককথায় তো যৌনতাই মূল প্রতিপাদ্য — এখানে সাংকেতিকতার স্থান নেই। এখানে যৌন স্বরূপ যেমন স্পষ্ট, তেমনি তাকে পাবার জন্য যে অস্থিরতা তাও দুর্লক্ষ্য নয়। এর মধ্যে মানসিকতার আদিমতা প্রকাশমান। এটি ভাইয়ের ক্ষেত্রে প্রকট, কিন্তু বোনের বেলা তার স্বরূপ ভিন্ন। তাই দেখা যায়, বোনটি তার ভাইকে স্বামী হিসাবে পেতে ইচ্ছুক নয়। বোনের সমাজ মনস্কতা, তার রুচি-অরুচি এবং পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারটা আধুনিক মানসিকতা সঞ্জাত। অথচ একই সময়ে দাঁড়িয়ে ভাই ও বোন দুই মানসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই ভাই যা চেয়েছে বোন তাকে মানতে রাজী তো নয়ই বরং অভিভাবকদের সিদ্ধান্তে তার ভিত্তি, ভীতির প্রকোপে প্রকম্পিত হয়েছে। এখানে তার মুক্তির তৃষ্ণা জেগেছে। আত্মীয়-পরিজন ও সমাজ ছেড়ে মুক্তি লাভ করা তার বড় বেশী প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

মেয়েটির মুক্তি-তৃষ্ণা, থেকে রাতে তার স্বপ্নে, মুক্তির পথ সে জেনেছে। মন থেকে সে যা গ্রহণ করতে পারেনি, স্বপ্নের মধ্যে তার সন্ধান পেয়ে সে স্বস্তি লাভ করেছে। এখানে দেবতার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি মেয়েটির মুক্তির জন্য অলৌকিক শক্তি প্রয়োগ করেছেন। দেবতার পরিচিতি এখানে দেয়া হয়নি। তবে তিনি যে বৃক্ষ-স্বরূপ তা আন্দাজ করতে আপত্তি নেই। বৃক্ষকে দেবতা জ্ঞান করা হল, সর্বপ্রাণবাদ বা animism, যা আদিমকাল থেকে প্রতিটি মানব গোষ্ঠী বৃক্ষকে দেবতা জ্ঞান করে এসেছে। এই লোককথাটিতে সরাসরি বৃক্ষ দেবতা অথবা অন্য কোন দেবতা দ্বারা বৃক্ষে দেবত্ব আরোপিত হয়েছে। গাছ রোপণই হল মুক্তির পথ, যে গাছ মেয়েটির মুক্তির দূত হয়ে, তাকে ভাইটির থেকে নিরাপদ দূরত্বে অথবা মানুষের কল্পিত ও ইঙ্গিত কোন স্থানে নীত করে। এখানে একাধারে বৃক্ষদেবতার মহিমা প্রকাশমান। শুধুমাত্র অনগ্রসর জনজাতির মানুষদের মধ্যে নয়, অগ্রসর জাতিগোষ্ঠীর মানুষেরাও বৃক্ষের মধ্যে দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে থাকেন। বঙ্গ-সংস্কৃতির দ্বারা ত্রিপুরী লোককথাটি প্রভাবিত

হয়েছে। এখানে দেবতার স্বপ্নে দর্শন এবং মুসকিল আসানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, বাংলার মেয়েলী ব্রতকথায় লক্ষ্য করা যায়। সে স্বপ্নে দেবতার দর্শন পেয়েছে, সেই অনুসারে সে, কাজ করতেও অগ্রসর হয়েছে।

ছাতিম গাছের বৃদ্ধি, মেয়েটির মনের গতির সমানুপাতিকভাবে গতি লাভ করেছে। সেটি বাড়ছে, মেয়েটিও উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। গাছ যত এগোচ্ছে, মেয়েটিও বাস্তব জগৎ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে, নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে চাইছে। বাস্তবে যা সম্ভব নয়, কল্পনায় তা স্বাভাবিক। তাছাড়া গল্পকথক তো শ্রোতাদের বাদ দিয়ে নয়, তাদের অন্তরের চাহিদার সঙ্গে [illegible]কে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চল[illegible] ভাইটির কামনার হাত কম লম্বা নয়। বোনটির পিছু ধাওয়া সে করছে, তর তর করে গাছেও চড়ে, এগিয়ে যাচ্ছে। সব দিকে মুক্তি পাবার তীব্র আকাঙ্খা ও অন্যদিকে কাম-বাসনায় জান্তব ধাবমানতা লোককথাটিকে পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে গেছে।

কাহিনী কথকের কথা অনুসারে কখনো অত্যাচারী জয়ী হয় না। বাস্তবে যা অসম্ভব লোককাহিনীতে তাকেই বিজয়ীর মালা পরিয়ে দেয় কথক। সবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের জয়ী হবার যে অবদমিত বাসনা, লোককাহিনীর কথক সেই বাসনাকে মূর্ত করেন তার বর্ণিত কাহিনীর মধ্যে। এখানে অত্যাচারী যদি হয় ভাইটি, তবে নির্যাতিতা অবশ্যই বোন। বোনের ক্রমাগতঃ উর্দ্ধে উঠে যাওয়া এবং বোনের নাগাল না পাওয়ার মধ্যে সেই ভাবনাই ধৃত হয়েছে। কাহিনীর শেষে যে মিথ যুক্ত করার প্রয়াস রয়েছে, সেখানে মেয়েটিকে দেবতার ভূমিকায় মন্ডিত করতে হয়। কিন্তু সে কখনো দেবতার পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেনি। তাই তার এই অলৌকিকত্বে লোককাহিনীতে চমক এলেও একে মিথ বলা সঙ্গত নয়।

লোককথা দু'টি জুম-ভিত্তিক সমাজ-অর্থনীতিকে ভিত্তি করেছে। জুম সেখানে বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য। ভ্রাম্যমান উপজাতি জনগোষ্ঠী বৃহৎ টিলা ভূ-ভাগকে অবলম্বন করে জুম চাষের মধ্য দিয়ে জীবন ধারাকে সচল রাখতে প্রয়াসী হয়েছে। আবার একে কেন্দ্র করে যেমন সমাজ গড়ে উঠেছে তেমনি সমৃদ্ধি লাভ করেছে লোক-সংস্কৃতির উপাদানসমূহ।

১নং ছক ঃ



২নং ছক ঃ

চরিত্র	বৈশিষ্ট্য	সাদৃশ্যযুক্ত অন্যান্য চরিত্র
ভাই	প্রাচীন সমাজ ধারায় আস্থাশীল	বাবা, মা, প্রতিবেশী
বোন	প্রগতিশীল/আধুনিক ও গতিশীল সমাজ ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য	গতিশীলতার পথে একক চরিত্র

সমাজের প্রতিবিম্ব এসব লোকবাহিনীর মোড়কে ধৃত রয়েছে, যার উপর সঠিক আলোকসম্পাতে বাস্তবতার কেন্দ্রমূলে উপনীত হওয়া যায়। শুধু তাই নয়, লোককাহিনী হয়েও সর্বাঙ্গে আধুনিকতার লক্ষণ বহন করছে আলোচ্য ও অন্যান্য অনেক ত্রিপুরী লোককাহিনী যা পাঠকের কাছে অপার বিস্ময়ের সামগ্রী, নিঃসন্দেহে।

সহায়ক গ্রন্থ ঃ

১) ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত — লোককথার অন্তর্লোক

২) উপজাতি গবেষণাধিকার --- ত্রিপুরার রূপকথা

"চড়কঃ তত্ত্বে ও লোকজীবনে"

বাংলা -বর্ষপঞ্জি অনুসারে দ্বাদশ তথা শেষ মাসটি হল চৈত্রমাস। এই মাসের শুরু থেকে বৃহত্তর বঙ্গভূমির ব্রাত্য মানুষের জীবনে যে পার্বণের সূচনা ঘটে, চৈত্রের শেষ দিনে অর্থাৎ চৈত্র-সংক্রান্তিতে চড়ক পূজা ও পূজা কেন্দ্রিক মেলার মধ্য দিয়ে তার সমাপ্তি ঘটে। ভাষা ও সংস্কৃতিগতভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের বাংলা ভাষাভাষী মানুষদের সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষ, ভাষাও সংস্কৃতির কোন পার্থক্য না থাকলেও আন্তর্জাতিক সীমারেখার ফলে এ রাজ্যের লোকসংস্কৃতির জগৎ নিজস্বতা ও স্বাতন্ত্র্যের মহিমায় একটি পৃথক বলয়ে অবস্থান করছে। বাংলাদেশেব বিভিন্ন স্থানের মানুষ ত্রিপুরায় বসতি স্থাপন করেছে। তার মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের পশ্চিম জেলায় গাজন, গম্ভীরা, নীলের গান ইত্যাদি, 'বিভিন্ন' নামে পরিচিতি লাভ করেছে। এখানে মাসব্যাপী গাজন, গম্ভীরা ইত্যাদি হর-গৌরীর বিবাহ, শিবের নাচ, ঢাকীর গান, ঢাকের পূজা ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত। চৈত্র মাসের শেষ দিনে চড়ক পূজা ও পূজাকেন্দ্রীক মেলার মধ্য দিয়ে এসব পার্বণের সমাপ্তি ঘটে।

নৃতত্ত্ববিদ্ বা লোকসংস্কৃতি বিশেষজ্ঞরা যেভাবে গাজন ও চড়ককে দেখেন তার দু-চার পংক্তি উদ্ধৃতি এখানে প্রাসঙ্গিক। ডঃ অতুল সুর বলেন, "গাজনের শেষ দিনে অনুষ্ঠিত হয় চড়ক। এই উপলক্ষ্যে একটা কাষ্ঠস্তম্ভের মাথায় আড়ভাবে একটা বাঁশ এমন করে বাঁধা হয় যে, তাতে পাক খাওয়া যায়। পিঠে বঁড়শীর মত একটা লোহার শলাকা বিঁধিয়ে সন্ন্যাসীরা ওই আড়ের দিকের বাঁশের শেষ অংশ হতে ঝুলে চড়ক গাছে পাক খেত। বোধ হয়, হঠযোগের সাহায্যে এটা তারা করতে সক্ষম হত। ....তবে চড়ক অনেক জায়গায় উঠে গেছে, বিদ্যমান আছে চড়কের মেলা।" ডঃ তৃপ্তি ব্রহ্মের 'চড়ক' সম্পর্কিত যে বক্তব্য বা বিশ্লেষণ তা অনুধাবন করা যেতে পারে। তিনি বলেন, "প্রাগৈতিহাসিক লৌকিক ধর্মানুষ্ঠান এর মধ্যে একটি হল শিবের গাজন। গাজন অর্থাৎ গাওন বা গান (উদ্দেশ্যে গীত)। এই গাজন হল একপ্রকার ছড়া জাতীয় গান। শিবের গাজন, নীলের গাজন দুইই লৌকিক শিবের মাহাত্ম্য কীর্তন জাতীয় গান। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাংশে চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষে নীলষষ্ঠী (শিব ষষ্ঠী, শিবের আর এক নাম নীলকণ্ঠ, বিষ আকণ্ঠ পান করেছিলেন সমুদ্রমন্থনের পর) নীল উপবাস, নীলপূজা ও দেল গাজন এবং দেলনাচ হয়ে থাকে। দেল অর্থে দেওল বা মন্দির। মালদায় হয় আদ্যের গম্ভীরা। ওড়িয়া ভাষায় গম্ভীরা হল ক্ষুদ্র নির্জন কক্ষ। তাহলে সেই নির্জন কক্ষের গাজন বা গাওয়া বা গান"।

দু'জন পন্ডিত বিশেষজ্ঞই গাজন ও চড়ককে এক করে দেখেছেন। শুধু তাই নয়, মন্তব্যদ্বয়ে তাঁরা বিষয়ের খুব গভীর যেতে চাননি তা পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু গাজনও চড়ককে স্বতন্ত্র্য গুরুত্ব সহকারে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। শিবের গাজন বা নীলের গানে অংশগ্রহণকারী ভক্তাদের কারো, হয় আগে থেকে মানত থাকে, নতুবা কারো পূর্বপুরুষ থেকে এরূপ ভক্তা হবার রেওয়াজ রয়েছে। চৈত্রমাসের শুরু থেকেই তারা ভক্ত্যা সেজে শিবের গাজনে অংশগ্রহণ করে। লক্ষ্যনীয় হল, বরাবর সমাজে অবহেলিত ব্রাত্য মানুষেরাই এই

গাজনে অংশগ্রহণ করে থাকে। গাজনের সঙ্গে ঢাক একটি অপরিহার্য লোকবাদ্য। ঢাক-এর সঙ্গে ঢোলও কখনো কখনো যুক্ত হয়ে যায়।

গাজনের ভক্তারা কখনো বানপাট মাথায় নিয়ে পাড়া পরিক্রমা করে। কখনো আবার তাদের সঙ্গে বানপাট থাকে না। দশ-বার বছরের দু'জন কিশোরকে হর-গৌরী সাজানো হয়। অর্থাৎ গাজনের ভক্ত্যাদের দু'টি শ্রেণীতে তাই ভাগ করে নেওয়া যায়। প্রথম শ্রেণীভূক্ত যে ভক্ত্যাটি বানপাট মাথায় নেয় তার পরিধানে স্পষ্টতঃই সন্ন্যাসীর বেশ থাকে। বানপাঠ গ্রহণকারী ভক্ত্যাটির বয়সও বড়জোর দশ বার। কয়েকটি বেত বিশেষভাবে মুড়ে মোটা একটি কাঠের তক্তার উপর রাখা হয়। তারপর সেটিকে লাল কাপড়ে মুড়ে দেয়া হয়। তার সঙ্গে ত্রিশূল, শিঙ্গা ইত্যাদি বাঁধা থাকে। গৃহস্তের উঠানে দাঁড়িয়ে তুলসী মঞ্চের নীচে, নিকানো জায়গায় ভক্ত্যাটি বানপাট নামায়। ঢাকী ঢাক বাজায়। ঢাক বাজানোর ফাঁকে ঢাকী বিভিন্ন ছড়া বলে। সব শেষে ভক্ত্যাটি শিঙ্গা বাজায় (কখনো কখনো)। তারপর মাঙ্গনপাত্র বাড়িয়ে দেয় সে। গৃহস্ত তার পাত্রে মাঙ্গন অর্থাৎ চাল বা সামান্য অর্থ তুলে দেয়। ভক্ত্যাটি সংগৃহীত মাঙ্গন রান্না করে নিরামিষ আহার গ্রহণ করে। চড়ক পূজা পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে। প্রতিদিন মাঙ্গনের জন্য না বেরোলেও হয়।

দ্বিতীয় শ্রেণীটিতেও লোকসংখ্যা তিন থেকে চার এর অধিক নয়। এখানেও ভক্ত্যারা দশ বার বছরের বেশী নয়। দু'জন ভক্ত্যা শিব-গোরী সেজে গৃহস্তের বাড়ি-বাড়ি নৃত্য করে বেড়ায়। তাদের সঙ্গে বানপাট থাকে না। শিব ও গৌরী পরচুলা ব্যবহার করে। রক্তিমবস্ত্র পরিধানে শিব ও শাড়ি পরিহিতা গৌরী ঢাকের তালে তালে ত্রিশূল হাতে ঘুরে ঘুরে চক্রাকারে নাচে। এ নাচ নেহাৎই অঙ্গভঙ্গী। এটাও চড়ক-পূজার সঙ্গে যুক্ত হয়। ভক্ত্যারা সারামাস নিরামিষ আহার গ্রহণ করে। চড়কের দিন চড়ক - ঘোরানো মাঠে তারা হাজির থাকে। পরদিন আমিষ আহার করে মাসব্যাপী ব্রত ভঙ্গ করে থাকে।

ত্রিপুরা রাজ্যের দক্ষিণ জেলায় গাজনের সঙ্গে একটি সাংস্কৃতিক কর্ম প্রক্রিয়া যুক্ত রয়েছে। ভক্ত্যারা রাত্রিকেই তাদের গৃহস্তের বাড়ি যাবার সময় নির্ধারণ করে নিয়েছেন। এখানে গৌরীকে দেখা যায় না। ঢাকের তালে তালে ত্রিশূলধারী জটাজুট শিব নৃত্য করে। তারপর মুখবন্ধ রচনা করে কুশীলবেরা স্বল্প দৈর্ঘ্যের নাটক মঞ্চস্থ করে থাকে। তাদের হাতে থাকে হারিকেন, হ্যাজাক লাইট। গৃহস্তরাও সম্ভবমতো আলো সরবরাহ করে থাকে। তবে এখানে সবাই ভক্ত্যা নয়। গৃহস্তের বাড়ি থেকে সংগৃহীত অর্থ চড়কের কাজে লাগানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় চড়ক হয়। সেখানে বহুকাল আগে থেকেই চড়ক হচ্ছে এমন স্থান রয়েছে। ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত গাজন-চড়কের ঐতিহ্যের আলোচনায় দেখিয়েছে যে, বাকুড়ার খাতড়ায় ৮০০ বৎসরের অধিককাল ধরে গাজন উৎসব হয়ে আসছে। হাওড়ার উদয়নারায়ণপুরে ৩০০ বৎসবের অধিক কাল ধরে গাজন উৎসব হয়ে আসছে। এরকম আরো কয়েকটি গাজন এর কথা জানা যায়, যেগুলি অন্ততঃ শ'পাঁচেক বা অধিক বৎসরের প্রাচীন। বাকুড়ার বহুলাড়া গ্রামে রয়েছে সিদ্ধেশ্বর শিব। ২০ চৈত্র থেকে এই উৎসবের সূচনা। ডোম সম্প্রদায়ের লোকেরা

এখানে ঢাক বাজায়। চৈত্র সংক্রান্তির শেষপর্বে (২৬ থেকে ২৮ চৈত্র) সন্ন্যাস অথবা ভক্তেরা ব্রতগ্রহণ করে। ব্রাত্য সম্প্রদায়ের মানুষেরা এই ব্রত গ্রহণ করে থাকে। ২৭শে ও ২৮শে চৈত্র পাটস্নান ও পাট পূজা হয়। এই পাট হল করাতে কাটা একটা প্রশস্ত তক্তা। এই তক্তাটা মাথা মোটা লোহার পেরেক দ্বারা সুশোভিত। এই পাটকে গাজন অনুষ্ঠানের একটা পবিত্র আসন হিসাবে ধরা হয়।

চড়ক পূজার আগে যে 'বানপাট' নিয়ে ভক্ত্যাদের পরিক্রমা, তাকে নিয়ে ভাববার অবকাশ রয়েছে। প্রথমেই সে বিষয়টির কথা মনে আসে তা হল, কাঠের পাটায় সিন্দুরের অনুলেপন কি পশুবলির অনুসঙ্গ বহন করে আনে না? তাছাড়া শৈব ধর্মাচারে যে পশুবলি অসঙ্গত, সেখানে কি কোন প্রাচীন তান্ত্রিক অনার্য লোকায়ত ধর্মাচার কোনভাবে যুক্ত হবার স্মৃতি বহন করে আনে? অথবা পাটাটি কি কোন যূপকাষ্ঠের প্রতিনিধিস্বরূপ?

দ্বিতীয়তঃ পাটার চেহারাটা যেন কোন মন্দিরের অথবা গাছের তলায় স্থাপিত দেবরূপে কল্পিত পাথর এর মতই মনে হয়। সর্বপ্রাণবাদে পূজিত গাছ-পাথর ইত্যাদির সঙ্গে এই বানপাঠ পূজোর একটা সাদৃশ্য এখানে পরিলক্ষিত হয়।

তৃতীয়তঃ আদিম জীবনে মানুষ বাঁশ-বেতকে নিত্যদিনের প্রয়োজনে ব্যবহার করেছে। পরবর্তীকালে বিশেষ বর্ণের মানুষেরা বাঁশ বেতের দ্রব্যাদি যেমন বেতের ধামা, পেটরা, কুলা. টুকরি ইত্যাদি নির্মাণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। এই বর্ণের (বাঁশের কাজ ডোমরাই করত সাধারণতঃ) মানুষেরা কি বাঁশ বেতকে দেবমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল অথবা রক্ত সিঞ্চনের দ্বারা কোন বনদেবতার পূজার ইঙ্গিত এখানে গোলা সিঁদুরের মধ্য দিয়ে বাহিত হয়ে এসেছে আজ পর্যন্ত? নরবলি. পশুবলির রক্ত ছিটিয়ে উৎপাদনমূলক যাদুবিশ্বাসের অনুষঙ্গ এখানে বাহিত হচ্ছে? চতুর্থতঃ নীলের পাটা বা বানপাট যে একটা যাদুবস্তু ছিল কোন এক অতীতে তারই স্মৃতিমাত্র ধৃত আছে এই মুহূর্তে? পঞ্চমতঃ এমনও হতে পারে, আদিতে চড়কের সঙ্গে অনুষ্ঠানগতভাবে হয়তো এর কোন সম্পর্কই ছিল না। কারণ, দুয়ের মধ্যে তেমন কোন সাদৃশ্য কিন্তু পরিলক্ষিত হয় না। যদিও দুটোই ব্রাত্য মানুষদের দ্বারা সম্পাদিত, আচরিত পরিচালিত ধর্মাপর। পরস্পর বিচ্ছিন্ন দু'টি গোষ্ঠীর ব্রাত্য মানুষ ভিন্নভাবে নিজেদের মত করে ধর্মাচার পালন করেছে। বানপাট গ্রহণের প্রকৃত অর্থটি যেমন আজ আবিষ্কার করার সুযোগ নেই তেমনি এর সঙ্গে চড়কের সম্পর্কটিও উদ্ধারের সুযোগ নেই বললেই চলে।

ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, পাটার আকৃতিটিকে শোয়ানো লিঙ্গের অনুরূপ বলেছেন। এরূপ. দৃষ্টিভঙ্গী মেনে নেয়া যেতে পারে। তিনি আবার বলেছেন, কোথাও কোথাও পাটা জলে ভেজানো থাকে। তা যে সর্বত্র হয় না একথাও তিনি বলেছেন। তবে বিভিন্ন স্থানে পাটাকে নিয়মিত পূজো প্রদান করা হয় এবং পূজাকালে জল সিঞ্চন করে সেটিকে স্নান করানো হয়। যথাসময়ে বানপাটকে নিয়ম কানুন মেনে বের করা হয়। বলা বাহুল্য স্থান বিশেষে, নিয়মকানুনের হেরফের হতেই পারে। (সংযোগের লোকসংস্কৃতি ঃ ড° ক্ষেত্র গুপ্ত অনুসরণে)

গাজন বা নীলের গানের সঙ্গে চড়কের আলোচনা ও প্রাসঙ্গিক। 'চড়ক' সম্পর্কে নৃতত্ত্ববিদ্ ডঃ অতুল সুর বলেছেন, "বাঙ্গলার লোকের বিশ্বাস শিব শ্রাবন মাসে জন্মেছিলেন, আর চৈত্রমাসের শেষে 'নীলচন্ডিকা' বা নীল পরমেশ্বরীর সঙ্গে। সাধারণের কাছে তিনি নীল বা নীলাবতী নামে পরিচিত। জাতি নির্বিশেষে সকল হিন্দু রমনীই নীলের উপবাস করে। ওদিন থেকেই শিবের গাজন উৎসবের সূচনা হয় ও পরিসমাপ্তি ঘটে চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে। ওইদিনে অনুষ্ঠিত হয় 'চড়ক'। সে সঙ্গে গম্ভীরার প্রসঙ্গটিও আসে। উত্তরবঙ্গের মালদহ জেলায় গম্ভীরা একটি প্রাচীন উৎসব। বলা হয়, গম্ভীরার সঙ্গে গানেব প্রচলনও ছিল। লোকসংস্কৃতিবিদ্ আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন যে, গম্ভীরা গানের অনুষ্ঠান আসলে শিবের গাজন।

'চড়ক' সম্পর্কে শতাধিক বর্ষ পূর্বে বেগলার সাহেবের Report of the Archaeological Survey of India (Vol-VIII, 1872-73) থেকে চড়কের বিবরণ তুলে ধরা যেতে পারেঃ

"Every year the Charak Puja is observed at this shrine with great enthusiasm. The festival or Parrab comemences in the middle of the month of Chaitra. On the fourteenth day before the end of the month the 'pat bhakta' at the chief devotee is called shaves and prepares himself to live the life of an ascetic till the close of the festival.........he daily takes out from the temple the pat or sacred seat, consisting of a wooden plank studden with iron nails and having an iron pillow, and bathes it in a neighbour tank.... ...on the 28th (or the 29th, if the month has 31 days) on what is known as the Phal bhanga day, they eat nothing but fruit, and have by immemorial custom liberty to take fruit from any tree or garden they like. The next day known as the 'dadurghata' day is the most important day of the festival, for it is the "Parab' or 'Gajan' day. On this day a mela or fair is held. The last (Sankranti) day of Chaitra was the set apart for charak or swinging..... Early on the morning of the sankranti day a ceremony known as agun sannyas i.e., walking over burning Charcoal took place........"

ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত চড়ককে একটি ভিন্ন আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি মনে করেন, "চড়কের গাছ পোঁতা এবং আনুষ্ঠানিক প্রথাস্বরূপ দুরূহ সব শারীরিক কসরৎ ইত্যাদির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে বেশকিছু আকর্ষণীয় সিদ্ধান্তে পৌছান যায় হয়ত। শাল বা গজারি বা গর্জন (নামের তাৎপর্যও এতে নিহিত) গাছের একটি খুঁটি বছরের পর বছর কোনো পুকুরে ডোবানো থাকে। সংক্রান্তির আগের দিন ভক্তরা মিলে তাকে তুলে তেল মাখিয়ে মাটিতে শক্ত করে পোঁতেন। এর নাম গাছ জাগানো। এই থেকে গাজনের শুরু হয়। গাছটি শিবপ্রতীক এবং পার্বতী এখানে হলেন পৃথিবী অর্থাৎ এই গাছ পোঁতার ব্যাপারটি এক ধরনের উর্বরতা কামনার ব্যঞ্জনা বহন করছে—একটা যৌন প্রতীকী ধর্মধারা বা কাল্ট বলেও একে মনে করা হয়।"

বিভিন্ন পন্ডিতগণের আলোচনার নির্যাস তুলে ধরতে গিয়ে একজন পন্ডিত ধর্ম ঠাকুর গাজন ও চড়ক কে এক সীমানায় নিয়ে এসেছেন। ডঃ সুনীতি কুমার মুখোপাধ্যায় 'এর ভাষায় "বৌদ্ধধর্ম এ দেশে নিম্নশ্রেণীর হাতে পড়ে বিকৃত ও অশুচিকর অবস্থায় পর্যবসিত হয়। ধর্মমঙ্গল কাব্যে বৌদ্ধ রাজা ও সাধু সন্তগণের মহিলা কীর্তিত হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু হিন্দুর দেবদেবীর প্রভাবে পড়ে পরবর্তীকালে বৌদ্ধ প্রভাব ও ধ্যানধারণা ক্ষীণ থেকে ক্ষীনতর হয়ে পড়ে। ব্রাহ্মণের দ্বারা বৌদ্ধ শ্রমনগণ শুধু প্রভাবিত হননি, পরাভূতও হন। তাই ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির আওতায় এসে দেবলীলা ব্যাপক হয়ে উঠল। আমাদের অনুমান যে ধর্মপূজা ও গাজনোৎসবে এবং ধর্মমঙ্গল কাব্যে বৌদ্ধধর্মের অপসৃয়মান ছায়া যেন আজও আমরা দেখতে পাই। সেইজন্যে বাঙ্গালী সমাজের নীলপূজা, চড়ক ও ধর্মঠাকুরের গাজনোৎসব প্রভৃতি এই জাতীয় অনুষ্ঠান হল নিম্ন সমাজের বিশেষ ধর্মানুষ্ঠান। সে সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে অপৌরাণিক এবং অব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির কিছু কিছু প্রভাব আছে বলে আমাদের অনুমান"। সুধীর করণ মনে করেন যে, ধর্ম ঠাকুরের সঙ্গে সূর্য, যম, বরুণ, শিব প্রভৃতি দেবতার নাম একই সূত্রে গ্রথিত। কালক্রমে ধর্ম শিব ঠাকুরের সঙ্গে একীভূত হয়। সুকুমার সেন মনে করেন যে, একাধিক আর্য ও অনার্য দেবতা মিলে ধর্ম ঠাকুরের উদ্ভব। আদিতে ধর্মঠাকুর ছিলেন, ডোম জাতির দেবতা। সেইজন্য ডোমেরা ধর্মপূজার প্রধান অধিকারী ছিল। সুকুমার সেন বলেন, "......... যেখানে ধর্মঠাকুর শিব বা বিষ্ণু হয়ে গেছেন সেখানে পৌরোহিত্য ব্রাহ্মণে গ্রহণ করেছে। ধর্মঠাকুরের আদিম পূজায় মদ্য মাংস পিষ্টক ইত্যাদি রাশীকৃত নৈবেদ্য (মদ্যের পুষ্করিণী দিক পিঠেক জাঙ্গাল) এবং শূকর বলি দেওয়া হত। এখন সচরাচর হাঁস, পায়রা ও ছাগ বলি দেওয়া হয়। ক্বচিৎ গাজনের সময় ধর্ম ঠাকুরকে মদ্যে স্নান করার ও শূকর বলি দেয়। নৈবেদ্যে গুড় পিঠাও দেওয়া হয়। ধর্মের গাজনে দেয়াসীরা মুখোস পরে মৃতদেহ ও মড়ার মাথা নিয়ে নৃত্য গীত করত। উত্তর রাঢ়ের কোন কোন স্থানে এ প্রথা এখনো প্রচলিত আছে। পন্ডিত জনেরা মনে করেন, বৌদ্ধধর্ম এদেশের নিম্নশ্রেণীয়দের হাতে পড়ে বিকৃত ও অরুচিকর অবস্থায় পৌঁছয়। ধর্মমঙ্গল কাব্যে বৌদ্ধ রাজা ও সাধুসন্তরা মহিমান্বিত হয়েছেন কিন্তু পরবর্তীকালে হিন্দুধর্মের প্রভাবে বৌদ্ধ ধর্মের সে মহিমা ক্ষুন্ন হয়। এখানে রয়েছে, বৌদ্ধদের পরাভূত হবার ইতিহাস। তাই অনুমান করা যেতে পারে,— ধর্মপূজায়, গাজন উৎসবে ও ধর্মমঙ্গল কাব্যে বৌদ্ধধর্মের অপসৃয়মান ছায়া যেন আজও আমরা দেখতে পাই। আর অপৌরাণিক এবং অব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাব রয়েছে নীল পূজা, গাজন ও চড়ক পূজার মধ্যে।

সম্প্রতি গাজন ও চড়কের উপর এক ক্ষেত্রসমীক্ষা করা হয়েছিল। সংবাদ পাওয়া গেল, চড়ক পূজা এখনও হচ্ছে এমনভাবে, যেখানে পিঠে বড়শী বেঁধানো, চামড়া ভেদ, আগুনে হাটা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলো সংগঠিত হয়ে থাকে। ত্রিপুরা রাজ্যের সদর মহকুমার অন্তর্গত তিন নম্বর বামুটিয়া বিধানসভার অন্তর্গত ফটিকছড়া মৌজার অধীনে ব্রাহ্মণপুস্করিনী গ্রাম। আগরতলা থেকে খুব সীমিত সংখ্যক জিপ গাড়ি সেখানে যায়। ইটের রাস্তা -- এবড়ো থেবড়ো, সদরের লেম্বুছড়া থেকে বা দিকে ইটের রাস্তাটি ঢুকে গেছে। রাস্তাটি ! আবার কামালঘাট থেকে ও হেঁটে যাওয়া যায়। এখানেও ভাঙ্গা চোরা ইটের রাস্তা। অনুরূপ রাস্তা সীমান্ত সংলগ্ন, পশ্চিম দিকে কালীবাজার থেকে পূর্ব দিকে, এটিও অনুরূপ রাস্তা। আবার ,

উত্তরে অবস্থিত ছের্চুরিয়া থেকে ও হেঁটে দক্ষিণে এই গ্রামটিতে আসা যায়। গ্রামটির কোন ইতিহাস নেই। তবু এখানে একটি পুকুরের অস্তিত্বের কথা বলা হয়। যে পুকুরটিতে রয়েছে সেটি ব্রাহ্মণের ঘাট, বা ব্রাহ্মণের মালিকানায় পুকুর। অন্তঃজ মানুষের এই গ্রামে কয়েকঘর মণিপুরী সম্প্রদায়ের লোক বাস করেন। তাকে উদ্দেশ্য করে এই পুকুর বা এই গ্রামের নাম হয়েছে। একটি মজাপুকুরের অস্তিত্ব অবশ্য এই গ্রামে আছে এখনো। গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে— ঘাসে ঢাকা মাঠ, মাঠের পূর্বদিকে রাবার বাগান ও টিলা ছাড়িয়ে নদী-ধানজমি। উত্তর দিকে জনবসতি। পশ্চিমেও স্বল্প বন ও তারপর লোকজনের বাস। মাঠটাতে গত ৮/১০ বছর ধরে চড়ক-পূজা হচ্ছে। মাঠের উপর দিয়ে কোন বিদ্যুতের তার অতিক্রম করেনি— প্রকৃতি এখানে উদার।

মাঠের উত্তর দিকে স্কুল বাড়িটিতে (মাটির দেয়াল) বসানো আছে অর্ধনারীশ্বর এর মাটির মূর্তি। ব্রাহ্মণ দ্বারা এই অর্ধনারীশ্বর এব পূজা হয়ে থাকে। পূজার উপকরণ ও অন্যান্য পূজার মতোই। তবে এখানে সিদ্ধি (গাঁজা) ও মদ্য প্রসাদ হিসাবে নিবেদন করতে হয়। মাঠের মাঝখানে চড়ক গাছ বসানো আছে। এক জায়গায় করা হয়েছে মাটির গর্ত। আর এক জায়গায় গর্ত খুঁড়ে তার উপর লাকড়ি সাজানো হয়েছে। একজন ভক্ত্যা ঢাক বাজিয়ে মাঠ পরিক্রমা করছিল। তার জিহ্বায় লৌহশলাকা বিদ্ধ করা ছিল। মাঠ পরিক্রমা শেষ হলে চড়কের মূল সন্ন্যাসী তার জিভে বেঁধানো লৌহ-শলাকা খুলে নিল। তারপর একটি জবা ফুলে মন্ত্র পাঠ করে ভক্ত্যার হাতে দিলে তা চিবিয়ে খেয়ে ফেলল। এরপর অপর একজন ভক্ত্যা এগিয়ে এলে তার বাম হাতের পেশীতে একটি লৌহ শলাকা বিঁধিয়ে দেয়া হল। সে উপস্থিত দর্শকদের সামনে ঘুরে ঘুরে তার শলাকা বেঁধানো হাত দেখালো। সন্ন্যাসী তার হাত থেকে শলাকা খুলে একটি খোসা ছাড়ানো কলা মন্ত্র পড়ে পড়ে ক্ষতস্থানে ঘসে দিল। অআগে থেকেই একটি বাঁশের মই বাঁধা ছিল। মই উপর তিনটি ধারালো দা বাঁধা হল। মই এর শেষ দুই প্রান্তে বাঁধা হল একটি করে কলা গাছের টুকরো। একজন ভক্ত্যা দা এর উপর পিঠ দিয়ে শুয়ে পড়ল।' বাঁশের মইটা আবার চারজন ভক্ত্যা কাঁধে নিয়ে মাঠ পরিক্রমা করে এল।

একসময় চড়কের গাছে দু'জন শিশু ভক্তাকে পিঠে বড়শী বেঁধে ঝুলিয়ে দেয়া হল। ছড়কের গাছে বাঁধা দড়ির উপর নির্ভর করে বড়শী বেঁধানো ভক্তারা দু-পাক খেল। তারপর তাদের নামিয়ে আনা হল। ততক্ষণে চড়ক গাছের চারপাশে অসংখ্য মানুষের ভীড়। সন্ন্যাসীরা জয়বাবা মহাদেব, বোম বোম মহাদেব' ধ্বনি দিচ্ছিল। ঢাক বাজছিল। উলু ধ্বনি দিচ্ছিল মহিলারা। ছেলে দুটিকে নামিয়ে আনার পর পিঠে বড়শী লাগানো অবস্থাতেই দর্শকদের সামনে ঘুরে এল। দর্শকেরা বড়শী ভক্ত্যাদের হাতে ধরা পাত্রে অর্থদান করতে লাগালো। এই পর্ব শেষ হলে, মাটির নীচে আগে থেকেই খোড়া গর্তে দু'জন ভক্ত্যাকে বসিয়ে তাদের মাথার উপর বাঁশের মাঁচা করে, তার উপর বাঁশের ধাড়ি পেতে মাটি ফেলা হল। ১৫-২০ মিনিট পর তাদের আবার মাটির উপর তুলে আনা হল। শেষে আগুন জ্বালানো হল। আবার নেভানোও হল। আগুনে ধূপ ফেলা হল। ভক্ত্যারা দৌড়ে দৌড়ে অঙ্গার অতিক্রম করলো। এইভাবে চড়ক ও চড়ক সম্পর্কিত ধর্মীয় আনুসাঙ্গিকতা শেষ হল।

মেলা জমেছিল। তেলেভাজা, জিলিপি, মটরভাজা, পান-বিড়ি-চা এর দোকান ছিল। মনোহারী জিনিসের দোকান বসেছিল কয়েকটা। আর ছিল জুয়া খেলার ব্যবস্থা। বেশ জম জমাট হয়ে উঠেছিল এ মাঠ। পত্র-পত্রিকার কয়েকজন চিত্র-সাংবাদিক, শহরের কিছু কৌতুহলী মানুষ ভীড় জমিয়েছিল। আর ছিল আশেপাশের গ্রামের মানুষজন। উপজাতি, মণিপুরী, বাগানের শ্রমিক বৌ-ঝি, বাঙ্গালী মানুষজনদের সমাগমে মেলা প্রাঙ্গণ জমজমাট হয়ে উঠেছিল। চড়ক পূজার পর এ-বিষয়ে একটি গভীর ক্ষেত্র-সমীক্ষার প্রয়োজন অনুভূত হয়। অবক্ষয়িত লোকসংস্কৃতিকে এখনো বাঁচিয়ে রাখার যে প্রয়াস, তার গভীরে যে বিলীয়মান সংস্কৃতি মনস্কতা, তার স্বরূপ তুলে ধরাই-এ ক্ষেত্র সমীক্ষার উদ্দেশ্য। চড়কপূজায় যারা উদ্যোগী হয়েছিল ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, তাদের সংগে যে কথাবার্তা হয়েছিল, তা এখানে তুলে ধরার হল। তবে কথা হয়েছিল, এই রাজ্যের (সদর উত্তরাঞ্চলের) আঞ্চলিক বাংলায়। কিন্তু ভাষার উচ্চারণ, অঙ্গভঙ্গীর গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও, তাকে শুদ্ধ বাংলার তর্জমা করেই তুলে ধরা হল।

প্রশ্ন । আপনারা যে চড়ক পূজা করেন, তার আগে দেখেছি, মাথায় সিন্দুর মাখানো পিড়ি নিয়ে একজন ভক্ত্যা ঘুরে ঘুরে বাড়ি বাড়ি বেড়ায়, এই সিন্দুর মাখানো পিড়িটিকে কি বলা হয়?

উঃ । এর নাম হচ্ছে বানপাট । এটা মহাদেবের আসন। এটা চৈত্রমাসের পয়লা থেকে নামানো হয়। (ইডার নাম অইছে আইজ্ঞা 'বানপাট'। এইডা মহাদেবের আসন। ইডা আপনের চৈত মাসের পইলা থিইক্যা নামানি লাগে)।

প্রশ্নঃ । বানপাঠ নামানো মানে ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না।

উঃ। প্রথমে নিয়ম হল, যদি চৈত্র মাসের পয়লা থেকে নামানো হয় (পদ্মপুরাণ বই এর মত) এই দিন থেকে করতে পারবেন। এরপর নামালে তিথি দেখে নামাবেন। তিথি, অন্য তিথি নয়, শনি-মঙ্গলবার দেখে বানপাটটা স্নান করাতে হয়।

প্রশ্নঃ। তিথি ছাড়াও কি বানপাটের পূজা করতে হয়?

উ ঃ। হ্যাঁ, তিথি ছাড়াও বানপাটের পূজা করতে হয়। আমরা যে বানপাটটা নামাই, এটা এখন একটা মন্দিরে রেখে দিয়েছি।

প্রশ্নঃ। এটি এখন কার মন্দিরে আছে ?

উঃ। একটি বানপাট আছে লেবার পাড়ায়। পাকা মন্ডপ আছে । জয়রামের মন্ডপ । সেই মন্ডপে এটি রয়েছে।

প্রশ্ন ঃ। বানপাটতো মনে হয় বেত দিয়ে বানানো? আসলে তা কি দিয়ে বনানো হয় ?

উঃ। বেতের বানানো । পাঁচটা বেতের বাঁধ থাকবে । আর কাঠটি হল বেলগাছ । বেলগাছ দিয়েই বানপাট ভাল। আর যদি তা না থাকে তা হলে নিম গাছ দিয়ে করতে হবে। বানপাট সব বেত দিয়ে হবে না। বেতের জাত আছে। এর বেত হল সুন্দি বেত। এই বেত থেকে নিজে নিজে গাছ হয়। নিয়ম অনুসারে বেত বাধ দিতে হবে। এরপর এর মধ্যে সিঁদুর, বল্লম (ত্রিশূল), শিঙ্গা, মহাদেবের কল্কি; সব এর মধ্যে লাগবে। তারপর পূজা দিতে হবে।

প্রশ্ন। পূজা কে দেবে?

উঃ। যে বানপাট মাথায় নেবে, সে পূজা দেবে। পূজারীর মত আসনে বসে পূজা দিতে হবে।

প্রশ্ন ঃ এখানে কি ব্রাহ্মণ লাগবে না?

উঃ না না, এখানে ব্রাহ্মণ লাগবে না। ব্রাহ্মণ এর কি জানে? কিছুই জানে না। অর-গৈরীর (হর-গৌরি) পূজা দেবে ব্রাহ্মণ। লোহা-লক্কর সব সন্ন্যাসী দেবে।

প্রশ্ন ঃ বানপাট মাথায় নিয়ে ঘোরার সময় ঢাকীরা কী গান করে?

উঃ হ্যাঁ, এর গান আছে। কিন্তু খরচা লাগে। খরচের জন্য গান করা যায় না। করতে হয় ঢাকের দল। বানপাটের পূজার ক্ষেত্রে নিয়ম আছে। পাঁচ বাড়িতে মাগতে হয়। এটাও নিয়ম রক্ষা মাত্র। এর মধ্যে আড়াই বাড়ির চাল আলাদা করে রাখতে হয়। শ্মশান ও নূতন হওয়া চাই। যেমন আমি মারা গেছি। বাৎসরিক শ্রাদ্ধ হবার আগে এই শ্মশানে পূজা করতে হয়। দিনের বেলা জায়গাটা সাফ-সুতরা করে নিতে হবে। রাত বারোটায় ঢাক-ঢোল নিয়ে যেতে হবে। নতুন পাতিল সরা, পাঁচ জাতের মিষ্টি, শৈল বা গজার মাছ একটা নিতে হবে। পাঁচ মুঠে চাল ফেলতে হবে। ভাত রান্না হল। তারপর কলাপাত বিছিয়ে রান্নাভাত পাতিল সহ ঢেলে দিতে হবে। সিদ্ধি এক কলকি, মদ একপোয়া, মিষ্টি, ধূপ, সিন্দুর ইত্যাদি সহ পূজায় বসতে হবে। পূজায় বসে প্রণাম করে বলতে হবে, কোন্ কর্ম করার জন্য এই পূজা দিলেন। এখান থেকেই আদেশ নিতে হবে, আমি বড়শী ফুড়াব, গাছ তুলবো, শয্যা দেবো। কি কি শয্যা—শর শয্যা, ভূমি শয্যা কাল শয্যা, জল শয্যা। কি কি পর্যন্ত করব এগুলো নিবেদন করতে হয়। জলঘট লাগবে। ঘটে কাপড় - গামছা লাগবে। ঘট জল ভর্তি করে সেই জল রাস্তায় ছড়াতে ছড়াতে আসতে হবে। তারপর মাঠটা পরিক্রমা করতে হবে। এ হল মাঠ বন্ধন। তারপর মাঠের কোথায় গাছ তুলতে হবে, চিহ্ন দিতে হবে। কোথায় মাটির নীচে গর্ত হবে, তার চিহ্ন দিতে হবে। যত কিছু করবেন নাম বলতে হবে, আর চিহ্ন দিতে হবে। এখানের কাজ শেষ করে পরে আবার নদীর ঘাটে যেতে হবে। রাত পোহাবার আগে গঙ্গা পূজা করতে হবে। গঙ্গা নিমন্ত্রণ করতে হবে। পান বাতাসা লাগবে। তারপর গাছ নিমন্ত্রণ। বাড়ি আসার পর রাত আর থাকে না।

প্রশ্ন ঃ শ্মশান পূজা ক'দিন করতে হয়?

উত্তর ঃ ঐ একদিনই শ্মশান পূজা করতে হয়!

প্রশ্ন ঃ চৈত্র সংক্রান্তির কতদিন আগে এই পূজা করতে হয়?

উত্তর ঃ আগের দিন সংযম করতে হবে। ভাত খাওয়া হবে না। বানপাট যেদিন থেকে চালু হয় সেদিন থেকেই তো নিরামিষ। পূজা না দেয়া পর্যন্ত নিরামিষ।

প্রশ্ন ঃ যে ছেলেটি বড়শী বাঁধে সে ও কি নিরামিষ? তাকে কিভাবে নির্বাচন করা হয় যে সে এবার পিঠে বড়শী বাঁধবে?

উত্তর ঃ এরকম অনেকে আগেই বলতে শুরু করে এবার বড়শী আমি নেব। তাছাড়া ব্যথা তো পাওয়া যায় না। তাছাড়া নিজেই বলে ব্যথা পেল কি পেল না। সে নিজেই অন্যকে বড়শী গাঁথার জন্য প্রেরণা দেয়। এইভাবেই বড়শী গাঁথার জন্য নির্বাচন করা হয়। কিছু নিয়ম রয়েছে। নিয়ম হল, অশুচি মহিলাদের স্পর্শ করা যাবে না। একদিন মাত্র। আগের দিন নিরামিষ ভাত খেতে পারবে। বড়শী নেবার পর মাছ খাওয়া যাবে। কিন্তু এরপর ঘা না শুকানো পর্যন্ত তিনদিন পর্যন্ত অশুচি মহিলা স্পর্শ করা যাবে না। টক খাওয়া যাবে না। টক খেলে বা নিয়ম

ভঙ্গ করলে ঘা ডেকে যাবে। তবে ইনজেকশান বা ঔষধপত্র লাগবে না। আর ঔষধ হল, কলাপড়া। সপ্রী কলায় মন্ত্র পড়ে দেয়া হবে। খেলে আর ঘা ডাকবে না। তবে তিনদিন লাগবে।

প্রশ্ন ঃ বানপাট মাথায় যে নেয়, তাকে কি শ্মশানে পূজা দিত হয়?

উত্তর ঃ শ্মশানে সে পারলে ভাল, না হলে তার হয়ে সন্ন্যাসীরা পূজা দেয়।

প্রশ্ন ঃ চড়ক গাছটি কোন গাছ থেকে হয়?

উত্তর ঃ এটি বেল গাছ থেকে হয়। যে কোন গাছ দিয়েই গাছ ঘুরানো যেতে পারে। তবে ব্যাপার হল, এর মধ্যে বিধান আছে। গাছকে যদি জীব দেয়া হবে বলা হয়, তবে তা জীব সমান হবে। অন্যগাছে তা হবে না। নিম, বেল, তমাল, কদম গাছ জীব গ্রহণ করবে। কিন্তু অন্য গাছে জীব গ্রহণ করবে না। গাছ ডুবানোর সময় পূজা দিয়ে ডুবাতে হয়। গাছ তোলার সময় পূজা করতে হয়। আগের রাতে গাছতে নিমন্ত্রণ করতে হয়। পান-সুপারী-বাতাসা-সিন্দুর-ধূপকাঠি-মোমবাতি দিয়ে পূজা করতে হয়। যথাসময়ে লোকেরা গিয়ে সমবেত ভাবে কাঁধ লাগিয়ে গাছ তুলে আনতে হয়।

প্রশ্ন ঃ যে দেবতার পূজা হচ্ছে, তিনি অর্ধেক নারী, অর্ধেক পুরুষ, তিনি কে?

উত্তর ঃ হর-গোরী। ব্রাহ্মণ এর পূজা করেন। এখানে সবই ব্রাহ্মণের নিয়ম কানুন অনুসারে হয়।

প্রশ্ন ঃ গাছের উপরে যা বাধা হয়, যেটা চক্রাকারে ঘুরে তাকে কি বলে?

উত্তর ঃ এটি চড়কা। সব ফিট্ করে তারপর গাছ গর্তে ফেলা হয়। গাছে দেবতা আঁকতে হয়। তিনজন দেবতা। বুড়া দেবতা। পায়রা দিতে হয়। এক জোড়া লাগে। একটা দিয়েও সারা যায়। গাছ ঘুরানিতে নিয়ম আছে। কিন্তু এসব নিয়ম, মন্ত্র বলা যাবে না। সীমানার মধ্যে অন্য সন্ন্যাসী থাকলে, সে ক্ষতি করতে পারে। দূরে থেকে সে মন্ত্র পড়ে দেবে, বড়শী পিঠ থেকে খোলা যাবে না। তখন তার কাছে গিয়ে মন্ত্র পড়িয়ে সে বড়শী খোলাতে হবে।

প্রশ্নঃ দেখলাম, চড়কটি সূর্যের বিপরীতে ঘুরে। কারণ কি?

উত্তর ঃ না এর কোন নিয়ম নেই। ইচ্ছা করলে একে সূর্যের দিকেও ঘুরানো যেতে পারে। এতে অসুবিধা নেই।

প্রশ্ন ঃ দু'চারটে ঢাকীর গান শুনতে চাই।

উত্তর ঃ এর মধ্যে তো বহু পালা রয়েছে। শিব লীলা, কৃষ্ণলীলা, মান পালা, চৈতন্যলীলা এরকম বহু পালা আছে। হনুমানের অশোক বনে গমন, যেমন—'অশোক বলে হনুমানে রাম রইল কস্কন্দর (?), সীতার উদ্দেশ্যেতে পাঠাইয়েছে মাগো রাম........" সীতার বনবাস। ঢাকীর গান গাইবার সময় এগুলো গেয়েছি। এগুলো পালা হিসাবে গাওয়া হত। ঢাকীর গানে সিন্দুরের বিবরণ তো গান নয়, মন্ত্র। ঢাক কোথায় পেলাম, মহাদেবের গাছ কোথায় পেলেন, পূজা কে আনল এসব বৃত্তান্ত। সিন্দুরের বিবরণ এরকম—"শোন শোন সইন্ন্যাসীগণ সেন্দুরে বিবরণ/সেন্দুর সেন্দুর পাতি, কামরূপ কামাখ্যা ছেল তার উৎপত্তি/রাম-লক্ষ্মণ তারা দুইভাই করাতে ধইরা মইল টান। সেই শঙ্কের গুড়া পড়ে বিন্দের (বিন্দুর) পরিমাণ/শিবদূর্গা শিবদূর্গা বইলে শঙ্কে তুলিল পরাণ/দশকড়া পাঁচ কড়া বিকায় সিন্দুরের তোলা/ সেই সিন্দুর পাওয়া যায় কোনখানে/সেই সিন্দুর পাইবা বাইন্যা পসারীর দোকানে/ শিব যায় কৈলাসেরে ক্ষির নদীর

পারে/থাপাইয়া থুপাই আনিল শিবের ঝুলনি ভরে। সেই জুলনি আইন্যা দিলদেবীর হাতে। দেবীএ খুইল্যা দেখে সিন্দুরের গোলা/অঠাকুর সিন্দুর কি কাজে লাগে/ আরে ঠাক্‌রাইন, সেই সিন্দুর লাগে দেবগণের পূজায়/দেবগণের পূজায় লাগে সেন্দুর/চরণে দিও ফোটা/আর মাইয়া লোকের যদি পড়ে সেন্দুর কইও দিত কপালে ফোটা/আইজ্ঞা কর সইন্যাসী ঠাকুর আমার বানপাটে দেও সেন্দুরের ফোঁটা।

এর ফাঁকে ফাঁকে ঢাক বাজবে। এরপর রয়েছে ধূপের জন্ম ঃ— "উদয় কুমার উদকুমার সাতঅ পঞ্চভাই।/সাতপহরের মাড়ি আইন্যা তুইল্যা দিল চহে।/নবলগু ধুপত লইল আড়াই খান পাকে।/গঙ্গা দিল দয়া, রৌদ্রে দিলাম শুকাইয়া/অগ্নিএ দিল পুইড়া/সেই ধূপড়া নিলাম আমি মস্তকে করিয়া।/ অরে ধুপ ধুপ গাছের রা/অরে লালধূপ, নিল ধূপ, /সুবরবর্ণ ধূপ, সেই দূপের ঘেরান যায় কৈলাসেতে/ধূপ কা ভোলা মহেশ্বর/তুমি দিও বর/বরষে বরষে দিই আমরা অরি শঙ্করের পূজা।

প্রশ্ন ঃ ঢাকের জন্ম নিয়ে কি মন্ত্র রয়েছে?

উত্তর ঃ পবনের পুত্র ছিল হনুমান।/লঙ্কা অইতে আনল শ্রীফলের গাছ/গঙ্গা-ভাগিরথী জলদা করিল স্থাপন/সে ফল কাঁচা খাইতে অমৃত/পাকা খাইতে খুবই মিষ্ট। তখরাইতে সুতার বাই এর দিন।/সুতার বাইয়ে কাইট্যা বানাইল মুকুন্দ মুরারি।/আইল কর্মকার বাইয়ের দিন/কর্মকার বাইয়ে দিল লোআর দুইটি আংটি/ওরে মুচি বাই, মুচি বাই/ তোমার কমরি গাইয়ের চামড়া দিয়ে দেও/আমার ডাকপাট খান ছাইয়া/পাইলাম আমি ঢাকসুদ্ধ/অরে ঢাকী তুমি কাচ্চা পাইলা কোথায় (ঢাক বাজাবার কাঠি)।/মনের উল্লাসে গেলাম আমি পচ্ছিম শহর।/ পচ্ছিম শহরে গিয়া পাইলাম আমি বিকাশ মনির (মুনির) বাড়ি।/বিকাশ মনির বাড়ি চাই দেখি পূর্বদিকে বাঁশের এক কালাঝার/আগার বায় আগা ফালাইলাম/গুড়ির বায় গুড়ি কাটিলাম/মধ্যেখান দিয়া বানাইলাম ঢাকের দুইটি কাচ্চা/ডাইনের কাচ্চা অইল সদাশিব/ বায়ের কাচ্চা অইল গৈরি/মহাদেবের পুত্রই আমরা ডাক (ঢাক) লইয়া গুরি (ঘুরি)।।

প্রশ্ন ঃ বাংলাদেশে আপনাদের বাড়ি কোথায় ছিল?

উত্তর ঃ গ্রামের নাম বাগি। এমনিতে ডাকাতে গাঁও। মেঘনার কাছাকাছি। ত্রিপুরা জেলা। হারান দাস আমার বাবার নাম। আমার নাম সাচনী দাস।

প্রশ্ন ঃ জাতি-ব্যবসা কি কিছু ছিল?

উত্তর ঃ না এমন কোন জাতিব্যবসা নেই। চাষবাস করত বাবা। ঝুড়ি টুকরী হাতের কাজ, শিখে নিয়েছি।

সাচনী দাসের বয়স হয়েছে। লোকশিল্পী তিনি। গান-বাজনার চর্চা করেছেন কৈশোরে। পালাগান গেয়েছেন। ব্রিটিশ সরকার যাবার আগে বাজারে ক্যাম্পাস করতে যেতেন। বিনিময়ে একটাকা পেতেন। তাকে গাইতে হত "ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট চইলা গেল, রূপার টাকা অচল অইল। /এই টেকাত বাবু বারে আর চলবে না, চলবে না চলবে না।" আসলে সব রূপা ব্রিটিশ নিয়ে গেল। রূপার টাকা নিয়ে কাগজের টাকা দিয়ে গেল। চড়ক পূজার অপর সন্ন্যাসীর শোভারাম সরকার বাউল সন্ন্যাসীর সঙ্গে কথাবার্তায় প্রসঙ্গক্রমে তিনি জানালেন চড়কের গাছটি শিবপ্রতীক,

আর চরকাটি হল, দেবী পার্বতীর ভগ। তিনি জানালেন, চড়ক পূজার পরদিন সব সাধুরা, ভক্তরা, যারা অন্যভাবে মানত করেছে তারা মৎস্যাদি করে থাকে। সন্ন্যাসী গান জানেন না। তবে, মন্ত্র জানেন তিনি। তিনি তার কাকার কাছে থেকে চড়ক করার নির্দেশ পেয়েছিলেন। তিনিও সন্ন্যাসী প্রকৃতির ছিলেন। তিনি তার কাকার কাছ থেকেই হরগৌরীর পূজা ব্রাহ্মণ দিয়ে সম্পন্ন করানোর নির্দেশ পেয়েছিলেন।

মোহনপুর (সদর উত্তরাঞ্চল) অঞ্চলের গোপালনগর চা - বাগানের মাঝখানে রয়েছে ফকিরমুড়া গ্রাম। এই প্রত্যন্ত গ্রামেও চড়ক করেন দুর্গাচরণ সন্ন্যাসী (দেবনাথ)। দু'জন ক্ষেত্রবন্ধুর সঙ্গে চড়ক সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহের জন গেলে সন্ন্যাসী উৎসাহিত হন। তিনি একজন চড়ক পরিচালক সন্ন্যাসী হিসাবে নিজেকে তুলে ধরেন। তিনি ব্যাক্তগত তথ্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে চড়কের মন্ত্রাদিও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "আমার গুরুদেব আমাকে মন্ত্র দিয়েই কয়েকদিন পর চলে গেলেন স্বর্গে। তিনি আমাকে ভজন করা বা সাধন করার ব্যাপারে বলে গেছেন। তিনি শাক্তমতে দীক্ষিত। এখানে, যে গ্রামে এই সন্ন্যাসীর বাড়ি, গুরুদেব তিন বছর চড়ক করেছেন। আমি বার বছর বয়সে দীক্ষিত হই। গুরুদেব চলে যান পানাম। তার বাড়ি ছিল শ্যামরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা। তার নাম ছিল স্বর্গীয় জলধর সন্ন্যাসী। তিনি বলেছিলেন, যা দিলাম ধরে রেখো। তারপর ৪৫ দিন শ্মশানে কাটিয়েছি। আমার ক্ষমতা অনুসারে আমি পেয়েছি।"

"যারা মানত করে তার বানপাট মাথায় নেয়। হাজিরা পূজা অবস্ত্র হয়ে শ্মশানে গিয়ে দিতে হয়।এরপর ডাক দিলে তার দেখা মেলে। মলমূত্র ত্যাগে সংযম, উপবাসে কঠোরতা মেনে চলতে হয়। বানপাট তুলে রাখি ধূপ ধুনা দিই। সংসারী, তাই আসনে বানপাট বসাই না। চড়কে বড়শী ফুঁটাই। মাটির নীচে দিই। শিবযজ্ঞ করি। মন্ত্র শক্তি সবই। নানা জনে নানা কথা বলে। আমি কিছু বলি না। পঞ্চাশ গ্রাম ধূপ হলে আগুনের খেলাটা করি।"

চড়ক হল শিবের লিঙ্গ, আর মা'র ভগ্। উপরেরটা হল মা'র অঙ্গ। হ্যাঁ, ঘুরানোর নিয়ম রয়েছে। ডানদিকে ঘুরানো হবে। কোন ঔষধ নেই। ঘি, জবা ফুলই হল ঔষধ। চড়কগাছের জন্য লাল শালু লাগে। এখানে জাতিভেদ কিছু নেই। ব্রাহ্মণ এখানে লাগে না। তারা মূর্তি বানিয়ে পূজা করে। তবে চড়ক পূজায় অংশগ্রহণে কোন বাঁধা নেই। শিবযজ্ঞ করা হয়। ব্রাহ্মণের যজ্ঞাহুতির সঙ্গে আমাদের শিবযজ্ঞের সম্পর্ক নেই। ব্রাহ্মণ ইচ্ছা করলেও এই আগুনে হাত দিতে পারবে না। যত বীজমন্ত্রই তিনি জপেন না কেন? আমরা যজ্ঞ করলেই পরীক্ষা করি। যজ্ঞ সঠিক হল কিনা। যজ্ঞের আগুনের সব তাপ বসুমতী গ্রহণ করেন। মাটিতে পা লাগলে বিপদ আছে। এখানে প্রধান হল মন্ত্র। ধূলাপূজা করতে হবে। ব্রহ্মাকে আহুতি দিতে হবে।" তিনি মন্ত্র পাঠ করেন—

(১) আগুনি যুগিনী ব্রহ্মার তাপ
পুড়িছ না জিহিয়া কালা হইয়া তাগ।
ওঁ হিরণ্য কনক, তপ্তা রঙ্গীন দর্শী দন্ডী পানী
এই সপ্ত জিহ্বামলং।

পলাশ পত্রে ঘি নিয়ে সাতবার আহুতি দিতে হবে। পলাশপত্রের দ্বারাই কাজটি সম্পন্ন করতে হবে। এই মন্ত্রে চন্দন কাঠ দিতে হবে। অন্য কোন কিছু হবে না।

বানপাট এর সঙ্গে নিজে বেরোই। তখন ঢাকীর মন্ত্র, সিন্দুরের বিবরণ বলতে হয়।

সিন্দুরের বিবরণ এরূপ :

(২) শোন শোন সন্ন্যাসীগণ সিন্দুরের বিবরণ
সিন্দুরের জন্মিল কোন্‌স্থানে।
শিব যায় ধীরে ধীরে ক্ষীর নদীর পারে
মনে অহঙ্কার করে আনল একটি শঙ্খ ধরে।
শঙ্খ করাতে বেড়িয়া মারিল টান
শিব দূর্গা বলে শঙ্খ তজিল পরান।
শঙ্খের গুড়া পড়ে সিন্দুরের প্রমাণ
যাপাইয়া যুপাইয়া মুলা বান্ধিল দশখান।
রাম লক্ষ্মণ দুই ভাই করে ওলামেলা
এক কড়া দুই কড়া বিকায় সিন্দুরের গোলা।
সিন্দুর বিকায় হাটে, সিন্দুর বিকায় বাইন্যা
পসারের দোকানো
পুরুষ থাকিলে সিন্দুর পরিবার উচিত হয়
পুরুষ না সিন্দুর পরিবার উচিত নয়।
পুরুষ না থাকিলে সিন্দুর পরে কেমন জন
পুরুষ না থাকিলে সিন্দুর পরে দেবগণ,
দেবগণে পরে সিন্দুর জনমে জনমে
আইহলোকে পরে সিন্দুর কপালে দিয়া ফোঁটা
দেবলোকে পরে সিন্দুর চরণে দিয়া ছটা
আইজ্ঞা (আজ্ঞা) কর সন্ন্যাসী বেটা
ঢাকপাটে দেও সিন্দুরের ফোটা

(৩) এবার অন্য একটি মন্ত্র, এটি **রুদ্রাক্ষের জন্মকথা :-**

একদিন জোড়হস্ত বলেন পার্বতী
কহ কহ শিব গোসাই রুদ্রাক্ষের উৎপত্তি।
তখন শিব বলে পার্বতিকে—
রুদ্রাক্ষ শিব লিঙ্গের হাড়
একদিন আশিয়া পবন নন্দন,
নখে চিড়িয়া তারে করিল দশ হাজার,
একদিন আসিয়া পবন নন্দন,
ওড়াইয়া নিল তারে কৈলাস শিখর,
পার্বতী পাইয়া তারে করিয়া যতন
মৃত্তিকা কুড়িয়া তাহাকে করিল রোপন
যখন রুদ্রাক্ষর মেলিল ফোম

তেত্রিশ কোটি দেবগণ এসে দেয় ওম্।
যখন রুদ্রাক্ষর মেলিল পা
তেত্রিশ কোটি দেবগণ এসে করে জোড় হাত।
যখন রুদ্রাক্ষর মেলিল ডাল,
প্রতি ডালে নাচে, দ্বাদশ গোপাল।
যখন রুদ্রাক্ষর মেলিল ফুল,
ভ্রমর এসে করে নানান গন্ডগোল।
একমুখ রুদ্রাক্ষ নাক ত্রিরঞ্জন,
দুই মুখ রুদ্রাক্ষ জনার্দন
তিনমুখ রুদ্রাক্ষ যুক্ত বানারসী।
চারমুখ রুদ্রাক্ষ চতুর্থ দেবতা,
পঞ্চ মুখে পঞ্চানন।
ছয়মুখ রুদ্রাক্ষ ষষ্ঠী জাগরবাসরণ,
সাতমুখ রুদ্রাক্ষ সপ্ত বানারসী।
অষ্টমুখ রুদ্রাক্ষ অষ্ট নাগিনী।
নবমুখ রুদ্রাক্ষ নবদন্ডস্থিতি,
দশমুখ রুদ্রাক্ষ দশগুড়ি রাবণ।
আগম নিগম জানিয়া যে জন রুদ্রাক্ষ পরে,
দিনের পাপ দন্ডে হরে।
আগাম নিগম না জানিয়া যে বা রুদ্রাক্ষ পারে,
সাত পুরুষ তার নরকে গমন করে।
হস্তে দিলে জয় হয়,
গলায় দিলে বৈকুণ্ঠময়।
জয় জয় শিবশক্তি, জয় জয় মায়া হরি,
ওম্ শিব, ওম্ শিব, ওম্ শিব।।
(৪)চড়কের কাজ আরম্ভ করার আগে ধূলি বন্দনা করতে হয়। এই ধূলি বন্দনার মন্ত্র হলঃ
কহিঁ সম্পায় নম, কহি সম্পায় নম
কহেন গুণধাম
অবোধ অনীক চন্দ্র আছিলেন রাম
সেই স্থলে তাহা আমি করিব
গৃহেন সুশ্রী রহি সুরাগুরু
পদ্দজনমে দ্বিজ তোমার কহি বিনয় করিয়া
রক্ষা কর আমায়
যদি আমার এই জ্ঞান লড়ে
মহাদেবের জটা ছিঁড়িয়া ভূমিতে পড়ে।
দোহাই ওস্তাদেব, রক্ষা কর,

রক্ষা কর, রক্ষা কর।

এটাকেই চতুর্দিক ঘুরে ঘুরে সাতবার উচ্চারণ করতে হবে।

যখন আমি শ্মশানে পূজা দেব, তখন আগে শ্মশানঘাট জাগ্রত করতে হবে। শ্মশানঘাট জাগ্রত করার মন্ত্র হল ঃ **(শ্মশানবন্দনা) ঃ**

(৫) হরহরি ত্রিপুরারী শিঙ্গা ডমুর ত্রিশল লইয়া
দাঁড়াও আসি ভক্তের নিকটে
যদি তোমার ভক্ত পড়িয়া বিপদে ডাকিতেছে
তোমার বিপদ ভঞ্জন নাম ধরেছ
আর কি বলিব তোমারে গঙ্গার জল তুলসী দিয়া
পূজিব তোমারে।
ওম্ হিং রিং রিং ক্লিং স্বাহা।

আগুন থামার মন্ত্র ঃ

ডাকিনীর গত্তের মইধ্যে দিয়া শূল
ডাইনে বামে রাখিয়া দন্ডী কুমন্ডল
সাত সপ্তীনখী দ্বার পানি শুল
কুচবধিয়া ওঁমা।
কামাক্ষা মায়ের এই পদের দিলাম মাটি, এই পদের ধূপ আনিয়া। করিলাম আগুন।
সেই আগুনের তাপ যদি বন্দনা হয় তবে (মন্ত্র পাঠ করে ধূপ দিতে হবে)
ওম্ সুপ্রকুসো মহাদ্বীপ সর্বচ্যেতি পরম্ভব
অকালমৃত্যু হরণ সর্ববাপি, পবাদির্প।

(৬) ধূপ চালান মন্ত্র ঃ

হেত দুপ্ যেত দুপ।
দুপ গুল গুল তিন দুপে করিয়া গুরী।
সেই দুপের গন্ধ গেল কৈলাসপুরী।
দুপু দুপ গাছারি গাছের আড়া।
নেতায় আনিল দুপ পদ্মায় করে বাস।
রাবণে আনিল দুপ।
অতিঅ যতন করীয়া।
সেই দুপ লইল মুট্টি করিয়া।
সেই দুপ দিল অগ্নিতে ছাড়িয়া।
সেই দুপের গন্ধে নাচে শিব আর পার্বতী।
সেই ধূপের গন্ধে নাচে
শিবের যত সন্ন্যাসী।

শ্মশান বন্দনার পর **পূজায় বসার সময়ও মন্ত্র** উচ্চারণ করতে হবে। তিনি বলেন ঃ আমি

যখন বসুম পূজায়, তখন একটা মন্ত্র আছে, তারে ডাক দিতে হয়।

(৭) ওম্ শ্মশানকালী, কালীতারা মহাদিব্য সুরেশ্বরী
ভুবেনশ্বরী, ভৈরবেশ্বরী ছিন্নমস্তা বগলা
ধূয়ামস্তা মাতঙ্গিনী রক্ষা কর।
আয় কালীতারা মহাদিব্য সুরেশ্বরী
ভুবনেশ্বরী, ভৈরবেশ্বরী, ছিন্নমস্তা বগলা

ধূয়ামস্তা মাতঙ্গিনী রক্ষা কর।

প্রঃ বানপাট নিয়ে বেরোবার সময় কেউ হর গৌরী নিয়ে কেউ বা শুধু বানপাট নিয়ে বেরোয়, দুটির মধ্যে মিল কি?

উঃ যারা বানপাট নিয়ে বাইর অয় তারা হল, সাত্ত্বিক। আর দিনের বেলায় হরগৌরী নিয়া বাড়ি বাড়ি নাচাইয়া যিডা করতাছে, ইটা অইল, তাদের মধ্যে পার্থক্য থাকে। আর আমার ইডা অইল, ভিক্ষা যখন দিবেন, তহন কথা থাকে, মা যিডাদিবেন কোন কতা থাকত না। চাওন নাই। আমাদের ভক্ত যারা যাইব তারাও কোন সাওন (সাউন্ড) দিত না। এক মুষ্ঠি দেন। আপনে না পারলে না দেন, কিন্তু মনের গুসা রাখতে পারতেন না। মনে কষ্ট থাকলে চলবে না। আর আপনে নিজে যাইন্যা যা দিবেন, তাই আমরা আনুম।

প্রঃ বানে পাটের যে বেত, এর কি কোন জাত আছে?

উঃ জালিবেত লাগব। জালিবেতে আস্তা দেওন লাগে। যখন বান্তে (বাধতে হয়) হয় তখন মন্ত্র আছে। মন্ত্রগুলা জপ কইরাই বানতে হয়। সাত্ত্বিকভাবে মানতে গেলে মহাদেবের চড়ক পূজা সত্যিকারের ব্যাপার।

তিনি জানান, চড়ক পূজাতে চাঁদা তোলার ব্যাপার নেই।

প্রঃ এর মন্ত্রগুলো কি?

উঃ এটা সব গুলান আমি বলতে পারি না। ইডা বিক্রী করার ব্যাপার না।

এ নিয়ে অনেকক্ষণ কথা বলার পর তিনি তাঁর গুহ্য সাধন তত্ত্বের কথা বলতে শুরু করেন। বুঝানোর চেষ্টা হয়, এটা বিক্রী নয়। বরং মানুষের সমাজে স্থান করে নেবার একটা সফল প্রয়াস। তিনি এর পর যে বন্দনামন্ত্র বলেন ঃ

(৮) কালীঘাটে কালী বন্দি মন কর স্থির
শেরুতে (শিরেতে?) বন্দিলাম আছে যত পীর
আটঘরা বন্দিলাম দেব মহেশ্বর
দশঘরা বন্দিলাম দেব গদাধর
কামাখ্যা মা বন্দিলাম মাতা কামরূপী
বধ্যমাতা সর্বঘটে দেবী ভাগিরথী

লাগ বন্দন (বন্ধন?) আজ দুপুর
কালরাত সাতদিন সাত রাত
আমার সর্ব অঙ্গে শীঘ্র করে লাগ
পারে যে চন্ডীর দোহাই
ওরে শত্রুর আজ্ঞা. মা পার্বতীর দোহাই
রিং রিং রিং পট্ পট্ স্বাহা
ভীম শয্যা, ভীম শয্যা
গোসাই, জঙ্গর সন্ন্যাসী
যদি জ্ঞান লড়ে, ঈশ্বর মহাদেবের
জটা ছিড়া ভূমিতে পড়ে।

"এইটা হল আমার দেহবন্দনা। আমি বাঁচতে গেলে এটা লাগব। ভূমিশয্যা যখন দেব, তখন অইল এডা আধ্যাত্মিক জিনিস। যে লোকটারে দেওয়া হবে সে কিন্তু অজ্ঞান হয়ে যাবে। যে মন্ত্রটা জপ করতে হয় বা যে মন্ত্র দিয়া কাজ করতে হয় তা আমার পক্ষে (বলা) সম্ভব নয়। এইটা (আমার) গুরুর বাণী। এইটা কারো কাছে বলা যায় না।"

(৯) পূজা ঠিকভাবে সমাপ্ত করতে হলে যে মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয় ঃ

রাইপূজা, রাইপূজা
পূজাখানি পাতিলাম অগ্নির উপরে.
যখন তোমার সন্ন্যাসী অগ্নিপূজা করে
বানপাট তুলে দিলাম অগ্নির উপরে,
নিজে শুনে ব্রহ্মা এসে তাকে বেনিফুটে
হনুমান চালিয়ে গেল অশোকের বনে
সীতামায়ে দিল আগুন হনুমানের মুখে
সেই আগুনে হনুমানের মুখ পোড়া যায়
সীতামায় নিভাইল লঙ্কার আগুন
মুখের লব্ দিয়া
হরে পুরিস না, জালিচনা কালা হইয়া থাক্
সীতামার দুয়াই আদ্যের মাথা খাও
যদি জ্ঞান লড়ে, ঈশ্বর মহাদেবের জটা
ছিড়িয়া ভূমিতে পড়ে
দোহাই মহাদেবের।
(১০) চড়ক পূজার সময় **'শরীর বন্ধ'** (বন্ধন) করার মন্ত্রটি এরূপ ঃ
বন্দী বন্দী রাম কয়, সাগর বন্দী
নার বন্দী নারণ বন্দী পাগলার শীক্ষাবন্দী

পাগলার রামপদ বন্দী বত্রিশ কোটি
আতমগণ তেত্রিশ কোটি দেবগণ
ত্রিশকোটি মুনিষ্যগণ শরীর বন্দ কবিয়া
আমার জ্ঞান লড়ে, ঈশ্বর মহাদেবের
জটা ছিড়া ভূমিতে পরে।

(১১) **লোহা বিদ্ধ করার সময় যে মন্ত্র** পাঠ করতে হয় —
চক্ষে চক্ষে চাহিলাম দুই চক্ষে মারিলাম
লুহার (লোহার) শিকল মারিলাম ঘর ভাঙ্গিলাম
দরজা ভাঙ্গিলাম শত্য (সত্য) যদি লরে
ঈশ্বর মহাদেবের জটা চিরা (ছিড়া) ভূমিতে পড়ে।
ওঁ হাং হীং ক্লীং দীং বীং চিং।।
শরবিদ্ধ করে রাখার সময় দশ মিনিট। এর বেশী সময় রাখার নিয়ম নেই।
বিশ্বের অশ্বিশয্য (ভীষ্মের অসিশয্যা?) ঃ—
পূর্ব ও পশ্চিমদিকে দু'টি কলাগাছ পুঁতে অশ্বিতে (অসিতে) মন্ত্রপাঠ ঃ
(১২) বিশ্বের অশ্বিশয্য (ভীষ্মের অসিশয্যা?)
পূর্ব ও পশ্চিম দিকে দু'টি কলাগাছ পুঁতে অশ্বিতে (অসিতে) মন্ত্রপাঠ ঃ
ওঁ লোহার কুচ অস্ত্র যদি তামার হতে থাক যদি তবে
ছিন্নমস্তা ধুমাবতী মন্ত্রটি অসিতে পাঠ করতে হবে। সেসঙ্গে —
ও জয়ন্ত মঙ্গল কালি ভদ্রাকালি কপালিনী
দুর্গা শিবাক্ষমা দাত্রী স্বাহাতস্থা নমস্তে।"
তিনবার এই মন্ত্র পাঠ পরে তিন মিনিট পরে
হশ্বি (অসি?) পূজা ওঁ আগম নিগম তন্ত্রসার
যদি জ্ঞান লড়েই ঈশ্বর মহাদেবের জটা ছিড়া
ভূমিতে পড়ে।
ওঁ হাং কীং দীং বীং বাং।।

(১৩) **গর্তের মন্ত্র ঃ** মাটিতে গর্ত খুঁড়ে, সেখানে ভক্তাকে রেখে মাটি চাপা দেবারকালে যে মন্ত্র পাঠ করতে হয়। তা এরূপ ঃ—
অং আং রীং চল বন্দা পাতার বীতর
শাম্ম সমস্ত পাতাল আছি গ মা তোমারি বিতর
রক্ষীতা পূজা না খাও কার্ত্তিক গনেশের মাথা খাও।

(১৪) গাছ জাগানো মন্ত্র ঃ যে গাছে চড়ক ঘোরানো হয়, সে গাছ জলাশয় থেকে তুলে আনার আগে যে মন্ত্রে গাছকে জাগাতে হয় ঃ
ও নমঃ গুরু যদি আদোর পূজা না জাগি। যদি না খাও

জলেগুণে বন্ধি আমি তোমারে। পূজার নামে কলঙ্ক রবে
তোমার নামে। যদি না খাও কার্তিক গনেশের মাথা খাও।
(১৫) **গঙ্গাবান মন্ত্র** ঃ (৯ বার)
বীংঘের ভাই আল্লাত আল্লা মাগুরে।
এক হাতে দারবায় এক হাতে আনকায়
সিংঙ্গেবেশ পারমা। কালীকা চন্দ্রির বর
তেই জানি আমার আছ আরান বন্ধা করা
এই জ্ঞান লড়ে চড়ে ঈশ্বর মহাদেবের জটা ছিড়া
ভূমিতে পরে।
(১৬) **বানপাট** চোটান (ছোটানো?) **(১৮০ বার)**
ওঁ রাং হ্রীং কোং ফট স্বাহা
পবন চলে বায় মারবান পাতাল বান
পাতাল খিলি কাটিয়া দিলাম পায়।
(১৭) **শ্মশান পূজার প্রথম জল সিদ্ধি ঃ-**
ওম্ গঙ্গেচ, যমুনা চৈব, গুদাবরী, সরস্বতী নর্মেদা, সিন্ধু, কাবেরী
ওঁ হ্রং কীং দীং বীং (মন্ত্রপাঠ করতে হবে)।
দেবদেব তায় দেব তহপট দেবগণ জিন পরী কালাচান
দুর্ধর্ষী ব্রহ্মদৈত্য ব্রহ্ম দস্তী মহাকাল কাল ভৈরব।
(মহাদৈত্য দের পূজা দিতে হবে)।
আয় কালাচান আয় জিনে পরী (ভোগ দিতে হবে।
ঐ মন্ত্র তাদের উদ্দেশ্যেও পাঠ করতে হবে।)
ওঁ জনন্তী মঙ্গল্লাকালী ভদ্রাকালী কপালিনী দুর্গা
শিবা ক্ষমা দাত্রী সাহাহস্তা নমস্ততে।
(এই মন্ত্র দ্বারা ভোগ অর্চনা করতে হবে।)

অচল বিশ্বাস নিয়ে বহুকাল ধরে ধর্ম বিশ্বাসী মানুষ এভাবেই চড়ক পূজা করে আসছে। আইনগতভাবে লোহার শলাকা বেঁধানো, পিঠে বড়শী বেঁধানো বা বিভিন্নভাবে নিজেদের কষ্ট দেবার প্রথা ও ধর্মাচরণ নিষিদ্ধ হয়ে গেলেও এক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেননি। সন্ন্যাসী কখনো শুদ্ধ বাংলায় কখনো আঞ্চলিক বাংলায় ক্ষেত্র সমীক্ষকের তার কাছে তার সাধনার গুহ্য তন্ত্রমন্ত্র ব্যক্ত করেছিলেন। কোন না কোন গবেষকের কাছে হয়তো এসব সংগ্রহ থাকা বিচিত্র নয়। তথাপি পরবর্তী গবেষণার জন্য এ সংগ্রহটিও অমূল্য বিবেচিত হবে নিঃসন্দেহে।

ভারতের স্বাধীনতার কিছু আগে সমসাময়িক কালেও পরবর্তীকালে বহু বাংলাভাষী মানুষ পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে বিশেষ করে ত্রিপুরায়, তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গেও আশ্রয় গ্রহণ করে। বাসস্থান গড়ে উঠলেও খাদ্য জোগাড়ের জন্য তাদের সংগ্রাম শুরু করতে

হয় নতুন করে। কিন্তু সে বাসস্থানও খুব বেশীকাল স্থায়ী হয়নি। রাজনৈতিক কারণে দেশভাগ বাংলাভাষী মানুষের কাছে একদিন অভিশাপ হয়ে নেমে এসেছিলেন। এবার আরো একবার বাঙ্গালী জনজীবন বিধ্বস্ত হল নতুন এক রাজনৈতিক কারণে। আবার মানুষ বাসস্থান ছাড়ল— ত্রিপুরার দাঙ্গা পরিস্থিতির পরবর্তীকালে মানুষ প্রাণ রক্ষার তাগিদ অনুভব করল। একই প্রজন্ম পর্যায়ক্রমিক এত আঘাত সইবে কি করে। মাটি সহ বহু স্থাবর - অস্থাবর সম্পত্তি তারা ত্যাগ করেছে। স্বভাবতঃই যুগ যুগ ধরে চর্চিত ও পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত সংস্কৃতির জগতেও ঢেউ লেগেছে। একদিন বৃহৎবঙ্গের অপার উদারতা মানুষকে তৃপ্ত রেখেছে। আর অতিরিক্ত সময় তাদের কেটেছে সংস্কৃতি চর্চার মধ্য দিয়ে।

ত্রিপুরার বাংলাভাষী মানুষের জীবনে রাজনীতি ও অর্থনীতিগত যে আঘাত আসছে ঘনঘন, তার শেষ নেই। অপরদিকে বিশ্বায়নের সর্বগ্রাসী প্রবাহ, যুবক - যুবতী কিশোর কিশোরী ও ধনবান মানুষদের সংস্কৃতিচর্চার জগতে আলোড়ন তুলেছে। আজন্ম লালিত ও পুরুষানুক্রমে অনুসৃত সংস্কৃতির ধারা এখন ভিন্ন গতি প্রাপ্ত হচ্ছে। তার চেহারা দ্রুত বদলে যাচ্ছে। বাঙ্গালী বারোমাসে তের পার্বণ আর করে না। তবু কিছু কিছু উৎসব - পার্বণ এখনো আঁকড়ে ধরে রেখেছে। অন্তঃজ মানুষেরা যুগযুগ ধরে চড়ককে যে মর্যাদা দিয়ে এসেছে, তার অন্তরঙ্গে ও বহিরঙ্গে বহু পরিবর্তন ঘটে গেছে, তবু যা রয়ে গেছে তা নিয়ে লোকসংস্কৃতিবিদ্, নৃতত্ত্ববিদ্ সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের ভাবার যথেষ্ট অবকাশ রয়ে গেছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ---

(১) অতুল সুর— বাঙ্গালী জীবনের নৃতাত্ত্বিক রূপ (কলকাতা-১৯৯২)

(২) তৃপ্তি ব্রহ্ম— লোকজীবনে বাংলা ধর্মসঙ্গীত ও মেলা (কলকাতা ১৯৮৯)

(৩) পল্লব সেনগুপ্ত— পূজাপার্বণের উৎসকথা (কলকাতা-১৯৮৪)

(৪) ক্ষেত্রগুপ্ত —সংযোগের সন্ধানে লোকসংস্কৃতি (কলকাতা ১৯৯২)

(৫) সুনীতি কুমার মুখোপাধ্যায় -- মেলা ও উৎসবের দর্পণে বাংলার লোকসাহিত্য (কলকাতা ১৯৯৭)

তথ্য সরবরাহকারী ঃ—

(১) সাচনী দাস

(২) শোভারাম সন্ন্যাসী

(৩) দুর্গাচরণ (দেবনাথ) সন্ন্যাসী

ক্ষেত্রবন্ধু হিসাবে যারা এই ছোট্ট গবেষণার কাজে সহায়ক ছিলেন ঃ

(১) অধ্যাপক অমিতাভ চক্রবর্তী (ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়)

(২) শ্রী বরুন চন্দ্র দাস (শিক্ষক)

(৩) শ্রী সেন্টু দেব (শিক্ষক)

(৪) ছবি — লেখককৃত

দীন শরতের বাউল গান ঃ ভূমিকা ও সংকলন

ক) বাউল গান ঃ দীন শরৎ ঃ ভূমিকা ঃ

এক সময় বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে একশ্রেণীর সাধক সম্প্রদায় ধর্মনিরপেক্ষ ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে, মানব প্রেমের বাণী সুরে সুরে, একতারা বাজিয়ে, মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলে ভালবাসার আসন দখল করে নিতে পেরেছিল, তাঁরা সাধারণ্যে 'বাউল' অভিধায় পরিচিতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। বাউলদের সমগোত্রীয় ফকির-দরবেশ-সাঁইদের গুহ্য সাধন পদ্ধতির সময়সীমা নির্ধারণে প্রাজ্ঞজনের মন্তব্য ''বাংলাদেশে বাউল-মত প্রকাশ পাইবার প্রাচীনতম কাল কিছুতেই খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নহে। কেননা মাধবেন্দ্রপুরীর কথা ছাড়িয়া দিয়া, ঈশ্বরপুরী ১৫০১ খ্রীঃ জীবিত), চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৫৩ খ্রীঃ), অদ্বৈতাচার্য্য (১৪৩৪-১৫৫০ খ্রীঃ) প্রভৃতি প্রাচীনমত বাউল বা বাউল গুরু বলিয়া যাহারই নাম করা হউক না কেন, তাহারই জীবনকাল ষোড়শ শতাব্দীকে ডিঙ্গাইয়া যায় না। সুতরাং আমরা একরূপ নিশ্চিতভাবেই স্থির করিতে পারি যে, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতেই বাংলাদেশে বাউল-মত উদ্ভূত হয়। এই মতের পক্ষে আর একটি বড় প্রমাণ এই, বাঙ্গালাদেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদ উদ্ভবের পূর্বে, আউল, বাউল, কর্তাভজা, সাঁই, ন্যাড়া, ফকির ও জিকির প্রভৃতি কোন মতবাদই দেখা দেয় নাই। বঙ্গে ইসলাম প্রবেশের পর এবং এদেশের প্রতি কেন্দ্রস্থলে সুফীদের আস্তানা স্থাপিত হইবার পর, বাঙ্গালাদেশে সাধারণভাবে সুফীদের মধ্যসূত্রতায় প্রাপ্ত যে ঐশ্লামিক পারিপার্শ্বিকতার (Atmosphere) সৃষ্টি হইল, তাহারই প্রভাবে এদেশে ভাব-জাগরণ দেখা দিল; —ইহার প্রথম ফল, গোড়ীয় বৈষ্ণব-মতবাদ। খ্রীষ্ট্রীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ঐশ্লামিক পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে থাকিয়া বৈষ্ণব ও সুফী প্রভাবে নিরক্ষর শ্রেণীর ভিতর যে মর্ম্মমুখী চিন্তা বিকশিত হইয়া উঠে তাহাই হইল ''বাউল মত''।[১] এই উদ্ধৃতির পর পাঠকের অন্তর্দৃষ্টি 'বাউল' সম্পর্কিত বিভিন্ন জিজ্ঞাসার কিয়দংশের একটি বিরাম চিহ্নের মুখোমুখী হন। আপন স্বাতন্ত্র্য ঘোষিত হয়েছে বাউলের পরিধেয় বস্ত্রে, যা এককালে সুফীরা ছিন্নবস্ত্র অসংখ্য বিচিত্র বর্ণের কাপড়ে সেলাই করে পরিধান করতেন, যাকে একজন গবেষক বলেছেন, "The Pilgrims in the street have warded off the painful cold with their broad quilts sewn of a hundred rags; and now with voices clear and sweet tney break the morning slumber of the city folk with the songs of the secret love of Madhaba and Radha" তথাপি আমাদের দেশের সাধকেরাও এরকম পোষাক পরিধানে আগে থেকেই যে অভ্যস্ত ছিলেন, এ বক্তব্যও অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। বাউল দর্শনের ভাবনায় জারিত গানের বাণী শুধুমাত্র মানুষের নিদ্রা ভঙ্গের সহায়ক ছিল মাত্র তা নয়, না - বাউল মানুষেরাও তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন গভীরভাবে। বাউল সম্পর্কিত প্রবন্ধে পন্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী বলেছেন, ''মুসলমানদের আবির্ভাবের পর ভারতীয় চিন্তার মধ্যে এবং ধর্ম সাধনার মধ্যে বড় একটা সংস্পর্শ ঘটিল। পাশাপাশি থাকিলেও দুই দলের পন্ডিত চেষ্টা করিয়া কিছুতেই দুই ধারাকে মিলাইতে পারিলেন না। তখন নিরক্ষর সাধকের দল উভয় সাধনার মান রক্ষা

করিলেন। কবীর যখন হিন্দু-মুসলমান সাধনাকে উদার প্রেম ও ভক্তিভাবের মধ্যে মিলাইতে চাহিলেন তখন পণ্ডিতেরা বলিলেন 'তুই তো নিরক্ষর মূর্খ! পণ্ডিতেরা যাহা পারিলেন না, তাহা তুইপারবি?' কবীর বলিলেন, পণ্ডিত নহি বলিয়াই হয়ত পারিব। পণ্ডিতেরা পড়িয়া পড়িয়া পাথর বনিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা লিখিতে লিখিতে ঝামা ইঁট হইয়া গিয়াছেন। তাই দুই দলের ইঁট পাথরে ঠোকাঠুকি হইলে আগুন জ্বলে। আমরা মুর্খ আমরা হইলাম সহজ কাদামাটি। তাই হিন্দু-কাদা মুসলমান-কাদার সঙ্গে সহজে মিলিবে। কিন্তু মোল্লাতে পণ্ডিতে সহজে মিল হয় না।'[৩] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাউল সঙ্গীতের দ্বারা যে কী ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছেন তার তিনটি কারণের কথা উল্লেখ করেছেন গবেষকেরা। প্রথম কারণ হিসাবে 'বাউল গানের সরল, অথচ সুগভীর অর্থ সম্পন্ন ভাষা এবং চিত্তাকর্ষক ছন্দ এবং সুর।'[৪] 'দ্বিতীয় কারণ ছিল, বাউলের ধর্মচিন্তায় উদারতার এবং অসাম্প্রদায়িক বিচারধারার প্রকাশ।'[৫] আর তৃতীয় কারণটি ছিল 'বাউল ধর্ম' আত্মোপলব্ধির ধর্ম, এই দৃঢ় বিশ্বাস'[৬]। তিনি তাই তাঁর এই দৃঢ় প্রত্যয় ১৯২৫-এ কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় দর্শন মহাসভার অধিবেশনের সভাপতিরূপে The philosophy of our people শীর্ষক অভিভাষণে বলেছিলেন, "One day I chanced to hear a song from a begger belonging to the baul sect of Bengal......... what struck me in this simple song was a religious expression that was neither grossly concrete, full of crude details, nor metaphysical in its rarefied transcendentalism. It spoke of an intense yearning of the heart for the Divine which is in Man and not in the temple, or scriptures, in image and symbols." রবীন্দ্রঠাকুর যে স্বয়ং বাউল সঙ্গীতের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, সর্বোপরি বাউল গানের আত্মরস আপনাতে গ্রহণ করে আপনার সৃষ্টিতে তাকে নবনবরূপে সৃষ্টি মত্ততায় মগ্ন হয়েছিলেন, তার প্রকাশ রয়েছে কবির উক্তিতে "আমার লেখা যারা পড়েছেন, তাঁরা জানেন, বাউল পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি অনেক লেখায় প্রকাশ করেছি। শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউল দলের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা হ'ত। আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি। এবং অনেক গানে অন্য রাগ রাগিনীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিল ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে, বাউলের সুর ও বাণী কোন এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে।'[৭]

কুষ্টিয়া অঞ্চলব্যাপী মুসলমান ফকির ও বাউলপন্থী হিন্দু বৈষ্ণব প্রভৃতির ধর্মসাধন-বিষয়ে ব্যাপক চর্চা যেমন বহুকালের, তেমনি কুষ্টিয়া সন্নিহিত বৃহত্তর যশোর অঞ্চলও মরমী সাধনার জন্য প্রসিদ্ধ। আবার নরসিংদীতে পুরুষ-পরম্পরায় সহজিয়া-বাউল সম্প্রদায়ের বাস। রাজশাহীতে যেমন বাউল কবি জন্মেছেন (খজমত শাহ), তেমনি ময়মনসিংহের (জালাল খাঁ) কুমিল্লার মাটিও বিখ্যাত বাউল সাধকদের পাদস্পর্শে ধন্য হয়েছে। সর্বোপরি বৃহত্তর সিলেট জেলায় ফকিরিতন্ত্রের সাধনা ও মরমী ভাবগানের ঐতিহ্য রয়েছে। যে কারণে গবেষক পণ্ডিতেরা বৃহত্তর নদীয়াকে যেমন মনে করেন, আউল-বাউল-ফকির-বৈষ্ণবের দেশ, তেমনি কুষ্টিয়া অঞ্চল থেকেই বাউলের উদ্ভব মনে করেন। "কুষ্টিয়া অঞ্চল হইতেই এই ভাবধারা চতুস্পার্শবর্তী

জেলায় ছড়াইয়া পড়ে এবং অনেক মুসলমান ও হিন্দু জাতির বাউলের উদ্ভব সম্ভব হয়।'৮ আবার আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন, কুষ্টিয়া হল 'বাংলার বাউলের লীলাভূমি'।

অসংখ্য বাউলের জন্ম যেমন ঘটেছে এই বৃহৎ বঙ্গের মাটিতে তেমনি বাউল সুলভ উদাসীনতার কারণে অনেক বাউলের পূর্ণ পরিচিতি আজও গবেষকের অজ্ঞাতেই রয়ে গেছে। সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাউল-লালনের সঙ্গীত বিশ্লেষণ করে ডঃ সনৎ কুমার মিত্র[৯] সেসব সঙ্গীতের ষোলটি শ্রেণী নির্দেশ করেছেন। তন্মধ্যে বিষয় অনুসারে ডঃ মিত্রের বিন্যাসে যা রয়েছে সেগুলো ক্রমান্বয়ে গৌরাঙ্গ, গুরু, মুরশিদ্, মারফত, দয়াল - কান্ডারী, বৈরাগ্য, মানুষ, মনের মানুষ। আবার ভাব - অনুসারে বিন্যস্ত সঙ্গীত বিভাগগুলি রসিকমানুষ, সাধনপন্থা, প্রেম, মনঃশিক্ষা, ভাবাত্মিকপদ, দেহতত্ত্ব, ইসলাম প্রসঙ্গ, বিবিধ। সব বাউলেরাই তাঁদের সঙ্গীত আলোতে - আঁধারে জারিত করে রেখেছেন বলে উপলব্ধি ক্ষমতা ও তত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে সেসবের রসোদ্ধার আদৌ সম্ভব নয়। বাউলদের নিয়ে সর্বপ্রথম গবেষণামূলক একটি মূল্যবান বৃহৎ প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন মৌলবী আবদুল ওয়ালী।[১০] সে ধারা আজও বজায় রয়েছে, এবং যা নতুন আঙ্গিক, নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে সমৃদ্ধি লাভ করছে ক্রমশঃ। 'আমি যন্ত্রের (মূলে রয়েছে 'যমের', সামান্য বদলে দেওয়া হল) কাছে জাদু শিখেছি, জাগাতে পারিনে। জাগরণ ঘুচিয়ে দিতেই পারি।'১১ নব নব প্রযুক্তির উন্মত্ততায় মানুষ জাগাতে গিয়ে কি যে হচ্ছে, না হচ্ছে তার মূল্যায়ণ ভবিষ্যতে হলেও লোকসংস্কৃতির বুকে গভীর কাঁপন জেগেছে! আসন্ন প্রবল ভূ-কম্পনের প্রাবল্যে মুছে যেতে বসেছে সমস্ত লোক-সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল। সব সাংস্কৃতিক ভাবনার উৎসস্থল বৃহত্তর লোকজীবনের সংস্কৃতি এখন অবলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে উপনীত, এর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার পথ প্রস্তুত। স্বভাবজ ক্রম অবলুপ্তির ফলে নব সৃষ্টির সম্ভাবনা বেঁচে থাকে, কিন্তু গ্লোবালাইজেশনের কল্যাণে বিশ্বব্যাপী এক কৃত্তিম সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল সৃষ্টি হচ্ছে অত্যন্ত দ্রুতলয়ে। ফলতঃ প্রতিটি জাতির পরিচিতিই (identity) একদিন মুছে যাবে। পন্ডিত লেখকের উক্তি "মুখ্যত তিনটি দিকে প্রসারিত হয়েছে সেই অর্থনীতির পথ, — উদারীকরণ, ' বেসরকারীকরণ ও বিশ্বায়ন। এই ত্রিধারা অনুসরণের ফলে দ্রুত বদলে গেছে ভারতীয় অর্থনীতির মৌলিক সামর্থ এবং চরিত্র। এরই সঙ্গে স্বভাবের গুণে পাল্টে গেছে ভারতীয় সংস্কৃতির আবহাওয়া এবং মানচিত্র। ইতিহাসের শিক্ষা থেকে এ কালেরশক্তিমান বহুজাতিক পুঁজিবাদী দেশগুলি, আর বুঝেছে, অর্থনৈতিক দখলদারী দীর্ঘদিন কায়েম করতে হলে যে কোন দেশে তাদের মগজটাকে প্রথম আক্রমণ করতে হবে— সাংস্কৃতিক দুষণ ঘটিয়ে।"[১২] "It is revolution – a continuous revolution – but with out any revolt."

লোকসংস্কৃতির যে প্রাণশক্তি নিহিত আছে মানুষের জীবন যাপনে হাসি-কান্নায়, সুখ-দুঃখে, আশা-আকাঙ্খায়, সেখানে কৃত্তিম শিশু-খাদ্যের মত গ্লোবাইজেশানের ফসল নিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হবে মানুষের সংস্কৃতির প্রতি চির তৃষিত আকাঙ্খাকে, কেননা ইতিমধ্যেই তা দখল করে নিয়েছে, মানুষের মনের জগৎকে। নতুন প্রজন্মের সঙ্গে ইতিমধ্যে এই বৃহত্তর সাংস্কৃতিক বলয়ের বিচ্ছেদ সূচিত হয়ে গেছে; পরন্তু, পূর্ব প্রজন্মও উত্তরাধিকারীর অভাবে হতাশাগ্রস্ত ও পরাজয়ের গ্লানিতে আঘাতপ্রাপ্ত ও কোমাগ্রস্ত।

এ রাজ্যে বাউল সঙ্গীতের সন্ধানে ক্ষেত্র গবেষণায় নির্গত হয়ে 'দীন শরৎ বাউলে'র কিছু সঙ্গীত হস্তগত হয়। স্বত্তাধিকারী অত্যন্ত অবহেলায় সেগুলিকে কালের গর্ভে বিসর্জন দিয়েছিলেন প্রায়— সেখান থেকে সেগুলিকে উদ্ধার করে আনার পর দীন শরৎ বাউল সম্পর্কে আগ্রহান্বিত হই। কিন্তু, একটি মাত্র সূত্র ছাড়া দীন শরৎ বাউল প্রায় অগোচরেই থেকে যান। সূত্রটি হল, ১৯৩৪ইং সনের কোন এক সময় কলকাতা থেকে শরৎচন্দ্র নাথ মহাশয়ের সম্পাদনায় 'দীন শরতের বাউল গান' গ্রন্থটি। ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে এখনো নৈশকালীন কীর্তনের আসরে 'দীন শরতের বাউল গান' গীত হয়ে থাকে। সেখানে পেশাদার অপেশাদার গায়কের খোল-করতাল সহযোগে এসব বাউল সঙ্গীত পরিবেশন করে থাকে। মূল সংগ্রহটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে গানগুলির পরিবর্তনশীলতা, পদচ্যুতি বা পদসংযোজন, অন্যের গান দীন শরতের নামে প্রচলিত থাকা জাতীয় লোকসংস্কৃতির এসব বৈশিষ্ট্যগুলি পরিলক্ষিত হবে। কিন্তু, এখানে তাঁর গানগুলি তুলে ধরাই হল মূল লক্ষ্য। গবেষণার পরবর্তীস্তরে এই সংগ্রহের উপর ভিত্তি করে গবেষকেরা তার মূল্যায়ণে ব্রতী হবেন হয়তো বা, কিন্তু সম্পদ হারিয়ে যাবার আগে সেসব সংগ্রহ ও সংরক্ষণই আশু প্রয়োজন। লিপিকরের হস্তাবলেপনে সঙ্গীতের অবয়বের পরিবর্তন যা ঘটেছে, এখানেও সেটিকে মূল ধরে নিয়ে হুবহু সংকলিত হয়েছে, যদিও পাদটীকায় তার 'যথাসম্ভব' সংশোধনের চেষ্টা করা হয়েছে।

দীন শরৎ বাউল তাঁর বাউল সঙ্গীতে গুরুমুখী সাধনার কথাই ব্যক্ত করতে চেয়েছেন, যা বাউলদের তথা বাউল-সাধনার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। গুরুশিষ্যের প্রশ্নোত্তরের দ্বারা ''সাধককে প্রচলিত সমাজ সত্যের বিরুদ্ধে বা বিপরীত মার্গে গিয়েই সত্যকে আবিষ্কার করতে হয়।''[১৩] এখানে, দীনশরতের এই বাউল সঙ্গীতগুলিতে, অপরাপর বাউলদের সঙ্গীতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কথাই ব্যক্ত হয়েছে। বাউলের যে তত্ত্ব, তাতে ব্যক্ত হয়েছে যে, ''সর্বজন রজবীজে জাত. মরণশীল এবং সম দুঃখ সুখ সম্পন্ন। কিন্তু অহং চেতনায় মানুষ নিজেকে স্বতন্ত্রাভাবে; অন্যাপেক্ষা অধিকতর ভোগ করতে চায়। সমাজে সৃষ্টি করে স্বার্থের সংঘাত। কিন্তু তৃপ্তিব তত্ত্ব না জানায় মানুষ, অতৃপ্ত থাকে। অধিকতর ধন, ভূমি, নারীর উপর সে নিজের দখলদারী প্রসারিত করে। মৃত্যু, ব্যক্তির এরকম মালিকানাসমূহ মুছে দেয়! .... দশ ইন্দ্রিয় এবং ষড়রিপুর চক্রান্তে প্রকৃতি জীবজন্মের প্রবাহকে সচল রাখে। সন্তানের জন্ম প্রক্রিয়ার অনুসরণে সাধক দেখে যে, উচ্ছ্বসিত আনন্দের ক্রমভঙ্গ হয়ে সৃষ্টি হয়। ....কামে, সন্তান জন্মে, অত্যাধিক পরিশ্রমে, মূল বস্তুর ক্ষয়ে জরা এবং মৃত্যুর ছায়া দেহে প্রসারিত হয়। .... অথচ মানুষ এক বিবল ক্ষমতার অধিকারী।''[১৪] মানুষ দুর্লভ মানব জন্মে পূর্ণ আনন্দ লাভের জন্য বাউল সাধনপন্থা অবলম্বন করে। এতদ্‌ভিন্ন দীন শরৎ বাউলের সঙ্গীতের শ্রেণী বিন্যাস করলে ভাব অনুসারে যে সব বিভাজন রয়েছে বা বিষয় অনুসারে বিন্যস্ত কোন কোন বিষয় রয়েছে, তা লক্ষ্য করা যায়। দীন শরতের বাউল সঙ্গীত যেভাবে এখনও গীত হয়, তাতে তাঁর জনপ্রিয়তা এবং সঙ্গীতের সংখ্যার অনুমান সঙ্গত না হলেও প্রাসঙ্গিক। তবে এখানে সংগ্রহটি তেমন সমৃদ্ধ নয় বলে, পরন্তু ব্যাপক আলোচনা উদ্দেশ্য নয় বিবেচনায় সংগ্রহটি মাত্র তুলেধরা গেল।[১৫]

উল্লেখ্যপঞ্জী

১। বঙ্গে সুফী প্রভাব — মহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী; প্রথম খন্ড/বাংলা একাডেমী/ঢাকা/পৃষ্ঠা/১৬১।

২। Vaisnavism in Bengal : Early Mediaeval Back ground/Ramakanta Chakraborty, Pg–9 (Sanskrit Poetry from Vidyakaras' Treasury Denial H. H. Ingalls).

৩। বাউলার বাউল — ক্ষিতিমোহন সেন।

৪। পশ্চিমবঙ্গে বাউলধর্ম বিষয়ক অধ্যয়নের বিভিন্ন ধারা (প্রবন্ধ) — রমাকান্ত চক্রবর্তী।

৫। তদেব।

৬। তদেব।

৭। হারামণি (প্রথম খন্ড) 'আশীর্বাদ'। মহম্মদ মনসুর উদ্দীন (ঢাকা - ১৯৭৬)।

৮। বাঙলাদেশের বাউলদের চালচিত্র (প্রবন্ধ) — আবুল আহসান চৌধুরী।

৯। লালন ফকির ঃ কবি ও কাব্য — সনৎকুমার মিত্র।

১০। বাউল ফকির বিষয়ে বাঙ্গালীর প্রথম সরজমিনে লেখা মৌলবী আবদুল ওয়ালীর প্রবন্ধ। এটির নামকরণ করা হয়েছিল One some curious tenets and practices of a certain class of Fakirs of Bengal'। ১৮৯৮ সালের ৩০ নভেম্বর বোম্বাইয়ের অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সোসাইটিতে মূল নিবন্ধটি আবদুল ওয়ালী পাঠ করেন। এটি গুহ্য সম্প্রদায় সম্পর্কে বাঙ্গালীর প্রথম সরেজমিন অনুসন্ধানমূলক রচনা।

১১। ডঃ সনৎকুমার মিত্রের বক্তব্য অনুসরণ করে ''মুক্তধারা' নাটকের একটি পংক্তি (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) তুলে ধরা খেল।

১২। বিশ্বায়ন ও লোকসংস্কৃতি (প্রবন্ধ) - সুরেন মুখোপাধ্যায়। লোকসংস্কৃতি গবেষণা — চতুর্দশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা; সম্পাদক সনৎকুমার মিত্র;

১৩। গুপ্তদেহ সাধনা এবং তার সমাজতত্ত্ব (প্রবন্ধ) ঃ শক্তিনাথ ঝা।

১৪। তদেব।

১৫। ধ্রুবপদ ঃবাংলার বাউল ফকির (বার্ষিক সংকলন) সম্পাদক সুধীর চক্রবর্তী।

খ. দীন শরতের বাউলগান ঃ ক্ষেত্রসমীক্ষালব্ধ ফসল ঃ

সঙ্গীত সংখ্যা ঃ ১

গুরু

আগে স্থুলের তত্ত্ব[১] জান কেমন —
মাতৃগর্ভে মহাপদ্মে ছিলেরে জখন[২]
রক্তবিজে এক হইয়ে স্থূলাকারে[৩] কইরে[৪] ধারণ।।
১) পিতামাতার রমন কৃয়াতে৫/মাতৃগর্ভে প্রবেশিলা বিন্দুরূপেতে।
মহতত্ত্ব৬ হইলে তাতেরে/শুক্র শোণিতে মিলন।।
২) মহতত্ত্ব শক্তি বলতে দশ ইন্দ্রিয়ের / উৎপত্তি হয় রজের কৃয়াতে।
সৃষ্টিকর্তা সেই জন্যতে রজগুণে ব্রহ্মা হয়।।
৩) জন্মিলে অবশ্য মৃত্যু হয়/সেইজন্য স্থুলের দেশকে জম্পদ্বিপ[৭] কয়।
মাতাপিতা হইলেন আশ্রয়/আসা-যাওয়া মূল কারণ।।
৪) আলস্বএইআচার কেবলি/কালের ধ্বংস[৮] হয় বলে কয় অনিত্য কলি
—দীনশরৎ বলে তার প্রণালী/পুরাণ হইল উদ্দিপনা।

১—তত্ত্ব, ২—যখন, ৩—স্থূলাকারে, ৪—করে, ৫ — ক্রিয়াতে, ৬ - মহাতত্ত্ব, ৭ — জম্বুদ্বীপ, ৮ - ধ্বংস।

প্রতিটি সঙ্গীতে ১, ২, ৩ সংখ্যায় স্তবক বিন্যস্ত রয়েছে। সঙ্গীত কালে বাউল প্রথম স্তবকটিকে ধ্রুবপদ হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

সঙ্গীত সংখ্যা ঃ ২

শিষ্য

তুমি কও মুনিহে গুরুধন কেবা গুরু,/ কেবা শিষ্য জানতে আকিঞ্চন।
— গুরুতত্ত্ব না জানিলে/ কিসে হয় মাধব ভজন।।
১) গুরু শব্দের কিবা অর্থ হয়/গু-কারে আর রু কারেতে কি পদার্থ হয়।
— আমি জাব১ বলে সেই সমুদয়, /করতেছি এই নিবেদন।।
২) সন্ধ্যাদেবীর কিবা আকৃতি/দিনে তিনবার হইল কেন সন্ধ্যা আকৃতি।
— কোন সময়ে কোন যুবতী/সেই দেবী করে ধারণ।।
৩) দীন শরৎ বলে তত্ত্ব সমাচার/জানব বলে দয়াল গুরু বাসনা আমার।
—- কি পদ্ধতি সন্ধ্যা পুজার২/জানতে চাই তার মুল কারণ।।
১—জানব, ২ —- পূজার, ৩ — মূল।

সঙ্গীত সংখ্যা ঃ ৩

গুরু

যিনি অখন্ড মন্ডলাকার —/ গুরুরূপে ভগবান হইলেন সরকার।
দেহের গুরু পরম আত্মা/জীব আত্মা হয় শিষ্য তার।।
১) গুরু শব্দের অনেক অর্থ হয়/গুরু তত্ত্ব মতে আধার বলে কয়।— রু কারেতে হয়

জ্ঞানের উদয়/নাশ করে সে অন্ধকার।।

২) সন্ধ্যা জিনি[১] গায়ত্রী তিনি/তিন সন্ধ্যায় তিন মুর্তি[২] ধরে, ত্রিগুণ ধারিণী।

সেই তত্ত্ব না জানেন জিনি/সন্ধ্যা পূজা[৩] হয় না তার।।

৩) ব্রহ্ম শক্তি প্রভাত সময়ে/শামবর্ণ চতুর্বাহু মধ্যান্নেতে[৬] হয়।

সহান্নে৭ বরদা দেবী/শিবশক্তি চমতকার৮।।

৪) দীনশরৎ বলে পরম তত্ত্বজ্ঞান/পারে যদি কর যেয়ে সৎগুরু সন্ধান।— ধ্যানের গুরু হয় বর্তমান/তত্ত্ব যানা৯ আছে যার।।

১—যিনি, ২—মূর্তি, ৩ — পুজা, ৪— ব্রহ্ম, ৫—শ্যাম, ৬—মধ্যাহ্নেতে ৭— সহাস্যে (?), ৮ — চমৎকার, ৯ —জানা।।

সঙ্গীত সংখ্যা : ৪

শিষ্য

একটি পরম তত্ত্ব জানব বলে/বাসনা আমার।

পতিত পাবন দয়ালগুরু/তুমি সর্ব মুলাধার[১]।।

১। কে বা গুরু কে বা শিষ্য/কে গড়িল এই বিশ্ব।

আমি অপানতিয়[২] রাম-দসু[৩]/ঘুচাইয়া দাও অন্ধকার।।

২। আমার কিসে হইল দেহের গঠন/দেহে আছে কোন মহাজন।

ঐ গুরু শিষ্য আমরা দুইজন/আগে জন্ম হইল কার।।

৩। দীন শরৎ বলে তুমি সত্য/ভোত৪ ভবিষ্যৎ[৫] সর্ব্ব জ্ঞাত।

আমায় বলে দিয়ে সর্ব্বতত্ত / ভব সিন্ধু কর পার।।

১ - মুলাধার, ২ - অপাংক্তেয়, ৩ - এখানে কি রামদস্যু বলতে রত্নাকর দস্যুর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ৪ - ভূত, ৫ - ভবিষ্যৎ।

সঙ্গীত সংখ্যা : ৫

গুরু

দেহের গুরু পরম আত্মা/শিষ্য হয়রে মন।

গুরু শিষ্য এক হইলে/আসা যাওয়া হয় বারণ।।

১। প্রকৃতি পুরুষ হইতে/মহতত্ত্বে জনম তাতে।

আকাশ আদি পঞ্চভুতে[২]/হইয়াছে দেহ গঠন।।

২। বিজ[৩] হইতে জন্ম বৃক্ষ/বৃক্ষেতে ফল হয় প্রত্যক্ষ।

ঐ দেহ দেহী এই সম্পর্ক/কর তত্ত্ব নিরূপম।।[৪]

৩। পাচ পাতা পচিশের তত্ত্ব৫/ জেনে শুনে হওরে মত্ত।

আছে পঞ্চ আত্মা দেহস্থিত/দশে ছয়ে ষোল জন।।

৪। দীন শরৎ বলে তও জেনে,/সাধ্য বস্তু লওরে চিনে।

বাধ্য করে ষোল জনেরে/করবে তার অন্বেষণে।।

১—মহাতত্ত্বের (?), ২ — পঞ্চভূতে, ৩ — বীজ, ৪ — নিরূপণ ৫— পাঁচ পাঁচে

পাঁচিশের তত্ত্ব,

সঙ্গীত সংখ্যা ঃ ৬

শিষ্য

আকাশ বিষ্ণু বহ্নি ধরা/ না ছিল যখন।

না ছিল সেই চন্দ্রসূর্য/ব্রহ্মা বিষ্ণু পঞ্চানন।।

১। নিরাকার সব নিরকৃতি২/না ছিল কোন আকৃতি।

সে কালে পুরুষ প্রকৃতি/ কেমনে হইল ব্রহ্মা শব্দের সৃজন।।

২। ব্রহ্মা শব্দের কিবা অর্থ/ কোন আকুতি৩ কি পদার্থ।

সগুন কিসে কমাতিত৪/ সচেতন কি অচেতন।।

৩। দিন - শরত৫ বলে ভাবছি বসে/ এ ব্রহ্মান্ড হইল কিসে।

গুরু বলে মোরে কোন পুরুষে/করিলেন সৃষ্টি পতন৬।।

১— ব্রহ্মা, ২—নিরাকৃতি, ৩ — আকৃতি, ৪ —?, ৫ — দীনশরৎ, ৬ — পত্তন (?)
।।

সঙ্গীত সংখ্যা ঃ ৭

গুরু

মরমাত্মা পরম ব্রহ্মা১ নিগুন ....২নিরাকার।

ব্রহ্মান্ড সৃজন তরে, আপনি হইল সাকার।।

১। অনাদির আদি যিনি/প্রকৃতি৩ সৃজিলেন তিনি।

শূন্য ভরে পুরীখানি/করিলেন বর্ত্তোলাকার৪।।

২। শক্তিগর্ভে অন্ত হইল/অন্তেতে ব্রহ্মান্ড রহিল।

তাতে মহাবিষ্ণু জনমিল/ক্ষীরুদে বসদি ঘর।।

৩। প্রকৃতি পুরুষ হইতে / মহতত্ত্বের জনম তাতে।

দিন শরৎ বলে ত্রিগুণেতে/জন্ম হইল তিন জনার।।

১—ব্রহ্মা, ২—এইস্থানে কোন শব্দ ছিল, কিন্তু জীর্ণ খাতা থেকে তা উদ্ধার করা যায়নি, ৩—প্রকৃতি, ৪—বর্তুলাকার।

সঙ্গীত সংখ্যা ঃ ৮

শিষ্য

মহাবিষ্ণুর হংসে হইলেন/ব্রহ্মা বিষ্ণু পঞ্চানন।

কোন শক্তিতে১ কোনগুনেতে/ কে করে সৃজন পালন।।

১। সসাগড়া বসুন্ধরা/ কোন পুরুষের হাতে গড়া।

জলের উপর এই সে ধরা/কেমনে হইল সৃজন।।

২। সৃষ্টিতত্ত্ব জানব বলে/এই বাসনা হৃদকমলে।

দয়ালগুরু আমায় বল/খোলে আদি অন্ত্য বিবরণ।।

৩। দীন শরৎ বলে হইলেম ভ্রান্ত/বেদবেদান্ত না পাই অন্ত।

দূর হইতে হয় দুরন্ত/অচিন্ত[৩] সাধনের ধন।।
১—শক্তিতে, ২—পুরুষের, ৩—অচিন্ত্য
সঙ্গীত সংখ্যা ঃ ৯
গুরু
তিন পুরুষের সৃষ্টি নিলা১/খেলা অতি চমৎকার।
অনন্ত বিভোর নীল/জানতে অতি চমৎকার।।
১। সত্ত রজ তম গুণে/ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিনে।
সৃজন পালন সংহারণে/মত্ত আছে অনিবার।।
২। মধু কৈটব[২] দৈত্য ছিল/বিষ্ণু চক্রে সে মরিল।
ও তার মেদেতে মেদেনী হই[৩] /বসুন্ধরা[৪] নামটি তার।।
৩। কুর্ম্মের উপর গজ রহিয়াছে/তার উপর বাসুকি আছে।
তিনজনে বহিতে আছে/সশাগরা ধরার ভার।।
৪। আদ্যাশক্তি মহামায়া/সকলি তাহার কারা।
দীনশরৎ বলে না বুঝিয়া/আস যাওয়া হইল সার।।
১—লীলা, ২— কৈটভ, ৩—হয়, ৪— মেদিনী, ৫—সসাগবা
সঙ্গীত সংখ্যা ১০
শিষ্য
সত্ত রজ তম গুণে ব্রহ্মা বিষ্ণু হর।
আপন আপন বিষয় বিষয় নিয়ে মত্ত আছে নিরন্তর।।
১। সৃষ্টি কারণ পদ্ম যোনি পালন করেন চক্রপানি।
শূল হাতে শূলপানী সংহার করেন চরাচর।।
২। কেবা জীবের মুক্তিদাতা বল গুরু তত্তকথা
কে হইয়াছেন মূল দেবতা কারে ভজে সুরনর।।
৩। বিষয়ী জে জন হইয়াছে হুকুম মত কাজ কইরাছে।
তিনের উপর কেবা আছে, নিখিল ব্রহ্মান্ডের ইশ্বর।।
৪। দীনশরৎ বলে সেই মুলাধার সাকার কি হয় নিরাকার।
গুরু বল মোর তাই সারাৎসার তত্ত কথায় সদুত্তর।
সঙ্গীত সংখ্যা ১১
গুরু
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব করে সৃজন পালন নয়।
তিনে হয় এ ব্রহ্মান্ড একে তিনে ভিন্ন নয়।।
১। ব্রহ্মা উপাসক কত কে হবা হয় ভাগবত।
শৈব শাক্ত গানপথ্য ভিন্ন ভিন্ন মত রয়।।
২। যে যাকে ভজনা করে সেই ত মুক্তি দিতে পারে।

ছোট বড় বলব কারে এক ভিন্ন দ্বিতীয় নয়।।
৩। নিরাকার যে জন হইয়াছে তার কিরে মন ভজন আছে।
সাকার মূর্ত্তি ধরিয়াছে পূর্ণ ব্রহ্ম - জ্যোতির্ম্ময়।।
৪। দীনশরৎ বলে তত্ত জেনে সাধ্যবস্তু লওরে চিনে।
যারে সদায় ভাবে তিনে প্রতি ঘটে সে জন রয়।।
সঙ্গীত সংখ্যা ১২
শিষ্য
শৈব শাক্ত গানপথ্য মতের অন্ত নাই।
শিব শক্তির ভজন কথা তব মুখে সুনতে পাই।।
১। কেবা শিব কেবা শক্তি শিব শক্তির কি আকৃতী।
কোন দলে হয় কার বসতি কেমনে তাহারে পাই।।
২। গুরু তব মুখে সুনি প্রতি ঘটে আছেন তিনি।
এই যে আমার দেহখানি শিবশক্তি ছাড়া নাই।।
৩। বেদে বলে শিবই সত্য জানলেম না সেই পরমতত্ত্ব।
শিব শক্তির কি মাহাত্ম্য কত সুনিছে দয়াল গোসাই।।
৪। দীনশরৎ বলে এই বাসনা লয়ের কর্তা হয় যেজনা।
ভবে জন্ম আর যে হয় না, তার পদে লয় হয়ে যাই।।
সঙ্গীত সংখ্যা ১৩ গুরু
শিব শক্তির সাধন তত্ত জানলে না রে মন।
তরবে যদি ভব নদী শক্তিকে কর সাধন।।
১। ভূজঙ্গিনী রূপ ধরে আছেন নিক্তি মুলাধারে।
সাড়ে তিন পেছেতে ঘেরে মহানিদ্রায় অচেতন।।
২। মহামায়া আদ্যাশক্তি, শক্তি হতেই জগত মুক্তি।
গুরু কাছে নিয়া মুক্তি শক্তিকে কর সাধন।।
৩। শিঙ্গা ডম্বুর নিয়া করে আছেন শিব সহস্রারে।
শিব শক্তির মিলন করে ফুরাও মনের আকিঞ্চন।।
৪। ভেবে দীন শরৎ বলে শিবই মত্ত ভুমন্ডলে।
বিনাশ নাই যায় প্রলয় কালে সেইত বিশ্বের মোল[১] কারণ।।
১— মূল,
সঙ্গীত সংখ্যা ১৪
শিষ্য
তোমি মুলাধার গুরু তোমি মুকাধার।
আমার দেশ কাল পাত্র বুঝাইয়া ঘুচাও মনের অন্ধকার[১]।।
১। স্থুলের দেশে ঐ মায়া পাসে

কামিনী কাঞ্চনের ভুলে ছয় রিপু বসে
আমি দীন গয়াইলাম মিছা
কাজে সাধন ভজন হইল না আর।
২। কোনটা হয় প্রবর্ত্তকের দেশ
কিবা কাল কিবা পাত্র জানলামনা বিশেষ।
গুরুবল মোরে সেই উপদেশ আশ্রয় নিতে হইবে কার।।
৩। আলম্বন আর উদ্দিপন কি হয়
কত বিধা ভক্তিধর্ম সেই দেশেতে রয়
কোন রতি সাধন করা হয় মোরে সেই সমাচার।
৪। দীন শরৎ বলে করি মিনতি
কত সরল দয়াল গুরু সেই দেশের রীতি।
শিক্ষাগুরুর কি আকৃতি প্রকৃতি কি পুরুষ আকার।।
১— অন্ধকার
সঙ্গীত সংখ্যা ঃ ১৫
গুরু
শ্রী গুরুর চরণ মন তুই করগারে ভজন
দেশকালপাত্র না জানিলেরে বিফল তোর
মানব জিবন।
১। নবদ্ধিপ হয় পবর্ত্তকের[১] দেশ
কাল হয় অনিত্য কলি জেনে লও বিশেষ
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু পাত্র হইলেন সেই মহাজন
২। শ্রীগুরু হইলেন সে দেশের আশ্রয়
প্রকৃতির ভাব কান্তি বিলাস তাতে রয়।
আলম্মন হয় বৈষ্ণব গোসাই উদ্দিপন
হরি সংকির্ত্তন।।
৩। নব বিধা হয়রে ভক্তি সাধারণে
রতি হয় বাগবতের২ উক্তি
দিক্ষা শিক্ষা জীবের মুক্তি
নইলে কেহ পায় না সে ধন
৪। দীনশরৎ বলে সেই দেশে চল
কলির জীব তরাইতে গৌর নিতাই যে দেশে এল।
জগাই মাধাই যে তরাইল ধরগারে তার যুগল চরণ।।
১—প্রবর্ত্তকের, ২— ভাগবতের

সঙ্গীত সংখ্যা ১৬

শিষ্য

নবদ্বিপে হয় যত বৈরাগীর আশ্রয়/উপাসনা নিলে নাকি বৈষ্ণবী সঙ্গে রাখতে হয়
১। বৈরাগী হয় তিন অক্ষরে বৈ কারে/রা কারে আর গি কারে।।
কোন অক্ষরে কোন গুণ ধরে গুরু বল সেই সমুদয়।।
২। কেন তারা ডোর কপিন পরে/তাহার মধ্যে কোন দেবতা বিরাজ করে
— মালা তিলক বেশ ভোষণে কারবেতে[২] ভাবে উদয়।।
৩। মরলে তাদের শ্রাদ্ধপিন্ড নাই
কেমনে হবে মুক্তি বৈরাগী গোসাই/দিনশরৎ বলে কোন দেশে যাই
মনে বড় লাগে বয় ।।

১—? ২ — ভয়

সঙ্গীত সংখ্যা - ১৭

গুরু

চৈতন্যমন্ত্র গুরু দিয়াছে যখন/হবে অমনি প্রেতের মুক্তি/লগবে[১]না শ্রাদ্ধ তর্পণ।।
১। বৈকারে বৈদিক কৃয়া[২] হিন/রা কারে রাধা কৃষ্ণ ভজে চিরদিন
গী কারে গিরীধারী গোপি বল্লব৩
২। ডোরেতে বা স্মক কৃষ্ণ যে জন মহি রয়৪/কপিনে সর্ব্বদেব যানিবে নিশ্চয়
বরি বাঁসে সয়ং সাম্ভু আর সে নর নারায়ণ।।
৩। মালাতে তুলসি দেবী রয়/তিলকে দ্বাদশ গোপাল জাগ্রত যে হয়
তাতে হয় জ্ঞানের উদয় নইলে কি হয় সাধ্য সাধন।।
৪। দীনশরৎ বলে শ্রীরূপের মতে অটল হইলে পারে
বৈষ্ণবি রাধীতে ফেইল হলে সেই পরীক্ষাতে
চৌরাশিতে হয় গমন।।
১—লাগবে, ২—ক্রিয়া, ৩—বল্লভ, ৪—পংক্তিটির অর্থ স্পষ্ট নয়

সঙ্গীত সংখ্যা ১৮

শিষ্য

কোথা হতে এলে গৌরা সুনার[১] নদীয়ায়
হইয়ে কি ধন হারা অমনি ধারা ধারায়[২]
অঙ্গ ভেসে যায়
১। নাই গৌরার মাতাপিতা নাই/কি
ভার্য্যা সুচারিতা।।
কি দুঃখে মোরায়ে৩ মাথা সন্নাসী নিয়ে যায়
২। ঐ যত ভক্ত৪ বৃন্দ অদতা আর
রামানন্দ। কেবা গৌর নিত্যানন্দ

চিলয়ে[৫] কুথায়।।
৩। গদাধর শ্রী নীবাসে কে বা ভক্ত হরীদাস।
জানতে মনে এই অভিলাস বলয়ে আমায়।।
৪। দীনশরৎ বলে গৌর তত্ত্ব/গুরু আমায় বল সত্য।।
আমি জানব বলে সেই মাহাত্য/জিজ্ঞাসি তোমায়।।
১ সোনার, ২— ধরায়, ৩—মুড়ায়ে, ৪--ভক্ত, ৫—ছিলয়ে।

সঙ্গীত সংখ্যা ১৯

গুরু

বৃন্দাবনে ছিল যারা কানাই আর বলাই।
নৈদে উদয় হইল এসে দু'টি ভাই গৌর নিতাই।।
১। ব্রজরমা যত ছিলেন সকলি
নদিয়া এলেন।।
রাধা গদাধর হইলেন সখিরা অষ্ট গোষাই
২। বম্মা হইলেন হরিদাস নারদ মোনি শ্রীনিবাস।
অদৈতা কৃত্তিবাস যে আনিল দু'টি ভাই।।
৩। প্রেমঋণ শোধিবার তরে জন্ম নিলেন শাচর ঘরে।।
বিষ্ণুপ্রিয়া প্রেয়সিরে ছেড়ে চলে যায় নিতাই।।
৪। দীনশরৎ বলে শ্রীচৈতন্য নবদ্বীপে অবতির্ণ
ধন্য কলির যুগধন্য এমন দয়াল কেহ নাই।

সঙ্গীত সংখ্যা ২০

শিষ্য

কোলবধু[১] বিষ্ণুপ্রিয়া পিয়সি[২] তুষার৩/সেত অবলা সরলাবালা/
কি অপরাধ ছিল তার
১। সতি অতি পতিব্রতা সুলক্ষণা সুচারিতা।
গেলেন তারে কইরে অন্যথা এ কেমন তাহার বিচার
২। রাধার ঋণ[৪] শোধীতে[৫] নৈদে এসে/ভাবকান্তি বিলাষ[৬] নিলেন
আরও কত ঋণের দায়ী হইলেন এবার দেকতে[৭] পাই।
৩। করচেন গৌরা জীবকে দয়া তার পরীছয়[৮] বিষ্ণুপ্রিয়া
দীনশরৎ বলে তাই ভাবীয়া৯ হইলাম চমৎকার।
১—কূলবধূ, ২— প্রেয়সী, ৩— তোমার, ৪—ঋণ, ৫— শোধিতে, ৬—বিলাস, ৭-দেখতে, ৮—পরিচয়, ৯—ভাবিয়া

সঙ্গীত সংখ্যা ২১

গুরু

বিষ্ণুপ্রিয়া ছিল সিতা ত্রেতা যোগেতে/রামলক্ষ্মণ আর সিতা ছিলেন পঞ্চবটি বনেতে

১। মায়ামৃগ মারিছেরে রাম যখন বদিলেন[১]/আর মরণকালে লক্ষ্মণেরে ডাকে রামের স্বরেতে।

২। লক্ষ্মণ দিয়ে যায় রামকুন্ডলি রামের কাছে গেলেনচলি
খক্ষে[২] নিয়ে ভিক্ষার ঝুলি রাবণ এল দ্বারেতে৩

৩। রামের গন্ডী লক্ষ্মণ করে বিক্ষা দিলেন রাবণেরে
তাইতে রাবণ নিল হরে সিতারে সেই লক্ষ্মাতে৪

৪। সেই দুষে৫ বিষ্ণুপ্রিয়ারে মহাপ্রভু গেলেন ছেড়ে
দীনশরৎ বলে বুজতে পারে তার খেল কে জগতে।

১—বধিলেন, ২—কক্ষে, ৩—দ্বারেতে, ৪—লঙ্কাতে, ৫— দোষে

সঙ্গীত সংখ্যা ২২

শিষ্য

স্নেহময়ী শচিনারী জননী তাহার/ও তার বোক১ জরা ধন অন্ধের নয়ন/
ছিল যে কলিজার সার।।

১। গর্ভে তারে কইরে ধরণ২ করেছিলেন প্রতিপালন
নিমাই দিলেন না তার কিসের কারণ এক বিন্দু দুধের ধার

২। নিমাই বলে উচ্চেস্বরে কাদেন রাণী ধুলায় পড়ে
কেন ছেড়ে গেলেন জননীরে একেমন তার বিছার[৩]

৩। দয়া নাই যার মায়ের প্রতি বুঝিনা তার কেমন রিতি
কলির জীব আমরা অতি হীন মতি কত পাপাচার

৪। দীনশরৎ বলে এত করে মায় যারে রাখিতে নারে
বাৎসল্য ভাবের উপরে এমন ভক্তি আছে কার।।

১—বুক, ২—ধারণ, ৩—বিচার

সঙ্গীত সংখ্যা ২৩

গুরু

বিনা দুখে মাকে ছেরে প্রভু নাহি যায়
কসল্যার[১] অতিশাপে[২] কর্ম্মশত ফল পায়

১। ত্রেতা যোগে দশরতে রামকে চাইলেন রাজ্য দিতে।
কৈকেই পাশন্ডী তাতে শ্রীরামকে বনে পাঠায়

২। জানকি লক্ষ্মণের সনে চৌদ্দ বৎসর রইলেন বনে
কসল্যা সুমিত্রা সনে পুত্রশোকে কষ্ট পায়

৩। কৈকেই হলেন শচীরাণী নিমাইচাঁদ রামগুণমনি
যেমন কর্ম্ম করেন যিনি কর্ম্ম মত ফল পায়।।
দীন শরৎ বলে তারে বেধে কেও রাখিতে নারে
ঐ যে টান পড়েছে ভক্তি ডোরে যার জন এলেন ধরায়।।
১— কৌশল্যার, ২— অভিশাপে

সঙ্গীত সংখ্যা ২৪
শিষ্য
আমায় কও শুনিহে গুরুধন কোন পাবে[১] ব্রহ্মা এসে হইলে বামেন।
হরী ভখত হরিদাসের কেন এত বিরম্বন
১। রজগুণে সৃষ্টি হয় আগে ব্রহ্মা পরে বিষ্ণু পরে শিব কয়।।
যার ব্রহ্ম লোকে বসতি হয় মর্তে এলেন কি কারণ।
২। যে বিধি হন জগতের পিতা কাজির পুত্র বলে তারে এ কেমন কথা।
হলেন বিধির বিধি কোন বিধাতা বিধিকে করেন সৃজন।।
৩। যে জন জিবের[২] ভাগে সুখ দুঃখ
লিখে তার কপালে এত দুঃখ লিখিয়াছে
দীন শরৎ বলে কোন বিপাকে ঘটল এমন অঘটন।
১— পাপে, ২—জীবের,
সঙ্গীত সংখ্যা ২৫
গুরু
বিধির বিধি হন যে জন বৃন্দাবনে/ধেনু রাখেন ব্রজের নন্দন
উচ্চিষ্ট[১] ফল কাওয়ায়[২] তারে শ্রীদাম আদি রাখালগণ।।
১। কৃষ্ণ চড়েন রাখালের কাধে রাখাল চড়ে কৃষ্ণের কাধে খেলে আমুদে
দেখে ব্রর্ম্মা[৩] মনের ক্রুধে[৪] গোধেনু করেন হরণ।।
২। অন্তরজ্বামি[৫] ত্রিভঙ্গ কানাই/আপনি সৃজিয়া দিলেন নবলক্ষ গাই।
নিত্য নিত্য কানাই বলাই বাথানে চড়ায় গোধন।।
৩। দেখে ব্রর্ম্মা হইলেন বিশ্বয়[৬] যে ধেনু হরিলেন তিনি সেই ধেনু ব্রর্ম্ম লোকে রয়
অমনি এসে করে বিনয় ধরলেন কৃষ্ণের শ্রীচরণ।।
৪। বলরাম দিলেন অভিসাপ যবন হইয়া ভুঞ্জা গিয়া গু[৭]হরণে পাপ।
দীনশরৎ বলে এই মনস্তাপ পাইলেন ব্রর্ম্মা সে কারণ।।
১—উচ্ছিষ্ট, ২—খাওয়ায়, ৩—ব্রহ্মা, ৪— ক্রোধে, ৪—অন্তর্যামী, ৬—বিষ্ময়,—
৭— গো

সঙ্গীত সংখ্যা ২৬

শিষ্য

একটি পরম তত্ত্ব জানতে চাই। মহাপ্রভুর গুরু কেন ভারতী গোসাই।
যিনি জগৎগুরু কল্পতরু যার উপর কেহ নাই।।
১। সর্বমন্ত্রে হয় যাহার স্থিতি কিবা মন্ত্র তাহার কর্ণে দিলেন ভারতী।
কেন শিষ্য হইয়ে বিশ্বপতি সন্নাসি হইলেন নিমাই।।
২। সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলিতে যোগে যোগে অবতার হইলেন ধরাতে।
কেবা গুরু কোন যোগেতে গুরু মোর বল তাই।।
৩। কত ভক্ত ছিল নদীয়ার কেন গৌরায় নাচে গায় শ্রীরাম আঙ্গিনায়।
দীনশরৎ বলে এই অভিপ্রায় ভক্ত সন্ধান যেন পাই।।

সঙ্গীত সংখ্যা ২৭

গুরু

ভক্তাধিন[১] যে ভগবান নিজে ছুট হইয়া বাড়ায় ভক্তের সম্মান।
গুরু বিনে নাই যে গতি জীবকে দেখায় তার প্রমাণ।।
১। সত্য যোগে[২] সনক ঋষি (অন্যত্র মুনি) যেই ত্রেতা যুগে বিশ্বামিত্র
রামের গুরু সেই।
দ্বাপরেতে গর্গ মুনি কৃষ্ণনাম রাখিয়া যান।।
২। কলিতে কেশব ভারতী শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য নাম দেন মহামতি।
যোগে যোগে[৩] গুরু প্রতি ভক্তি প্রভুর এক সমান।।
৩। শ্রীবাস হইলেন নারদ মুনিবর সত্যভামার দানের কথা খ্যাত চরাচর।
তুলসী পাতায় করে সেই নাম নারদেরে করলেন দান।
৪। দীন শরৎ বলে ভরাধ্য[৪] ধন শ্রীবাসে রাখিয়া ছিলেন করিয়া যতন।
গৌরা এখান হইতে নিয়া সেই ধন জীবকে করেন পবিত্রাণ।।
১---ভক্তাধীন, ২—সত্যযুগে, ৩—যুগেযুগে, ৪—আরাধ্য

সঙ্গীত সংখ্যা ২৮

শিষ্য

আমায় কও শুনিহে দয়াল গোসাই কোন পুন্যেতে মুক্তি হল জগাই আর মাধাই।
মহাজন বলেন সুনি ভক্তি ছাড়া মুক্তি নাই।
১। ব্রাহ্মণকূলে জন্মিয়া ধবায় চুরি হিংসায় করে আর মদ মাংস খায়।
মাতাল হয়ে ঘোরে বেড়ায় মহাপাপি শুনতে পাই।
২। নিতাই গেলে হরিনাম দিতে কান্দার বাড়ি মেরেছিল নিতাইয়ের সাথে।
নিতাই মার খাইয়া কয় বিনয়েতে হরিবল দুইটি ভাই।।
৩। কত পাপি সংসারে আছে গৌর নিতাই যান কেন সে সবের কাছে।

জগাই মাধাই কে হইয়াছে আসল তত্ত্ব জানতে চাই।।

সঙ্গীত সংখ্যা ২৯
গুরু
জগাই মাধাই কলিতে জয় বিজয় ১নামে দ্বারি ছিল স্বর্গেতে
ব্রহ্ম সাপে শত্রুভাবে জন্ম নিল ধরাতে।।
১। হিরণ্যকশিপু সত্ত্বে হয় নরসিংহরূপে বিষ্ণু করিলেন ক্ষয়।
রাবন কুম্ভকর্ণ হয়ে জন্মেছিলেন ত্রেতাতে।।
২। তারা যোখে যোগে জন্ম যে ধরে/শিশুপাল আর দন্তবক্র হইল দ্বাপরেতে।
বিনাশিল কৃষ্ণ যারে সুদর্শন চক্রেতে।।
৩। কলিতে সন্ন্যাসী দু'ভাই শত্রু সংহারিতে আর অন্য অস্ত্র নাই।
নামের অস্ত্র জুরিলেন নিতাই অহিংসা ধনুকেতে।।
৪। নিতাইর মত এমন দয়াল নাই। মাইর খাইয়া উদ্ধাবিল জগাই মাধাই।
—দীনশরৎ বলে এই ভিক্ষা চাই পাই যেন অন্তিমেতে।।
১—উদ্ধারিল।
সঙ্গীত সংখ্যা ৩০
শিষ্য
দেহের তত্ত্ব জানতে আমার মনের আকিঞ্চন
সাড়ে চব্বিশ চন্দ্রের তত্ত্ব কও শুনিহে গুরুধন।।
১। কোথায় আছে রবি শসি১ বল গুরু তাই প্রকাশি।
অমাবস্যা পূর্ণমাসি কোন সময়ে হয় গ্রহণ।।
২। ঐ যে আমার দেহ মাঝে কোন চন্দ্র কোথায় ২বাজে।
কোন চন্দ্র আকাশে আছে কোন চন্দ্র পাতাল ভুবন।।
৩। চারি চন্দ্রের সাধন তত্ত্ব গুরু আমায় বল সত্য।
কোন চন্দ্রে হয় কি মাহাত্ম্য জানতে চাই তার মূল কারণ।
৪। দীন শরৎ বলে গ্রহণ কালে কোন রাহু সেই চন্দ্র গিলে।
কেমন চন্দ্র শাদন করিলে জন্ম মরণ হয় বারণ।।
সঙ্গীত সংখ্যা ৩১
গুরু
দেহের তত্ত্ব জানবে তোর আগে যেয়ে গুরুর চরণ ধর।
পাবিরে তুই নিত্য দেহ চারি চন্দ্র সাধন কর।।
১। সাড়ে চব্বিশ চন্দ্রের তত্ত্ব ঐ হাতে দশ পায়ে
দশ গন্ড স্থলে দুই ।
অধরে ললাটে দুইটি অর্দ্ধচন্দ্র তার উপর।।

২। চারিচন্দ্রে জানবেরে সন্ধান একটি গরল
একটি উন্মাদ কাহিনী পায় বান।
গড়লেতে আছে সুধা জেনে লওরে তার খবর।।
৩। জেনে লও সেই চন্দ্রের পরিচয়। চন্দ্র মন্ডল সূর্য্য মন্ডল সংস্থাতে রয়।
চন্দ্র নিজয় সুধাঝরে খাইলে মানুষ হয় অমর।
৪। দীন শরৎ বলে শমন রাহুতে চন্দ্র সূর্য্য গ্রাস করিতে সেই সময়েতে
হবে দুই গ্রহণ একদিনেতে আধার হবে দেহ ঘর।।

দীন শরতের বাউল সঙ্গীত সরেজমিনে অনুসন্ধানের পর যিনি এই প্রত্ন সম্পদ তুলে দেন সংগ্রাহকের হাতে, তিনি হলেন ত্রিপুরা দুই নং মোহনপুর বিধানসভা কেন্দ্রস্থ কমলবনুড়া গ্রামের দুর্গাচরণ সন্ন্যাসী (দেবনাথ)।

"অদ্বৈতের বারমাসী গান" লোক-উপাদানের সন্ধানে

প্রাক্ কথন ঃ

অদ্বৈতঃ মল্লবর্মণ এমন একজন সাহিত্যিক যিনি " তিতাস একটি নদীর নাম" উপন্যাসের স্রষ্টা হিসাবে পাঠক সমাজে সুপরিচিত । তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ ফসলটি তিনি পুস্তকাকারে প্রত্যক্ষ করে যেতে পারেননি। তার আগেই তার মৃত্যু হয়েছিল। ১৩৬৩ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণে প্রকাশক বলেছেন কাচড়া পড়া যক্ষ্মা হাসপাতালে যাইবার পূর্বে এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তিনি আমাদের দিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার জীবৎকালে আমরা ইহা প্রকাশ করিতে পারি নাই। লেখকের মৃত্যুর পরও কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। বিপুলাকার বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারে একটি মাত্র উপন্যাসের শ্রেষ্ঠত্বের গুণে তিনি সাহিত্যস্রষ্টার পংক্তিতে চিরস্থায়ী আসনে অধিষ্ঠিত হলেন। অদ্বৈত মল্লবর্মণের জীবন ও সাহিত্য গবেষক ড অচিন্ত্য বিশ্বাস অভিযোগ করেছেন," অদ্বৈত যে মানের লেখক, তার বোধ ও মনন এমনই সূক্ষ্ম যে মনে হয়, তিনি আরও মনোযোগ পেতে পারতেন সমালোচক মহলে।" গবেষক-পাঠক অদ্বৈত মল্লবর্মণের বোধ ও মননের প্রতি যত্নশীল হবেন, এটাই ছিল তাঁর বক্তব্য । অদ্বৈত মল্লবর্মণ সম্প্রতি গবেষক-সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, কিন্তু তাঁর রচিত" তিতাস একটি নদীর নাম" উপন্যাসটিই হয়েছে গবেষক সমালোচক পাঠকদের আলোচনা-সমালোচনা-গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু । তাঁর রচিত অন্যান্য উপন্যাস, পত্রধর্মী রচনা ইত্যাদি ততোখানি গুরুত্ব লাভ করতে সক্ষম হয়নি।

সর্বোপরি, অদ্বৈতের রচিত প্রবন্ধগুলি আলোচনার-ক্ষেত্রে উপেক্ষিতই হয়েছে। উপন্যাসটি আলোচনা কালে প্রসঙ্গক্রমে প্রবন্ধগুলির নামোল্লেখ বা যৎসামান্য আলোচনা হলেও ব্যাপক ভাবে গুরুত্ব সহকারে প্রবন্ধ সম্পর্কে কোন সমালোচক-গবেষক উৎসাহ প্রকাশ করেননি।

স্বতঃস্ফূর্ততাই অদ্বৈত মল্লবর্মণের প্রবন্ধগুলির প্রাণভ্রমর । অথবা এভাবেও বলা যায় যে, যে জল-মাটি অদ্বৈতের অবলম্বন, যাকে কেন্দ্র করে অদ্বৈতের সৃষ্টি চেতনায় পুষ্টি ও বিকাশ, সেই জলমাটির মানুষদের সংস্কৃতি তাঁর প্রবন্ধের বিষয় হয়েছে, যা যথার্থই লোকসংস্কৃতির উপকরণ সমৃদ্ধ । অদ্বৈতের বোধিকে স্পর্শ করতে হলে এসব প্রবন্ধগুলোকে গভীর ভাবে অনুধাবনে ব্রতী হতে হবে। অদ্বৈতের নিজস্ব বৃত্তের মানুষ ও তাদের সংস্কৃতি যেহেতু তাঁর নিজেরও, তাই এই জীবনের সঙ্গে তিনি একাত্ম ছিলেন। কিন্তু সে পর্বে শুধু আত্মোপলব্ধির পালা। লোকসংস্কৃতির উপাদান আত্মীকরণের পরও যা সুপ্ত ও অন্তর্লীন ছিল অদ্বৈত চেতনায়, একসময় সুযোগমতো সে সব প্রকাশ লাভ করেছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায়। প্রবন্ধগুলি তাই গভীর ভাবে অনুধ্যান না করলে অদ্বৈত-চেতনার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হওয়া প্রায় দুরূহ কর্ম হবে নিঃসন্দেহে।

অদ্বৈত - জীবনীকার জানিয়েছেন যে গভীর দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে, প্রতিকূল পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করেই অদ্বৈতকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হয়েছিল। জীবনীকার

শান্তনু কায়সার বলেছেন, " অনুমান করতে অসুবিধা নেই মালো জীবনের এক বিরুদ্ধও বৈরী পরিবেশে তাঁর লেখা পড়া শুরু হয়েছিল।" (অদ্বৈত মল্লবর্মণের জীবনী ও সাহিত্য ও অন্যান্য; শান্তনু কায়সার পৃষ্ঠাঃ১১)। এখানে আরও একটি তথ্য হল,"....প্রথম বর্ষের ছাত্র থাকার সময়ই সন্তান প্রেসের মালিক জিতু দত্তের পরামর্শে, ১৯৩৪-এ জীবিকার সন্ধানে তিনি কলকাতায় আসেন। কলকাতার মাসিক 'ত্রিপুরা' পত্রিকায় তিনি শুরু করেন তাঁর কর্মজীবন।" (ঐ, পৃষ্ঠা ১৫)। অর্থাৎ পড়াশোনার পর্ব তাঁর সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি।

'ত্রিপুরা' পত্রিকার সঙ্গে কর্মসূত্রে যুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে অদ্বৈতের লেখালেখি করার দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পায়। কারণ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হবার আগে তাঁর তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ রচনা মুদ্রিত হয়নি। অবশ্য সৃষ্টির তাগিদ তাঁর মধ্যে সক্রিয় ছিল। তাই লক্ষ্য করা যায়, পত্রিকা পরিচালনার জন্য লেখা তৈরী করা, সাংসারিক দায়িত্ব সম্পাদন করা, সর্বোপরি পরবর্তী সৃষ্টির জন্য তাঁর মানসিক প্রস্তুতি চলছিল। এ সবের জন্য তাঁকে প্রচুর শ্রম দান করতে হত। পড়াশোনার জন্যও তিনি প্রচুর সময় ব্যয় করতেন। ১৯৩৫ সালে ক্যাপ্টেন নরেন দত্ত 'নবশক্তি' পত্রিকার সব স্বত্ত্ব ক্রয় করে নেন। এই পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্বে বৃত হন সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র। সহ সম্পাদক হিসাবে যোগদেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ।

অনুমান করতে বাঁধা নেই 'ত্রিপুরা' পত্রিকা থেকেও 'নবশক্তি' পত্রিকা পরিচালনার ক্ষেত্রে শ্রমদান করা বেড়ে যায়। এরপর হঠাৎ 'নবশক্তি' বন্ধ করে যাবার ফলে 'মাসিক মোহম্মদীতে তিনি কাজ শুরু করেন। তার আগে তিনি তিন বছর তিনি নবশক্তিতে কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এখানে এবং অপর পত্রিকায় তিনি কি কি কাজে নিযুক্ত ছিলেন, তার হিসাব প্রদান করা উদ্দেশ্য নয়। তিনি ক্রমশঃ দায়িত্ব বেশী করে পাচ্ছেন, আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন দায়িত্ব যেন ত্রুটিহীন ভাবে সম্পাদন করতে পারেন। নিখুঁত ভাবে দায়িত্ব সম্পাদন করাই তখন তাঁর লক্ষ্য ছিল। এখানে ড. অচিন্ত্য বিশ্বাসের একটি উদ্ধৃতি এরূপ "অদ্বৈত নিযুক্ত হন প্রেমেন্দ্র মিত্রের সরকারী। কার্যত 'নবশক্তি' সাপ্তাহিকের সম্পূর্ণ দায়িত্বই এসে পড়ে অদ্বৈত মল্লবর্মণের উপর। স্বনামে বেনামে প্রচুর লেখার দায়িত্ব, পাতা ভরানোর দার, পত্রিকায় ডাকে আসা লেখাপত্র নির্বাচন, পত্রিকার মুদ্রণের তত্ত্বাবধান এমনকি প্রচারের দায়িত্ব ও বহন করতে হয় তাঁকে।" (অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও তিতাস একটি নদীরনাম ঃ সম্পদক ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস, পৃষ্ঠা ২৩)।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, যা হল, অদ্বৈত স্বনামে যেমন লিখেছেন পত্রিকায় পৃষ্ঠায়, তেমনি বেনামেও বিভিন্ন রচনা মুদ্রিত হয়েছে। দেবী প্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত 'বারমাসী গান ও অন্যান্য' বইতে মুদ্রিত প্রবন্ধের মধ্যে আঠারোটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে 'নবশক্তি' পত্রিকায়। বাকী চারটি প্রবন্ধ দেশও আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তেসরা জানুয়ারী, ১৯৩৬ ইং তারিখে তাঁর প্রথম প্রবন্ধটি মুদ্রিত হয়েছিল 'নবশক্তি' পত্রিকায়। এই পত্রিকায় মুদ্রিত শেষ প্রবন্ধটির সময় হলো ষোল ডিসেম্বর, ১৯৩৮ ইং। তাছাড়া বেনামেও কোন না কোন রচনা এক বা একধিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়ে ছিল হয়তো। বাকী প্রবন্ধগুলি, যা প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলির সংকলন হল 'বারমাসী গান ও অন্যান্য' প্রবন্ধগ্রন্থটি।

ড. অচিন্ত্য বিশ্বাসের একটি মন্তব্য "অদ্বৈত লেখার জন্য অতিরিক্ত কিছু পেয়ে থাকবেন।" (ঐ, পৃষ্ঠা ২৪)। এই মন্তব্যের উপর ভিত্তিকরে বলা যায়, সংবাদবার্তা,সম্পাদকীয় বা বিশেষ নিবন্ধ জাতীয় লেখা পত্রিকার পৃষ্ঠায় বেনামে মুদ্রিত হয়েছিল। অদ্বৈত আত্মীয় পরিজনদের অভাব মেটাবার জন্য দায়বদ্ধ ছিলেন। সেই আত্মীয়রা অদ্বৈতের রোজগারের উপর নির্ভরশীল ছিল। জ্যোতিষ দাশগুপ্ত এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'বিধবা দিদির পরিবার ছোটছোট দুইভাগ্নে সহ সম্পূর্ণভাবে তাঁর উপর নির্ভরশীল ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর একজন ভাগ্নে সাগর বাবুর কাছে আসতেন। ভদ্রলোককে সাগরবাবু কিছু অর্থসাহায্য করতেন বোধ হয়। মানুষটিকে দেখলেই বোঝা যেত অদ্বৈত মল্লবর্মণের পরিবার পরিজনরা ছিলেন অভাবী দুঃস্থ প্রকৃতির।' (শান্তনু কায়সার, পৃষ্ঠা ১০৫)। অদ্বৈত নিজের রোজগার থেকে দুঃস্থ আত্মীয়দের সাহায্য করা ছাড়াও তার উপার্জিত অর্থ অন্যান্য খাতে ব্যয় করতেন। তাব মধ্যে পুস্তক ক্রয় করা তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থব্যয়ের দিক । তাহলে অতিরিক্ত কিছু রচনা করা এবং তার সাপেক্ষে অর্থ রোজগারের তাগিদ তিনি অনুভব করতেন। তাই পত্রিকার পৃষ্ঠায় বেনামে কোন প্রবন্ধ অথবা মূল্যবান কোন রচনা তিনি লিখেছেন এরূপ বক্তব্যের সপক্ষে ভিত্তি দুর্বল। তবে শেষ কথা হল, পরবর্তী গবেষণা এই বিষয়ে আলোকপাত করবে।

চরম ব্যস্ততার মধ্যেও বছরে গড়ে ছয়টি ক্ষেত্রসমীক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ (আলোচনা সহকারে) রূপদান করা সহজ কর্ম নয়। কিন্তু অদ্বৈতের পক্ষে তা অসম্ভব হয়নি। আবার তিনি 'নবশক্তি'র সম্পাদক থাকাকালে লিখেছেন 'রাঙ্গামাটি' নামক উপন্যাসটি। 'নবশক্তি পত্রিকার সম্পাদক থাকাকালে অদ্বৈত একটি উপন্যাস রচনা করেন 'রাঙ্গামাটি'। (অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও তিতাস একটি নদীর নাম, সম্পাদক ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস, পৃষ্ঠা ২৫)। সে সঙ্গে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের পলি সঞ্চিত হচ্ছিল তাঁর মনোভূমিতে। সাহিত্যকে লেখা আকারে জন্মদান করার থেকে ও প্রাক সৃষ্টির যন্ত্রণাকে অন্তরেবহন করা অনেক বেশী যন্ত্রনার । স্রষ্টার অন্তরে সৃষ্টির যে ভ্রূণ জন্ম নেয়, গর্ভধারিনীর মতই তাকে তিনি পরম করুণায় তিলে তিলে বেড়ে উঠার সুযোগ দেন। এ যে কি যন্ত্রণার, শিল্পী মাত্রই তা অনুভব করেন তারপর একসময় সাহিত্যসৃষ্টি ঘটে পাণ্ডুলিপিতে, ছাপার অক্ষরে,। এটাই বক্তব্য যে, প্রবন্ধ জন্মের পাশাপাশি তাঁকে 'তিতাস.... নিয়েও আত্মমগ্ন থাকতে হয়েছে বহুকাল। আবার উপন্যাসের কিছু কিছু উপকরণ ভিন্ন আঙ্গিকে 'নবশক্তি'র পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছে বিষয় সাদৃশ্য রয়েছে দু'টি ক্ষেত্রে, কিন্তু উপস্থাপনার গুণে দুটি বিষয় স্বাতন্ত্র্য পেয়ে ভিন্নখাতে প্রবাহিত হয়েছে।

অদ্বৈত মল্লবর্মণের শৈশব ও কৈশোর কেটেছে পল্লীবাংলায়। গোকর্ণ ঘাটের মালোপাড়ায় তাঁর জন্ম হয়েছিল। এখান কার মানুষেরা অতি সাধারণ জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত ছিল। এক বৃহৎ লোকজীবনবৃত্তের অন্তর্গত তাদের কর্মজীবনও। কর্ম করতে হয় বেঁচে থাকার জন্য, কিন্তু তাঁদের সংস্কৃতি চর্চার যে উপকরণ তা বাংলার লোকসংস্কৃতির উপকরণ । প্রবন্ধে সরাসরি যখন সেগুলো উঠে এসেছে তখন সেগুলো হয়েছে একজন লোকসংস্কৃতিবিদের ক্ষেত্র সমীক্ষা কর্ম। গোকার্ণ ঘাটের মালোপাড়ার মানুষদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে সংস্কৃতি চর্চা তা কখনোই

লোকসংস্কৃতিবৃত্তকে অতিক্রম করেনি। 'বারমাসী গান ও অন্যান্য' প্রবন্ধ গ্রন্থে সংকলিত অধিকাংশ প্রবন্ধ লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহের ভান্ডারে অক্ষয় হয়ে রইল।

অদ্বৈত মল্লবর্মণকে মালোপাড়ার মানুষদের, তিতাস নদীপারে বসবাসকারী মানুষদের সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিবৃত্ত সংগ্রহে উদ্যোগী হতে হয়নি। তাঁর অন্তর্গত সত্তায় তিতাস নদীপারের মানুষদের সংস্কৃতি মিশে গিয়েছিল। তিনি স্বাভাবিক ভাবেই ছিলেন সেই জীবন ও সংস্কৃতির শরীক। তাই লোকসংস্কৃতির উপাদানের সংস্কৃতির উপাদানের সংযুক্তি উপন্যাসেযেমন ও স্বাভাবিক ভাবে হয়েছে আবার একে বিচ্যুত করলে উপন্যাস প্রাণহীন হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে বাংলার লোকসংস্কৃতির যেসব উপকরণ হারিয়ে যেতে বসেছে, তারই সামান্য কিছু সংগ্রহ করে এদের যেমন তিনি রক্ষা করেছেন তেমনি লোকসংস্কৃতির প্রতি তাঁর সচেতনতা ও দায়বদ্ধতা আমাদের বিস্মিত ও মুগ্ধ করেছে।

১ 'বারমাসীগান ও অন্যান্য' প্রসঙ্গ ঃ

'বারমাসীগান ও অন্যান্য' প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তগত প্রবন্ধগুলির শ্রেণী বিন্যাস আবশ্যক। কারণ সবগুলো একই বৈশিষ্ট্য যুক্ত নয়। এ জন্য সারণীর সাহায্য নেয়া যায়।

প্রধান সারণী

ক)	বারমাসী গান	১) ত্রিপুরার একটি বারমাসী গান
		২) দুইটি বারমাসী গান
খ)	উপাখ্যানমূলক সঙ্গীত	৩) পল্লীসঙ্গীতে পালাগান
		৪) শাওলার গান
		৫) বরজের গান
		৬) নাইওরের গান
		৭) পাখীর গান
		৮) উপাখ্যানমূলক সঙ্গীত
গ)	ব্রত পার্বন ও গীত	৯) ভেলেসওয়া গীত
		১০) ভাইফোঁটার গান
		১১) মাঘমণ্ডল
		১২) পীরমলা সঙ্গীত
ঘ)	লোকসঙ্গীত ও ছড়া	১৩) অপ্রকাশিত বাউল সঙ্গীত
		১৪) অপ্রকাশিত পুতুল বিয়ের ছড়া
ঙ)	পেশাশ্রয়ী লোক সম্প্রদায় সম্পৃক্ত প্রবন্ধ	১৫) এদেশের ভিখারী সম্প্রদায়
		১৬) সাগরতীর্থে
চ)	বিবিধ	১৭) অগ্নিতত্ত্ব
		১৮) ছোটদের ছবি আঁকা
		১৯) প্রাচীন চীনা চিত্রকলার রূপও রীতি
		২০) টি. এস. এলিয়ট
		২১) বর্ষার কাব্য
		২২) রোকেয়া জীবনী

(ক) নং থেকে (৬) নং পর্যন্ত তালিকাভুক্ত প্রবন্ধগুলি একাধারে লোকসংস্কৃতির উপকরণে সমৃদ্ধ। ঐ দিক থেকে প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন ভাবে উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে। তেমনি স্বতন্ত্র লোকসংস্কৃতির উপাদান সমৃদ্ধ প্রবন্ধ হিসাবে গুরুত্ব লাভ করেছে।

৬.ক.১।

'ক' নং তালিকাভুক্ত প্রবন্ধগুলি হল "ত্রিপুরার একটি বারমাসী গান" ও "দুইটি বারমাসী গান"। প্রথম প্রবন্ধটির সূচনায় প্রাবন্ধিক অদ্বৈত। বলেছেন, "ত্রিপুরার পল্লীগ্রামগুলিতে প্রধানত লীলার বারমাসী, ফুল্লরার বারমাসী, ভেলুয়ার বারমাসী এবং শান্তি কন্যার বারমাসী গীত গুলি গীত হইতে দেখা যায়।" প্রবন্ধটির নামকরণে 'ত্রিপুরা' স্থান নামটি প্রাবন্ধিক কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে। অধুনা কুমিল্লা জেলা একসময় 'ত্রিপুরা' নামে পরিচিত হত। যদিও ত্রিপুরা বা কুমিল্লা (বাংলাদেশ) জেলার কোন এক অংশ থেকে এই বারমাসী গানটি সংগৃহীত হয়েছে, তথাপি বৃহত্তর লোকজীবনবৃত্তের অন্তর্গত বৃহৎ বঙ্গের জল-হাওয়ার রূপটিই এর মধ্যে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছে। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে বারমাসী গানের ব্যাপকতা আমরা লক্ষ্য করি। লোকসংস্কৃতি বলয়ের মানুষের বর্ষব্যাপী কাল যাপনের তথ্য সমৃদ্ধ বৃত্তান্ত ও উন্নত সংস্কৃতির আধার হল এই বারমাস্যা গুলো। বারমাস্যাগুলো হল মধ্যযুগের মানুষদের শিকারনির্ভর, কৃষিনির্ভর জীবনচর্যার পরিচয় বাহী। তার থেকেও বড় কথা বারমাসীগুলো প্রকৃতি নির্ভর সাহিত্য সৃষ্টি রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। হয়তো মানব সভ্যতার আদিপর্বে নিরক্ষর কৃষিজীবী মানুষের মুখে মুখে এই বার-মাসীগুলির উদ্ভব হয়ে থাকতে পারে। সে সময় প্রকৃতির সঙ্গে মানুষ একাত্মতাবোধ করত। মানুষের ভাবনা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায়। মানুষ প্রথমে প্রকৃতি নিয়েই ভাবতে শিখেছিল। তাই জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে মিশে গিয়ে বার মাস্যার সৃষ্টি করেছে, মধ্যযুগে জীবনের ভাষা প্রকাশের জন্য সুরকেই অবলম্বন করেছিল মানুষ। তাই বারমাস্যাগুলো সেদিন কথা না হয়ে গান হয়ে উঠেছিল।

।। ৬.ক.১ ।

'ত্রিপুরার একটি বারমাসী গান'' শীর্ষক বারমাসীটি একটু ভিন্ন প্রকৃতির। এখানে কোন দেব দেবীর কথা নেই। নেই অর্থনৈতিক জীবনের চিত্র। বরং মানব মানবীর চিরন্তন প্রেম সম্পর্কটি বারমাসের বিভিন্ন পর্যায়ক্রমে কোন পল্লীগায়কের সুরে শৈল্পিক রূপ পেয়েছে। ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, বারমাসী সঙ্গীত বিরহ সঙ্গীতেরই একটি বিশিষ্ট অংশ। পরিবর্তমান প্রাকৃতিক পটভূমিকার উপর বিরহিনী নারীর একটি সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ ইহার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে। কোন কোন পল্লীকবি ইহার মনোবিশ্লেষণের উপর জোর দিয়া থাকেন, কেহ বা প্রকৃতি বর্ণনার উপর জোর দেন — উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া খুব কম কবিই ইহা রচনা করিতে পারিয়াছেন। কালক্রমে ইহা বিরহ সঙ্গীত রচনার একটি গতানুগতিক রীতিতে পর্যবসিত হইয়াছিল মাত্র। লোকসাহিত্যের এই ভিত্তি অবলম্বন করিয়াই মধ্যযুগের বিস্তৃত উচ্চতর সাহিত্যে এই বারমাসীর বর্ণনা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। এই সূত্রেই বারমাসি, রাধার বারমাসি, ফুল্লরার বারমাসি ইত্যাদি রচিত হইয়াছিল। (বাংলার লোকসাহিত্য : আশুতোষ ভট্টাচার্য পৃষ্ঠা ২৬৭)।

পন্ডিতেরা মনে করে থাকেন, লোকজীবনে এক সময় বারমাসী গুলো সঙ্গীত রূপে গাওয়া হতো। এর জন্য যেমন আসর বা মঞ্চ ব্যবহৃত হতো তেমনি গায়কদের মুখে মুখে গীত হতো কোন না কোন সময়। ড. ক্ষেত্রগুপ্ত লোকসংস্কৃতির এসব উপাদানের জনসমষ্টি দ্বারা পরিবেশনের রীতিকে Performing art বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন," শিল্পীরা কখনো শিল্পী, প্রায়ই শিল্পী নয়, হয়তো ভক্তিপথের প্রদর্শক (যেমন, কথক ঠাকুর) কিংবা দেবতার বরপ্রার্থী পুরোহিত (নীলের ভক্তা) আবার রোজা সদৃশ মুশকিল আসান। গল্পবলার পারিবারিক বৈঠকে, মনসামঙ্গল পাঠের ঘরোয়া সমাবেশে শিল্পী তো শিল্পী নয়— নিজেদের একজন হঠাৎ উঠে আসে সেই ভূমিকায় । কোথাও আবার শ্রোতা-দর্শক ও সঙ্গীত পরিবেশনে অংশীদার । পরিচিত বা অপরিচিত আশে পাশের গাঁয়ের সাধারণ মানুষ হয়তো চাষের কাজ করে কিংবা জনমজুরি । শিল্পীরা চারপাশের রহস্য এখানে প্রায়ই নেই এবং জনতা থেকে তার দূরত্ব অল্পই।" (সংযোগের সন্ধানে লোকসংস্কৃতিঃ ড' ক্ষেত্রগুপ্ত, পৃ.৭৯)।

ড' গুপ্তের অন্যএকটি মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন । তিনি মনে করেন, "মানুষের মন সহজে কিভাবে আকৃষ্ট হয় অশিক্ষিত পটুত্বে লোকশিল্পীরা তা জানতেন । গান গাইতে গাইতে একটু নেচে দেওয়া, পালাকীর্তনের রস বিহ্বলতার মধ্যে কিছু গদ্য সংলাপ-গায়কে দোহারে নানা অনুষ্ঠানে চামর দুলিয়ে যেন যাদুর প্রভাব বিস্তার কথকতারসঙ্গে অভিনয়ের মিশেল ।" ড সুকুমার সেন কাব্য থেকে লোকজীবনের বারমাস্যার প্রসার ঘটেছে বলে মনে করেছিলেন। কালিদাসের 'ঋতুসংহার' আলোচনা করতে গিয়ে তিনি অনুরূপ মতামত প্রদান করেন। তৎপরে এই মত থেকে সরে এসে তিনি লোকগীতি থেকেই যে ঋতুসংহারের কল্পনা কবি করেছিলেন, এ সম্পর্কে সংশোধিত মত প্রদান করেছিলেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, শুধু বাংলাভাষায় লোকসাহিত্যে নয়, ভারতীয় বহুভাষার এমনকি ইংরেজী ভাষার বৃহত্তর লোকজীবনে বারমাসী জাতীয় লোকসঙ্গীতের সন্ধান মেলে। এই তথ্য ও ঘটনা আমাদের চমৎকৃত করে । লোকসংস্কৃতির বিশ্বব্যাপী অন্তর্নিহিত সাদৃশ্যের রূপটি এক্ষেত্রেও প্রমাণিত হয়।

মানুষের মন লক্ষ তন্ত্রীতে বাঁধা সতত সুর- উচ্ছল এক আশ্চর্য বাদ্যযন্ত্র বিশেষ । কোন্ তন্ত্রীতে কখন যে কি সুর বেঁজে উঠবে তার হদিশ কে দেবে? গ্রামীণ মানুষের জীবনের ধারা অর্থনৈতিক ক্লিষ্টতায় যতই ন্যুব্জ থাকুক মানুষ নিজস্ব সংস্কৃতি চর্চায় বৈচিত্র্য এনেছে বহুকাল ধরে। লোকসঙ্গীতের বহু ধারার কথা বলেছেন কেউ কেউ । ওপার বাংলার লোকসংস্কৃতিবিদ আব্দুল হাফিজ আটানব্বই শ্রেণীর লোকসঙ্গীতের একটি তালিকা প্রণয়ন করেছেন। সেগুলোর কোন কোনটির উপভাগও রয়েছে। সে তালিকায় তিনি বারমাসী গানকে পঁচানব্বই নম্বরে স্থান দিয়েছেন।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ একটি বারমাসী গান ত্রিপুরা জেলা (অধুনা কুমিল্লা জেলা)-র কোন না কোন স্থান থেকে সংগ্রহ করেছেন। ওপার বাংলার লোকসংস্কৃতিবিদ্ আতোয়ার রহমান অনুরূপ একটি বারমাসী (শান্তির বারোমাসী) চট্টগ্রাম জেলার ধলঘাট অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করেছেন। তিনি বলেছেন " বাংলাদেশের দাক্ষিণ অঞ্চলের একাধিক জেলায় 'শান্তির বারোমাসী"

নামে কতকগুলি গীত প্রচলিত আছে। (।লোকসাহিত্যের কথা: বাংলা একাডেমী. ঢাকা, আনোয়ার রহমান, পৃষ্ঠা ১৭৬) । ডক্টর আশ্‌রাফ সিদ্দিকী লোক সাহিত্য (২য় খন্ড) গ্রন্থে অনুরূপ একটি শান্তির বারমাসীর কথা বলেছেন । তিনি বলেছেন," ১৩৪০ বাংলা মাসে সিলেট জেলার কমলগঞ্জ থানার দরগাহপুর গ্রামের আবদুল গনি গায়কের একটি বারমাসী হল শান্তির বারমাসী। এই বারমাসীটি সিলেট জেলার আঞ্চলিক বাংলায় উদ্ধৃত রয়েছে।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর সমকালে কুমিল্লা জেলার কোন না কোন স্থানে এ বারমাসীটি গীত হতে শুনে থাকবেন। ছয়ঋতু মানুষের মনে বিচিত্র অনুভূতির সঞ্চার করে। বিরহ মিলনের অনুভূতি নায়ক-নায়িকার মানস ভূমিতে আলোড়ন জাগায়। মধ্যযুগের বাংলা বারমাস্যাতে আটমাস, ছয়মাস,চারমাসের দুঃখ-আনন্দ বিরহ-মিলনের সুর ধৃত রয়েছে। তবে বিরহই যেন এর মূল সুর হয়ে উঠেছে অনেক ক্ষেত্রে । করুণ এবং হৃদয় বিদারী ভাষায় নারী হৃদয়ের বেদনারসুর বারমাসীর পংক্তিগুলিতে জীবন্ত, হয়ে উঠেছে। উপরিউক্ত বক্তব্য 'শান্তির বারমাসীর' ক্ষেত্রে যথার্থ । পক্ষান্তরে, পরবর্তী 'দুইটি বারমাসী' শীর্ষক বারমাসী গান দুটিতে রাধা ও সীতার মনোবেদনা স্থান লাভ করেছে। তাদের মনোবেদনা মহাকাব্যের আঙ্গিকের অনুকরণে বা অনুসরণে, ভাবে ও গতিতে ধৃত হয়নি। কিন্তু পল্লীকবিরা 'রাধা ও সীতার কাহিনী শুনে তাদের হৃদয়ের ব্যথা-আনন্দ, বিরহ ভাবনা ও মিলনের রূপ অন্তর-দৃষ্টিতে উপলব্ধি করেছিলেন। অদ্বৈর মল্লবর্মণ বলেছেন," তাহারা গান গায় কাজ করিতে করিতে । গানে যশলাভের স্বপ্ন তাদের মধ্যে খুবই কম । প্রাণের সহজ স্ফূর্তিতে তাহারা আবেগ ভরে গান গুলি গাহিয়া যায়। তাহাদের ঠিক প্রাণের দাবী অনুযায়ী গান রচনা করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই, পল্লীরই অজ্ঞাত, অখ্যাত নাম-হারা করিয়া গ্রাম্য ভাষায় এবং গ্রাম্যসুরে গ্রাম্য বিষয়বস্তু লইয়া গান করিয়া গিয়াছেন।' (বারমাসী গান ও অন্যান্য: পৃষ্ঠা৮) । লোকসংস্কৃতির এটাই গোড়ার কথা। গ্রাম্য কবিদের রচনা সুরে সুরে গীত হয়েছে কিন্তু রচয়িতাদের অস্তিত্ব মুছে গেছে।

অদ্বৈত. বারমাসীগুলির সুর ধর্ম ও বিষয় অনুসারে দুটি ভাগের কথা বলেছেন। তিনি বলেন, কতকগুলি প্রেম সম্বন্ধীয় ও অন্য কয়েকটা ধর্মমূলক।" (পৃষ্ঠা.৯) পক্ষান্তরে ড শিব প্রসাদ ভট্টাচার্য বারমাসী গুলিকে আটটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। সেগুলি যথাক্রমে:

১) আদি ও মৌলিক,
২) মধ্যযুগীয় ও সাহিত্যিক,
৩) আধুনিক,
৪) আখ্যান বা তথ্যমূলক,
৫) ব্যক্তিগত দুঃখ দারিদ্রমূলক,
৬) পূজা বা অর্ঘমূলক,
৭) মিলন মূলক,
৮) বিরহ মূলক বা ভাবাত্মক,

এরূপ বিভাজনের পর উল্লেখ্য বিষয় হল, ড ভট্টাচার্য 'ব্যক্তিগত দুঃখ দারিদ্রমূলক বারমাসী' তালিকায় সীতার বারমাসীকে অন্তর্ভূক্ত করেছেন। আর রাধার বারমাসী ও শান্তির

বারমাসী বিরহ মূলক বা ভাবাত্মক বারমাসীর পর্যায়ভূক্ত । সে যাই হোক, এখানে ড ভট্টাচার্যের একটি মন্তব্য সংযোজন করা যেতে পারে । তিনি বলেন," বারমাসীর সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা যায়, বারমাসী মূলতঃ নারী জীবনাশ্রিত সঙ্গীত । নারী জীবনের আশা-আকাঙ্খা ভাবনা কল্পনাদিই এ গানের মূলসুর ও মর্মবাণী। অন্যান্য লোকগীতির ন্যায় কিছু কিছু নারী পুরুষের সম্মিলিত জীবনের কর্মও ধর্মসঙ্গীত । বারমাসী মুখ্যত বা একান্তই নারী জীবনের ধ্যানও জ্ঞানের সুরভারতী।' (ভারতীয় সাহিত্যে বারমাস্যাঃ ড শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা ৩২) তবে বারমাস্যা যে শুধু নারীদের কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে তা নয় বরং বারমাসী পুরুষ কেন্দ্রিক ও হয়েছে কখনো কখনো।

W G. Archar তাঁর The Blue Greve. uraon Dances গ্রন্থে একটু ভিন্ন সুরে কথা বলেছেন তাঁর মতে "বারমাসীগুলো নারীজীবন আশ্রিত সঙ্গীত হবার কারণ হল, কৃষি নির্ভর সমাজ ও সভ্যতা একান্তই মাতৃতান্ত্রিক । মাতৃতান্ত্রিক সমাজ মাত্রই যেমন নানা যাদু শক্তি বা অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস পরায়ন, এখান কার সমাজ জীবনেও সেই সত্য সমভাবে সক্রিয়। বাংলার মাসে মাসে অনুষ্ঠিত ব্রত-পার্বন এই মাতৃতান্ত্রিক কৃষি নির্ভর সমাজেরপ্রজনন শক্তি ও যাদুশক্তির প্রতি প্রীতি আকর্ষণেরই প্রকৃষ্ট লক্ষণ। বাংলার সেকালের ব্রতচারময় জীবনের বিচিত্র প্রজনন শক্তি ও গুহ্য যাদুশক্তির পূজা-অর্চনা এই অনার্য ওরাঁও সম্প্রদায়ের গীত নৃত্যময় ঋতু উৎসবের প্রতিরূপ বলেই মনে হয়।"

ভাবগত ঐক্য থাকলেও পূর্ববঙ্গ গীতিকা অপেক্ষাও বারমাসীগুলো প্রাচীন বলেমনে করেছেন কোন কোন গবেষক । ড আসরাফ সিদ্দিকী বলেছেন, 'এই বারমাসীগুলি আমাদের গীতিকা গুলিকেও প্রভাবান্বিত করেছে বলে মনে হয়। (লোকসাহিত্যঃ দ্বিতীয় খণ্ড)। তিনি আরো বলেছেন, "এইসব গীতিকা গুলি এ দেশের নিজস্ব সম্পদ বলেই মনে হয়, কারণ ইউরোপীয় সঙ্গীতে মাস হিসাবে নারীর এই রূপ বিরহ বর্ণনার নজির পাওয়া যায়না। অনেক স্থলেই দেখা যায় বারমাসীগুলি গীতিকার বা Terminus antequem আগে বসে।" (লোক-সাহিত্য ১ম খণ্ড, ড' আসরাফ সিদ্দিকী, পৃষ্ঠা ১৮৫) । একটা লক্ষ্যনীয় বিষয় হল সমগ্র বাংলা দেশেই" শস্তির বারমাসী" বিভিন্ন রূপে প্রচলিত ছিল। অসমীয়া সাহিত্যেও বারমাসীর উল্লেখ আছে, সেগুলি বাংলার বারমাসীর কাছাকাছি। অসমীয়া ভাষায় অনুরূপ একটি " শান্তির বারমাসী" প্রচলিত ছিল। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যগুলিতে বারমাসী স্থান পেয়েছে । তার সামান্য উদ্ধৃতি (কবি নাম সহ) এখানে দেয়া যেতে পারে । শ্রী কৃষ্ণ কীর্তনে রয়েছে,

আষাঢ় মাসে নব মেঘ গরজ এ।

মদন কদনে মোর নব মেঘ নয়ন ঝুরয়ে।।

রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণে দু'টি বারমাসী নিম্নরূপ ঃ

(ক) কোন মাসে কোন রাশি।

চৈত্র মাসে মীন রাশি।।

(খ) জতে ধান গোসাঞি সকলি বুনিল।

চাস চসিআ গোসাঞি লাঙ্গল তুলিল।।

ময়মনসিংহ গীতিকায় 'কমলার বারমাসীর'র সূচনা নিম্নরূপঃ

পোষ গেল মাঘ আইল, শীতে কাঁপে বুক।
দুঃখীর পোহায় রাতি আইল বড় দুঃখ ।।
মহুয়ার পালায় 'মহুয়ার বারমাসী' এভাবে শুরু হয়েছে :
মহুয়ার সন্ধানে নদের চাঁদের ভ্রমণ।।
সেই খানে বসিয়া কন্যা করিত রন্দন।
একা বইসা নদীয়ার ঠাকুর জুড়িল কান্দন।।
যেখানে [illegible] হুরার দাগ ছাগল খাইত ঘাস।
এইখানে [illegible] কন্যা ফাল্গুন চইত্রের মাস।।
কঙ্ক ও লীলার বারমাসী গান এরূপ :
দারুণ ফাল্গুন মাসে ফোটে নানান ফুল।
মালঞ্চ ভরিয়া ফুটে মালতী বকুল।।
দেওয়ান ভাবনার বারমাসী গানের সূচনা নিম্নরূপ:
আষাঢ় মাসের নদীর কূলে কূলে পানি।
বাপেরে আনিতে যাইব সাজায় পানসী খানি।।
মলুয়ার বারমাসীর সূচনায় রয়েছে :
মাঘ-ফাল্গুন গেল মলুয়ার ভাবিয়া চিন্তিয়া।
চৈত্র বৈশাখ গেল আশায় বসিয়া।
ভেলুয়া সুন্দরীর বারমাসীতে বারমাসীর শুরু হয়েছে এভাবে---
আইল বৈশাখমাস নতুন বছর।
কইড়ে গেলা সোয়ামী কেন না পাই খবর।।

প্রাসঙ্গিক ভাবে এখানে কয়েকটি বারমাসীর, উল্লেখ করা হল। এমনি আরো অনেক বারমাসী মধ্যযুগে রচিত কাব্যে রয়ে গেছে। অথবা পল্লীবাংলায় এখনো সংগৃহীত হয়নি এমন কোন পালায় রয়েছে যা অবলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ সংগৃহীত ও সংকলিত 'ত্রিপুরার একটি বারমাসী গান' নবশক্তি পত্রিকায় জানুয়ারী ৩, ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়েছিল। বারমাসী গানটি সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনাও সংযোজিত হয়েছে। যা অন্যান্য গান, ব্রত-পার্বণ ইত্যাদির ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হয়নি। অনেক সংগ্রাহক, গবেষক এ ধরণের কাজ করেছেন। তবে অদ্বৈতের কাজে একটি ব্যতিক্রমধর্মীতা লক্ষ্য করা যায়। 'ত্রিপুরার একটি বারমাসী গান সংলাপের আকারে উপস্থাপিত হয়েছে, যেখানে পাত্র পাত্রীর পরিচয় উল্লেখ করা হয়েছে; দ্বিতীয়তঃ অপর সংগ্রাহকেরা 'ধূয়া' বা ধ্রুবপদ কথাটির উল্লেখ করেন না । কিন্তু এখানে অদ্বৈত তা করেছেন। তবে শেষ দিকে চৈত্র মাসের বারমাসী পর্যন্ত তার উল্লেখ থাকলেও এর পর আর 'ধূয়া' কথাটির উল্লেখ করেননি। তৃতীয়তঃ কার্তিক মাস থেকে এই বারমাসীতে বর্ষারম্ভের কথা বলা হয়েছে।

অদ্বৈত যে ভাবে বারমাসীটির আলোচনা করেছেন তার একটা কাঠামো নির্মান করা যায়।

১) বারমাসী গানগুলি পল্লীর নিরক্ষর সমাজের প্রাণস্বরূপ,

২) বারমাসীগানের ভাষায় বেদনার সুর ধ্বনিত হয়,

৩) গানগুলির কবি বা রচয়িতা নাম আবিস্কার করা অসম্ভব,

৪) নিশীথকাল এই গান গীত হবার প্রকৃষ্ট সময়,

৫) প্রবাসী নায়কের উদ্দেশ্য বিরহিনী নায়িকারগীত এটি,

৬) হতভাগিনী নায়িকা বারোমাসের দুঃখ মর্মস্পর্শী ভাষায় প্রকাশ করে,

৭) প্রধানতঃ বিদেশবাসী স্বামীর পত্নীরা এসব গান গায়,

৮) সঙ্গীত কালে তারা ক্রন্দনরত হয়.

৯) একত্রে কর্মরত থাকার সময় একজনস্ত্রীলোক এরূপ বারমাসী গান গায়, অন্যরা তখন শ্রোতা,

১০) পল্লীর নিজস্ব সাহিত্য এই বারমাসীগুলি, এতে পল্লীর নিজস্ব ভাবধারার প্রকাশ ঘটে,

১১) সদাগর পুত্রের সঙ্গে শান্তির বিবাহ, বারোবছরের জন্য স্বামী বিদেশ যাত্রা করেছিল,

১২) বার বাইস তের ডিঙ্গে নিয়ে যাত্রা করেছিল সদাগর পুত্র,

১৩) শান্তির যৌবন প্রকৃতিরসঙ্গে সাদৃশ্য যুক্ত, ছদ্মবেশী স্বামীর মন্তব্য,

১৪) স্বামী কর্তৃক শান্তিকে স্মরণ,

১৫) শান্তির চরিত্রে স্বামীর সন্দেহ ও চরিত্র পরীক্ষা,

১৬) প্রেমপ্রস্তাব প্রদান, প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান,

১৭) পরিচয় প্রদান ও মিলন।

অদ্বৈত বারমাসী সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনা করে সংক্ষেপে বাসমাসীটির বিষয় বস্তু তুলে ধরেছেন । এখানে শান্তির বারমাসীর বিষয় বস্তু ও বিবিধ প্রসঙ্গ আলোচনা করা যেতে পারে ।

মাস	বারমাসীতে বিষয়	বিবিধ প্রসঙ্গ
প্রাক্‌কথন	চৌকিদার হয়ে জলের ঘাটে পাহাড়ার ছলনা করে ছদ্মবেশী স্বামীটি তার স্ত্রী শান্তির সঙ্গে। রাজার নির্মিত ঘাট থেকে শান্তি জলে নেবে, এতে বাধা দেবার কি থাকতে পারে । এরপরই শান্তি- চেনাকে ছদ্মবেশী স্বামী ইঙ্গিত পূর্ণ মন্তব্য করে । এর সংগে মাস আগমন সংক্রান্ত ধ্রুবপদ যুক্ত হয়েছে ।	ছদ্মবেশী স্বামী ও শান্তির কথোপকথনে স্বামীটি চার পংক্তি ও শান্তি দুটি পংক্তির ব্যবহার করেছে। সংগ্রাহক 'ধূয়া' শব্দটি একটি পংক্তির অন্তিমে যুক্ত করেছেন। অর্থাৎ এটি পালার আকারে গীত হবার ইঙ্গিত এখানে লক্ষ্যণীয়।

কার্তিক মাস	ছদ্মবেশী স্বামী নিজেকে শান্তির 'নাগর' বলে পরিচয় দিচ্ছে। কিন্তু শান্তি নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে তার বুদ্ধি মত্তা ও সংযমের সাহায্যে । ছদ্মবেশী স্বামী নিজেকে 'ব্যর্থ' বলে,শান্তিকে কে দোষারূপ করেছে।	পংক্তির ব্যবহার এখানেও আগের মতই। তার মধ্যে ছদ্মবেশী স্বামীর একটি পংক্তি 'ধূয়া' বা ধ্রুবপদ হয়েছে।
অগ্রহায়ণ মাস	ধানে কীট বাসা বাঁধছে। শান্তির দেহে যৌবনাগম লক্ষ্য করে অস্থির হয়েছে ছদ্মবেশী স্বামীটি । কিন্তু শান্তি একে অবহেলা করেছে । তার স্বামী এখন প্রবাসী, যৌবনের মুখে সে ছাই-মাটি দিচ্ছে।	ইঙ্গিত পূর্ণ প্রথম পংক্তির পরই ছদ্মবেশী স্বামী শান্তির প্রতি শ্লীলতাহীন বাক্য প্রয়োগ করেছে। এখানেও স্বামী চারপংক্তি ব্যবহার করেছে। তারমধ্যে দুটি পংক্তি হল 'ধূয়া'।
পৌষ মাস	শীতের সূচনা ঘটছে । ছদ্মবেশী স্বামী শান্তির বাড়িতে অতিথি হতে চাইছে অতিথির প্রতি শান্তি বিরূপ নয়। সে অতিথির জন্য চাল, ডাল, হাড়ি, এমন কি সুবর্ণের থালাও দেবে। এরপরই মাঘ মাস আগমনের প্রাক্-বার্তা ঘোষিত হচ্ছে।	পংক্তির ব্যবহার আগের মতই রয়েছে এখানে। স্বামীর ইঙ্গিত পূর্ণ মন্তব্য শান্তি বুঝতে পারলেও তার কোন উত্তর সে না দিয়ে সে ধৈর্য্য ও সংযমের পরিচয় দিয়ে চলেছে
মাঘ মাস	মাঘ মাসে রাজা পাশা খেলেন। আম গাছের ডালে কোকিল বাসা বাঁধে। ইঙ্গিত পূর্ণ কথা শুনে শান্তি জানায়, যে সে কোকিলের বাসা ভাঙ্গবে। যেখানে তার বনিক স্বামী গেছে সেখানে সে যাবে ছদ্মবেশী স্বামী শান্তির নেতিবাচক উত্তরে জানায় যে এমাসেও সে বিফল মনোরম হয়েছে।	অনুরূপ পংক্তি বিন্যাস স্বামীর উত্তরের সঙ্গে ধ্রুবপদ যুক্ত হয়েছে।
ফাল্গুন মাস	এ মাসে জ্বালা ধরানো প্রখর রৌদ্র তাপ। ছদ্মবেশী স্বামী বলছে যে, রৌদ্রতাপে শান্তির শরীর কালো হয়ে গেছে। শান্তি জানায় কুয়োতে ধাপ থাকলেও জলহীন কুয়ো অর্থহীন । যার পতি বিদেশে তার রূপ মূল্যহীন।	স্তবক বিন্যাস অপরিবর্তিত। ধূয়া' কথাটি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। শান্তির অন্তরে স্বামীর জন্য শূন্যতা ক্রমে ক্রমে তীব্র হচ্ছে।

চৈত্র মাস	চৈত্রমাসে গৃহস্থ বীজ বুনে। শান্তির মনে ইচ্ছা হচ্ছে সে কৌটা ভরা [illegible] তার [illegible] দবে। কিন্তু আর [illegible] প্রবাসীর কাছে [illegible] দিতে চাইবে না।	এখান থেকে শান্তির ব্যবহৃত [illegible] চার এবং স্বামীর দু-পংক্তি হয়েছে। সর্বোপরি 'ধূয়া' শব্দটির উল্লেখ আর এখানে নেই। অবশ্য ধ্রুব-পদ রয়েছে।
বৈশাখ মাস	মাটিতে [illegible] শাক (পাট শাক) জন্মে সবাই [illegible] কিন্তু নারীর শাছে (? [illegible]) তা [illegible] বেঁধে-বেড়ে তা পাতে তুলে নিলেও স্বামী যে প্রবাসী কার সামনে তা তুলে দেবে শান্তি।	চারপংক্তিতে শান্তির উক্তি এবং স্বামীর দু-পংক্তি —তন্মধ্যে স্বামীর উক্তির শেষে ধূয়া যুক্ত রয়েছে বারমাসীর বৈশিষ্ট্যকে মান্য করেঽ।
জ্যৈষ্ঠ মাস	এ মাসে [illegible] ফল আম, কাঁঠাল বিদেশ[illegible] পাকা ফল ঝরে পড়ে কিন্তু যৌবনবতী শান্তির যৌবন আঁচল বেয়ে পড়ে।	শান্তির ব্যবহৃত পংক্তি চৈত্র মাস থেকে চারপংক্তির এবং শেষ পর্যন্ত তা অপরিবর্তীয় থেকেছে শান্তির অ[illegible]দাহ ক্রমশঃ তীব্র আকার ধারণ করছে।
আষাঢ় মাস	আষাঢ় মাসে নদীতে প্লাবন এসেছে। উজান ভাটিতে বণিকের বাণিজ্যতরী ফিরে আসছে। যারা পরে বাণিজ্যে গেছিল, তারাও প্রত্যাবর্তন করছে।	শান্তির অন্তর-বেদনা, স্বামীর প্রতি সুগভীর ভালবাসা শান্তির বক্তব্যে ক্রমে ক্রমে পরিস্ফুট হচ্ছে।
শ্রাবণ মাস	শ্রাবণের ধারা বইছে। ডাহুক-ডুম্বুরার ডাক শুনে শরীর বিষবৎ হল। ডাহুক মারবে, ডুম্বুরা মারবে শান্তিতার পায়ের নীচে ফেলে মারবে তাদের, তার স্বামী যেখানে আছে সেখানেই সে যাবে	বর্ষায় স্বামীর আসঙ্গ কামনা শান্তির মনে তীব্র হয়েছে। স্বামীকেই সে প্রত্যাশা করে। অন্য কোন পুরুষ তার কাঙ্খিত নয়।
ভাদ্র মাস	গাছে গাছে তাল পাকছে। কিন্তু তার স্বামী দেশে নেই। কে তাল খাবে? স্বামী ঘরে থাকলে তাল খেত, পিঠা খেত। নবীন গরুর দুধ খেত। মন্দিরে বসে দুঃখ-সুখের কথা বার্তা বলত শান্তি। (মন্দির শব্দের আদি অর্থ বিশ্রামের স্থান)	পূর্বরূপ পংক্তির ব্যবহার, শান্তির সব কল্পনা স্বামীকে ঘিরেই রচিত হচ্ছে।
আশ্বিন মাস	আশ্বিন মাসে নব দুর্গার পূজা। দেবীর কাছে কেউ মেষ, মহিষ	চার পংক্তিতে শান্তি, ঈশ্বরেব কাচে স্বামীর প্রত্যাবর্তন

	মানত করে, কেউ বা ভেড়া, (অজা), যদি শান্তির স্বামী দেশে ফিরে আসে তবে সে জোড়া পাঠা (বলি) দেবে।	প্রার্থনা করছে। ছদ্মবেশী স্বামী [illegible] সে প্রত্যাখ্যান করছে। এর সঙ্গে ধূয়া যুক্ত রয়েছে। তবে ধ্রুবপদ বা ধূয়ার পরিবর্তন ঘটেছে। কার্তিক মাসে পর্ব শেষের ঘোষণা করা হয়েছে। এখানে 'ধূয়া' কথাটি রয়েছে।
কার্তিক মাস	বর্ষের শেষ মাস এটি । শান্তি পরবর্তী পংক্তিতে ছদ্মবেশী স্বামীর উক্তির প্রতি [illegible] প্র[illegible] করেছে প্রথম দিকে । পরে [illegible] তার ভাবনায় এসেছে যে, [illegible] তার স্বামী। তখন সে [illegible] বসতে বলে পিতা ও মাতাকে ডেকে আনে । শান্তির বৃদ্ধ পিতা-মাতা সোনার বাটায় তেল, ধান, দুর্বা নিয়ে জামাই বরণ করতে গেল। শান্তি মাথার চুল দুভাগ করে পায়ে ধরে স্বামীকে প্রণাম জানায়। স্বামী শান্তি কন্যার পবিত্রতায় খুশী হয়ে বর দেন আকাশের চাঁদের চতুর্দিকে যেমন তারা, শান্তি কন্যা ও যেন তেমন ভাবে অবস্থান করে।	বারমাসীর শেষ পর্যায়ে [illegible]ন মাসের শেষে) ছদ্মবেশী [illegible] কৌতুক সহকারে শান্তি[illegible] কাছে বিদায়-অনুমতি [illegible]ছে। দু-পংক্তির ধ্রুবপদে [illegible] যাই গো আপন দেশ।" শান্তি কন্যা এরপর বুঝতে পেরেছে এ তার স্বামী। তাই সে মাতা পিতার সাক্ষাতে এই বিষয়ে নিশ্চিত হতে চেয়েছে। এখানে কন্যাপণ সংক্রান্ত প্রাচীন প্রথা, লৌকিক আচার, সর্বোপরি পতিভক্তির দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

আতোয়ার রহমান বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলা থেকে শান্তির বারমাসী সংগ্রহটির ভূমিকায় বলেছেন, "শান্তি নামে কোনো গ্রাম্যকন্যার অল্প বয়সে বিয়ে হয় । তার শ্বশুরের নাম ছিল গদাধর, শাশুড়ির লীলাবতী এবং স্বামীর মানিক সদাগর । বিয়ের পর সম্ভবতঃ দীর্ঘকাল শান্তি স্বামীকে ভালভাবে জানবার অবকাশ পায় নি । বাবার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সাগর দীঘিতে একদিন স্নান করার সময় পাটুয়া ঘাটের দীঘির উত্তর দিকের চম্পানাগ শহরের কানাই চৌকিদারের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয় । কানাই শান্তিতে প্রেম নিবেদন করে । কিন্তু শান্তি এতে ক্রুদ্ধ হয় এবং বাবা-মার কাছে গিয়ে স্বামীর কথা জানতে চায় । তার বাবা তখন জামাইয়ের সন্ধানে বেরোন। তাকে অবশ্য বেশী দূর যেতে হয়নি । দীঘির পারেই জামাইয়ের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় এবং সে নাটকীয় ডাকে নিজের পরিচয় দেয় । (লোক সাহিত্যের কথা ডঃ আতোয়ার

রহমান, পৃষ্ঠাঃ ১৭৫-১৭৬) । তিনি আরো বলেন 'এই কাহিনীর সম্ভবতঃ সবটুকু সত্য । আসামের কন্যার বারোমাষ্টীর কাহিনীও অনেকাংশে এমনি । মনে হয় চম্পানাগ ছিল ওই দিকেরই (বাংলা দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের) গ্রাম বা শহর এবং শান্তির বিত্ত প্রতিপত্তিশালী বাবা ছিলেন তার কাছাকাছি নদী তীরের বাসিন্দা । শান্তির চারিত্রিক দৃঢ়তা যে গ্রামবাসী তথা লোক কবি-গায়কদের আকর্ষণের কারণ হবে সন্দেহ নেই। লেখক বলেছেন যে, লীলার বারমাসী বলে পাবনা অঞ্চলেও অনুরূপ বারমাসী রয়েছে ।

তবে অদ্বৈত মল্লবর্মণ সংগৃহীত বারমাসী অপেক্ষা উক্ত বারমাসীতে যৌন আবেদন অনেক বেশি তীব্র । লোভী পুরুষের কামদৃষ্টি থেকে দৃঢ়তার সঙ্গে নিজের সতীত্ব রক্ষা করেছে শান্তি। পল্লীর মানুষদের কাছে শান্তির দৃঢ় মানসিকতা,সংযম কাম-বাসনাকে ইচ্ছাশক্তির দ্বারা বশীভূত করে রাখার শক্তি সতী সাবিত্রীর সতীত্ব বোধের সঙ্গে তুলনীয় হয়ে উঠেছে । রহমান সাহেবের সংগ্রহটিতে রয়েছে --

পোষের মাসের শান্তি এই পুস্প আষাঢ়ে ।
তোর এই যৌবন দেখি খাবে ধরে ।।
খাউক খাউক যৌবন মোর হৃদে বসি ।
তবু না হইব ভিন্ন পুরুষের দাসী ।

অ থবা,

বৈশাখ মাসেতে শান্তি, অতিশয় খরান
আঁচাল বিছাইয়া দেও জুড়াক পরান ।
কমজাত্যা পুরুষ তুই বেশ্যা তোর মা ।
সমুদ্রেতে ঝাপ দেও জুড়াক সব গা ।

এই বারমাসীটি কার্তিক মাস থেকে আরম্ভ হয়েছে । অদ্বৈত সংগৃহীত বারমাসটির সূচনা এরূপ ঃ

জলভর শান্তিকন্যা, জল ভর তুমি ।
যে ঘাটে ভারিবা জল গো চৌকিদার আমি ।

পক্ষান্তরে চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত বারমাসীটির প্রারম্ভ এরূপ ঃ

কার্তিক মাসেতে শান্তি ধান্যে ধরে ক্ষীর ।
তোর এই যৌবন দেখি মনে না লয় স্থির ।।

এখানে তথা সমস্ত বারমাসীটিতে বক্তব্য অনেক ক্ষেত্রেই ত্রিপুরার বারমাসীটির সঙ্গে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ । শ্রাবণমাসে ছদ্মবেশী স্বামী ও বারমাসীটির সঙ্গে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ শ্রাবণমাসে ছদ্মবেশি স্বামীও শান্তির কথোপকথন লক্ষণীয় (আতোয়ারে রহমানের সংগ্রহ থেকে)।

শ্রাবণ মাসেতে শান্তি খালবিলে পানি ।
তোর সাধু মারা গেছে আমি খবর জানি ।।
যদি সাধু মারা যাইত ছিড়িত গন্ধমোতি ।
আউলাইত মাথার লেজ করিতাম মিনতি ।

রামলক্ষ্মন দুই ভাই ভাঙ্গি হইত চুর ।
দিনে দিনে মলিন হইত সিথার সিন্দুর ।

এই পংক্তিগুলোর অনুরূপ ভাব সম্বলিত পংক্তি অদ্বৈতের সংগ্রহে অনুপস্থিত । পক্ষান্তরে ডঃ আসরাফ সিদ্দিকী যে বারমাসীটির কথা বলেছেন, সেখানে ফাল্গুন মাস কেন্দ্রিক বারমাসীটির পংক্তি উদ্ধৃতি দেয়া গেল ।

ডাকিলাম ডুকিলাম দো শাস্তি, উড়িয়া সে পড়ি ।
তোরই সাধু খাইছে কাটা কাঞ্চনপুরের ভাটি ।
যদি সাউদে খাইতোরো কাটা কাঞ্চনপুরের ভাটি
আউলাইতো মাথার চুল ছিড়তো গজমতি ।
রামলক্ষ্মন দুই মুইঠ চুরি ভাঙ্গিয়া হইত চুর ।
খাসিয়া পড়িত আর চরণের নেপুর ।
দিনে দিনে হইত রে মলিন শিবের সিন্দুর ।
তবে সে বুঝিতাম সাধু গেছেন যমপুর ।।

ভাবের দিকে থেকে বারমাসীর এই পংক্তিগুলি আতোয়ার রহমান কর্তৃক সংগৃহীত বারমাসীর পংক্তিগুলির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ । ডক্টর সিদ্দিকী বলেছেন শাস্তির বারমাসী শুধু সিলেটে নয় ---- অন্যান্য অঞ্চলেও প্রচলিত আছে । এই গানটি দক্ষিণ শিলেট মহকুমার কথ্য ভাষায় রচিত ।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ কর্তৃক সংগৃহীত বারমাসীতে স্বামী নিজের পরিচয় দেয়নি । পরিচয় পর্বেও জটিলতা আছে । কিন্তু আতোয়ার রহমানের সংগৃহীত বারমাসী ও ড সিদ্দিকী সংগৃহীত বারমাসীতে পরিচয় পর্ব নিম্নরূপ ঃ

আতোয়ার রহমান সংগৃহীত বারমাসীতে পরিচয় পর্ব ঃ
ধীরে ধীরে চলে বৃদ্ধ জামাই চাইত বুলি ।
এই দীঘির ঘাটে তুই কেন বসে ছিলি ।
কোথাকার বেটা তুই কোথা তোর ঘর ।
শ্বশুরের বাক্যগুলি করিলা উত্তর ।।
মা মোর লীলাবতী বাবা গঙ্গাধর ।
শাস্তি কন্যার স্বামী আমি মানিক সদাগর ।
বুঝিলাম বুঝিলাম শাস্তি বুঝিলাম এইবার ।
টিলিয়া লন্তরে শাস্তি স্বামীরে তোমার ।
কৈ গেলায় গো বিরধ মাই বাপ কি কর বসিয়া ।
করে খাইছিলায় গুয়াপান লওগি চিনিয়া ।

ডঃ সিদ্দিকী সংগৃহীত বারমাসীটিতে পরিচয় পর্ব ঃ
এক হাতে লোটা গামছা আর হাতে তেল ।
সিনানের দোহারে বুড়া জামাই চিনতে গেল ।

কোন পন্থে আইছো রে বাবা কোন পান্থে ঘর ।
কিবা নাম তোর পিতা-মাতা, কিনা নাম তোর ।
উজান পাকে আইছি আমি, ভাটির বাকে ঘর ।
মা আমার ময়নামতী বাপ দণ্ডধর ।।
ভইন আমার কমলারানী ভাই মনোহর ।
এখানে আসিছি আমি মানিক সদাগর ।
চিনিলাম চিনিলাম শান্তি, স্বামী আইছে তোর ।
মাথার কেশ দুই করি নমস্কার কর ।
বারমাসে তের পদ লণ্ডরে গনিয়া ।
এই গীত রচিয়া দিল শ্রীধর বানিয়া ।।

পক্ষান্তরে অদ্বৈত সংগৃহীত বারমাসীতে স্বামী পরিচয় নিম্নরূপ ঃ

কি করগো বৃদ্ধ মা বাপ কি কর বসিয়া ।
কারথে লইছিলে টাকা কড়ি, কারঠাঁই দিছিলা বিয়া ।
সোনার বাটায় ধান্য দুর্বা, রূপার বাটায় তেল ।
ধীরে ধীরে বুড়াচুড় জামাই চাইতে গেল ।
আউলাইয়া মাথায় কেশ দুইভাগ করিয়া ।
প্রণাম জানাইল সতী চরণে ধরিয়া ।।

আসামী ভাষাতেও অনুরূপ একটি বারমাসীর কথা পূর্বে বলা হয়েছে । হেমচন্দ্র গোস্বামীর অসমীয়া সাহিত্যর চানকী" প্রথম খণ্ড (Asamiya Sahityar chaneki, Vol. 1.) তে "কন্যা বারমাহী" শীর্ষক একটি বারোমাসী গান সংকলিত হয়েছে। বাংলা বারমাসীর সঙ্গে এই বারমাসীটির বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনার পার্থক্য আছে । তথাপি শান্তির বারমাসীর । সঙ্গে এই 'কন্যা বারমাহীর একটি অন্তর্নিহিত মিলত রয়েছে । অগ্রহায়ন মাস থেকে এই বারমাসীটির শুরু হয়েছে । কয়েকটি লাইন নিম্নরূপ ঃ--

আঘোনের মাহতে কন্যা সংসারে নবান ধান ।
কতেক খাইতে মধু কতেক পুরান ।
যার সঙ্গে প্রিয় নাই (থাকিম) পরের মুখ চাই ।।
আ বাড়ি লোরা কন্যা সাতসরি হার ।
দুই বাহুত তুলি দিম সোনার ঝম্প টাব ।
কাণ চাই দিম কন্যা হীরার মদন কড়ি ।
ককাল চাই দিস কন্যা হীরার মদন কড়ি ।
ককাল চাই দিম কন্যা কাঞ্চন পাতর সারি ।।
ভরি চাই দিম কন্যা ভরিরে নেপুর ।
কপাল চাই দিম কন্যা সিথার সেন্দুর ।।

অগ্রহায়ন মাসে নতুন ধান পাওয়া হয় । ধানের কোনটা খেতে ভাল, কোনটা আবার মন্দ । প্রিয়া যার সঙ্গে রয়েছে সে ভাত রান্না করে খায়, আর আমার সঙ্গে প্রিয়া নাই, কাজেই

আমি পরের মুখের দিকে তাকাই । বিদেশী পুরুষ বা বনিক বললো, —'কন্যা' তুমি এগিয়ে এসে সাত নুড়ি হার নাও । আমি তোমার বাহুর মাপে দিব সোনার আর কানের মাপে দিব হীরার অলংকার ; কোমরের মাপে দিব কাঞ্চন পাতার শাড়ী. পায়ে দিব নূপুর আর সিঁথিঁতে দিব সিঁদুর ।'

'শাস্তির বারমাসী'র সঙ্গে কন্যার বারমাহীর কোন পংক্তিতে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় এই দিকটি একটি সারনীর সাহায্য নিয়ে তুলে ধরা যেতে পারে ।

সারনী : ২ (দুই)

মাস	কন্যার বারমাহী	মাস	শাস্তির বারমাসী
ফাল্গুন মাস	ফাগুনর মাসতে পাই মনে বরি দুখ, স্বামীর কটিত ভুকা কেনে ভথুরা কুকুর। (অনুবাদ মনে বড় দুখ হয়, স্বামীর বিরহের ক্ষুধায় ক্ষুধিত হয়।)	অগ্র হায়ন মাস	শাস্তি আপন সোয়ামী যার দীঘল পরবাসী। যৈবনের মুখে তার ছাই আর মাটি ।
চৈত্র মাস	চৈতর মাসতে কন্যা চতুর দিশে মন, বিলাওরে বিলাওরে কন্যার নয়ান যৌবন। কি বিলাইবো কি বিলাইবো সাউদর নন্দন, কাঠেরে বান্ধিছো হিয়া নুতোলাইব মন। (অনু: চৈত্র মাসে মন চতুর্দিকে যায়। কন্যা, নিজের যৌবন বিলিয়ে দাও। কি বিলিয়ে দেবো বনিক নন্দন? কাঠ দিয়ে হৃদয় বেঁধেছি—মনচঞ্চল করব না ।)	কার্ত্তিক মাস অগ্রহয়ন মাস	ছ.স্বামী— এই ত কার্ত্তিকমাসে দুইত্যার উঠে চান্দা দেখা দিয়েরাখ শাস্তি নাগরের পরান। স্বামী আঘ্রাণ মাসে ধানে গন্ধে কীট। মাস তোর যৈবন দেখে আমার চিত্ত নহে স্থির ।। শাস্তি আপন সোয়ামী যার দীঘল পরবাসী। যৈবনের মুখে তার ছাই আর মাটি ।।
জ্যৈষ্ঠ মাস	জেঠর মাসতে কন্যা ভরিয়া উঠে ধান, কোন দেশর সাউদর তুমি কিবা তোমার নাম। কোন দেশে থাকা সাউদ কোন দেশে ঘর, কি নাম তোমার মার আবুর কি নাম বাপর। (জ্যৈষ্ঠ মাসে বান আসে । কিন্তু তুমি কে বণিক? তোমার দেশ কোথায়? তোমার মা বাবার নাম কি ?)	পরি-শেষ	আইস আইস ওরে পুরুষ, বইসা থাক তুমি। ঘরে আছে বৃদ্ধ মা বাপ জিজ্ঞাস করি আমি।। কি কর গো বৃদ্ধ মা বাপ, কি কর বসিয়া কার থে লইছিলে টাকা কড়ি, কার ঠাঁই দিছিলা বিয়া।।
আষাঢ়	আষাঢ় মাসেতে কন্যা আহুরুরা রাতি,	জৈষ্ঠ্য	যে-অ সাধু পাছে গেছে সে-অ

মাস	তোমার স্বামী কাটা গৈছে কাঞ্চন পুরুর ভাথি । না যাইছে না যাইছে কাটা আমার টিকর পতি, আউলিল হয় মাথায় ছুলি ছিঙ্গিল হয় বজ্রমুঠি। হাতর দুই মুঠি শাঁখা ভাঙ্গি হল হয় চুর; মোলান পরিল হয় মোর কপালর সিন্দুর। (আষাঢ় মাসে তোমার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। কন্যা বলছে-না, তা কখনো হতে পারেনা। তাই যদি হত, তাহলে আমার হাতে শাখা, সিঁথির সিঁদুর-কিছুই ঠিক জায়গায় থাকতো না।	মাস	আইল আগে। অভাগিনীর প্রাণের সাধু খাইল লঙ্কার বাঘে।।
ভাদ্র মাস (ভাদর মাস)	ভাদর মাসেতে কন্যার মাসর পরিল শেষ , হাসি খেলি বিদায় দিয়া যাঁও নিজ দেশ। তুমি হল ভিন পুরুষ আমি ভিন নারী, বাপর শকতি নাই বিদায় দিতে পারি। (কন্যা, ভাদ্রমাসের শেষ, তুমি হেসে খেলে বিদায় দিয়ে নিজ দেশে চলে যাও। কন্যার উক্তি---তুমি ভিন্ পুরুষ, আমি ভিন্ নারী, কাজেই কেমনে বিদায় দিতে পারি?)	কার্তিক মাস	এই ত কার্তিক মাসে বৎসরের শেষ (ধুয়া) হইস্যা বিদায় দেওগো কন্যা- যাই গো আপন দেশ। শান্তি ভিন্ন দেশের ভিন্ন পুরুষ, আমি ভিন্ন নারী। আমার কিরে শাকতি আছে বিদায় দিতে পারি !!
আশ্বিন মাস (অহ্নিব মাহ)	সোনার বাটায় গুয়া পান জারি ভরা পানী, ধীরে ধীরে আসিল শ্বশুর জোঁরাই বিদ্যামানি। (সোনার বাটায় গুয়া পান ও জারি ভরা জল নিয়ে শ্বশুর জামাই এর কাছে উপস্থিত হল।)	পরি শেষ	সোনার বাঁটায় ধান্যদুর্বা, রূপার বাঁটায় তেল। ধীরে ধীরে বুড়াবুড়ি জামাই চাইতে গেল।

একটি সারণীর সাহায্যে আলোচ্য চারটি বারমাসীর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা গেল।

সংগ্রহক	অদ্বৈত মল্লবর্মণ	আতোয়ার রহমান	আসরাফ সিদ্দিকী	হেমচন্দ্র গোস্বামী
প্রাপ্তিস্থান	ত্রিপুরা(অধুনা কুমিল্লা)	চট্টগ্রাম (বাংলাদেশ)	শ্রীহট্ট (বাংলাদেশ)	আসাম
ধ্রুবপদ	নবরঙ্গ ছুরত লইয়া সামনে....মাসে।।	নবরঙ্গ সুরতি লাগে সামনে ......মাস।।	নবরঙ্গ ছুরত লইয়া ছামনে......মাস।	নেই
বারমাসীর প্রারম্ভ-মাস	এই তো কার্তিক মাসে । দুইত্যার উঠে চান্দ্	কার্তিক মাসেতে শান্তি ধান্যে ধরে ক্ষীর।	এই তো পোষরে মাস দ্বীতিয়ার উঠে চান্।	আঘোনর মাহতে কন্যা সংসারে নবান ধান।
আঞ্চলিকতার প্রভাব	শুদ্ধবাংলা ঘেঁষা হলেও আঞ্চলিক শব্দ স্থান লাভ করেছে। যেমন— দুইত্যার (দ্বিতীযার) বাইন্যায় (বনিকে), আঙ্গে (অঙ্গে,শরীরে) হাইস্যা (হেসে), কারথে (কার কাছে) প্রভৃতি শব্দগুলি।	চট্টগ্রামের কিছু স্থানীয় শব্দ ও স্থান নাম, যেমন— ঘাটুয়া, বোদর (স্রষ্টা), যাপন মাদার ঘাট প্রভৃতির ব্যবহার রয়েছে।	শিলেট বা শ্রীহট্ট জেলার কথ্য বাংলায় রচিত হয়েছে এই বারমাসীটি।	এই বারমাসীটি সম্পূর্ণ ভাবে আসামের ভাষায় রচিত হয়েছে। অবশ্য ভাবাগত বৈশিষ্টের জন্য বাংলো ভাষীদের নিকট এই বারমাসীটি সহজবোধ্য।
সমাপ্তি	আইস আইস শান্তিকন্যা তোরে দেই গো বর। আশমানের চন্দ্র যেমন বেড়িল তারাগন	বুঝিলাম বুঝিলাম শান্তি বুঝিলাম এইবার । চিনিয়া লওগো শান্তি স্বামীরে তোমার।	বারমাসের তের পদ লওরে গনিয়া। এই গীত রচিয়া দিল শ্রীধর বানিয়া। শ্রীধর বানিয়া নাম ধরমধর তার বাপ। যেবা শুনে যেবা গায় খন্ডেতার পাপ।।	বারমাসর তের গীত লওরে গনিয়া, ইতো গীত গাইছে কোন জয়ধন বনিয়া। জয়ধন শ্রীধরর বাপ গাওঁ তার মুকুতি হোরে শুনার খন্ডে পাপ।

লোক সাহিত্যের উপকরণের চত্রামনশীলতা একটি স্বাভাবিক নিয়ম । যে কারণে বৃহৎবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে একই উপাদান বা কাহিনী অনু পরিভ্রমন রত থেকেছে । এর জন্য বিবিধ মাধ্যমে সক্রিয় ছিল । কাহিনীরূপ ভিন্ন রূপ লাভ করলেও কাহিনীর প্রত্ন উপাদান একই থেকেছে । শান্তির সতীত্বের পরীক্ষাই এখানে মূল প্রতিপাদ্য । সতীত্বের বিভিন্ন পরীক্ষার আন্তর্জাতিক মোট ও হল H- 400 (এইচ-চারশ)।

।। ৩. ক. ২ ।।

অদ্বৈত মল্লবর্মণের প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থটিতে দুইটি বারমাসী গান শীর্ষক প্রবন্ধে রাধার বারমাসী ও সীতার বারমাসী নামে আরও দুটি বারমাসী গান স্থান লাভ করেছে । লোকজীবনে কৃষ্ণকথা ও রামকথা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল । কৃষ্ণ এবং রাম দুটি চরিত্রই পৌরানিক।

এখানে কৃষ্ণ নয় বরং রাধা চরিত্র নিয়ে বারমাসী রচিত হয়েছে । মধ্যযুগে রাধা বাঙ্গালী মানসে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল । বৈষ্ণব কবিরা যতখানি না কৃষ্ণকে, তার থেকে অনেক বেশি করে রাধাকে স্থান দিয়েছেন তাঁদের কবিতায় । রাধার অন্তরে তথা আত্মায় কৃষ্ণপ্রেমের গভীরতা বৈষ্ণব কবিদের প্রভাবিত করেছিল । কবিরাও তাঁদের লেখনীর সাহায্যে রাধার অন্তরের আকুলতাকে অতলান্ত গভীরতা দান করেছে । রাধার মনের দুর্জ্ঞেয়তা আবিষ্কারে বৈষ্ণব কবিরা বহুকাল ব্যয় করেছেন । ফলতঃ সে দুর্জ্ঞেয়তার রহস্য উদ্ধার করার বদলে তা আরো সুগভীরতা প্রাপ্ত হয়ে বৈচিত্র্যময়তা লাভ করেছে । আদিরসের গণ্ডীকে অতিক্রম অতিক্রম করে রাধা কৃষ্ণের প্রেমলীলা আধ্যাত্মিক মর্যাদায় মণ্ডিত হয়েছে । তার ব্যাপ্তি শুধুমাত্র মানসিকভাবে প্রস্তুত জনসমষ্টি নয়, বরং বৃহৎ জনমণ্ডলী তথা লোকবলয়ের বৃহৎ আঙ্গিনায় আছড়ে পড়েছিল । নিরক্ষর গ্রাম্য মানুষদের তথা লোকসংস্কৃতির জগতের মানুষদের অন্তর রাধা কৃষ্ণের চিরন্তন প্রেমবাণী মথিত করেছিল । তা না হলে রাধা কৃষ্ণের হৃদয়প্লাবনী প্রেমভাবনা এমন বিস্তৃতি লাভ করতে পারত না ।

হয়তো বা বৈষ্ণব কবিতার তত্ত্ব-ভাবনা সমৃদ্ধ উচ্চমানের কবিতার রস গ্রহণের ক্ষেত্রে অসুবিধার কথা কোন কোন কবিদের ভাবনার জগৎ দখল করেছিল । আবার জনপ্রিয়তার প্রয়োজনীয় চাহিদাও কবিদের অধিক ও বৈচিত্র্যময় কবিতা রচনার জন্য উদ্বুদ্ধ করে থাকবে। যার জন্য কবিতা রচনায় বৈচিত্র্য এসেছে, নতুন নতুন ধারায় কবিতা রচিত হয়েছে, তবে ভাষায় পার্থক্য এসেছে । যা আরো বেশি করে লোকজীবনকে অবলম্বন করেছে । যার ফলে রাধা ঈশ্বরের আসন ছেড়ে গৃহস্তের অঙ্গনে, লোককবির ভাষার, বাউল কবিয়ালের গানের সুরে জীবন্ত হয়ে উঠেছে । এর ফলে রাধার মর্জিত প্রেম ভাবনার, সূক্ষ্ম ও সংবেদনশীল প্রেম আর্তিতে সহজবোধ্যতা এসেছে, সর্বোপরি বৃহত্তর জনমণ্ডলীর নৈকট্য লাভ করেছে।

প্রাসঙ্গিক ভাবেই রাধাতত্ত্ব সম্পর্কে এখানে দু-চার কথা বলা আবশ্যক। কোন দার্শনিকতা বা তত্ত্ব কথা থেকে রাধার উদ্ভব ঘটেনি, সাহিত্যকে আশ্রয় করেই রাধার আবির্ভাব । কবি ভট্ট নারায়নের বেনীসংহার' নাটকে রাধার উল্লেখ রয়েছে । এখানে অশ্রু সিক্ত রাধাকে কৃষ্ণ অনুনয় করছেন । কবি ভট্টনারায়ন খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্বেকার কবি । আনন্দ বর্ধনের ধ্বন্যালোকে ও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ রয়েছে । এটি দশম শতকে রচিত হয়েছিল।এ ছাড়া সদুক্তি কর্নামৃত, বিল্বমঙ্গল ঠাকুর রচিত কৃষ্ণকর্নামৃততে রাধিকার উল্লেখ রয়েছে। তবে জয়দেব গোস্বামীর গীত গোবিন্দ তে প্রথম রাধাকে গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হল । অধ্যাপক শশীভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন, "যদি রাধা কৃষ্ণ বিষয়ক প্রাচীন কবিতাগুলি এবং সমসাময়িক ভারতবর্ষের কবিগন কর্তৃক রচিত সাধারণ পার্থিব প্রেম কবিতাগুলি আলোচনা করি তবে আমরা দেখিতে পাই, প্রাচীন বৈষ্ণব প্রেম কবিতায় ধর্মের প্রেরণা একান্তই গৌন ছিল, কাব্য প্রেরনাই সেখানে আসল কথা । রাধাকৃষ্ণ বিষয়কে প্রেম-কবিতায় আমরা প্রাচীন যত কবির উল্লেখ পাইতেছি তাহারা বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া রাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধে বৈষ্ণব কবিতা রচনা করিয়াছিলেন এরূপ কোন সিদ্ধান্তে পৌছিবার মত কোন তথ্যই আমরা লাভ করিনা, বরঞ্চ দেখিতে পাই, তাহারা কবি ছিলেন, নর নারীর প্রেম সম্বন্ধে তাহারা বিবিধ কবিতা রচনা

করিয়াছেন, সেই একই দৃষ্টি —একই প্রেরণা অবলম্বন করিয়াই তাঁহারা রাধা কৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া কবিতা লিখিয়াছেন ।

ড° ক্ষেত্র গুপ্ত বলেন, "বাঙ্গালী জাতির দুজন নিজস্ব দেবী আছে । রাধা ও কালী । বৈষ্ণবরা রাধার দেবত্ব মেনেছিলেন অনেক পরে চৈতন্য উত্তরকালে । কৃষ্ণ ভগবান, ভগবানের অবতার, কিন্তু প্রেমিকা রাধা নেহাৎই মর্ত্ত্যমানবী । অদ্বৈত নিত্যানন্দ গৌরপূজার প্রচলন করেছিলেন কিন্তু রাধাপূজার নয় । ...... রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তির পূজা বাঙ্গলার প্রভাবে গত শ'খানেক বছরের মধ্যে ঘটেছে ।" যাই হোব, চৈতন্যদবের সুবাদে গৌড়ীয়, বৈষ্ণবধর্ম তথা প্রেমধর্মের প্রসারলাভ ঘটেছে । চৈতন্য পূর্ববর্তীকালে বৈষ্ণব কবিতা রচিত হলেও রাধাভাবে ভাবিত শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণের জন্য আর্তি ও ব্যাকুলতা বৈষ্ণব পদকর্তাদের পদরচনায় বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল ।

লোকসংস্কৃতিবিদ্ অধ্যাপক ডঃ বরুণ চক্রবর্তী মনে করেন, "গতানুগতিক ধারায় প্রকাশিত লৌকিক প্রেমসঙ্গীতে কিছুটা অভিনবত্ব তথা বৈচিত্র্য সম্পাদনের তাগিদেও অনেকসময় রাধাকৃষ্ণের অনুসঙ্গ এসেছে । আবার অনুমিত হয়, আঞ্চলিকভাবে রচিত লোকসঙ্গীতে স্থানীয় নারীপুরুষের প্রেমের প্রসঙ্গটিকে গোপনীয়তা দানের উদ্দেশ্যও রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়ে থাকবে ।' ....' কৃষ্ণকে পরমাত্মা এবং শ্রীরাধাকে জীবাত্মার প্রতিভূ বলে মেনে নেওয়ার মত উন্নত ও গভীর মানসিকতা তাদের কাছে আশা করা অন্যায় হবে । ....এখানে প্রশ্ন হল লোকসম্পদ কৃষক-ধারার বিষয়ে নানাবিধ তথ্যাদি অবগত হল কিরূপে ? পুরান অথবা শাস্ত্র গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে যে তারা সরাসরি এই তথ্য সংগ্রহ করেনি তা বলাই বাহুল্য। কৃষ্ণযাত্রা, পাঁচালি কথকতা, ভাগবত পাঠ ইত্যাদি শুনে ও দেখে লোকসমাজ রাধাকৃষ্ণের নানা লীলা সম্পর্কে অবহিত হয়েছে । তারপর সে সবের মধ্য থেকে নিজেদের পছন্দমত ঘটনাগুলিকে তারা সঙ্গীতে প্রকাশ করেছে ।

বাঙ্গালী সাহিত্য প্রাচীন ও মধ্যযুগে সুরকে আশ্রয় করেই এগিয়েছে । সুতরাং সুরকে অবলম্বন করে ধর্মশ্রয়ী বা ধর্মাশ্রয়ী নয় এমন গান রচিত হয়েছে । গানের ভাব ভাষায় বৈচিত্র্য ছিল । যেগুলি অপর বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতেও কবিদের ভাষায় ও সুরে জীবন্ত হয়ে উঠেছে । এদের কাব্যগানে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণিত হয়েছে । কখনো কখনো এদের ভাবনা গভীরতর কোনো স্তরে পৌঁছে গেছে । ভাবকে অবলম্বন করে সুরের সোপান বেয়ে রাধার অন্তর্বেদনা শৈল্পিক রূপ পেয়েছে। মধ্যযুগে গান এত বৈচিত্র্যমণ্ডিত ছিল যে গবেষকরা সেসবের শ্রেণীবিভাজন করেছেন, সেখানে এই গানের বৈচিত্র্য অনুসারে সুদীর্ঘ তালিকা প্রনীত হয়েছে । বারমাসী গান গানের বৈচিত্র্যময়তায় ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করেছে । 'রাধার বারমাসী' তার ব্যতিক্রম নয় অবশ্যই ।

প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ্ ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী রাধার বারমাসীর কথা বলেছেন । আবার ডঃ আতোয়ার রহমান ও অনুরূপ বারামাসীর উল্লেখ করেছেন । ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য ভাগবত থেকে "রাধিকার বারমাসীটিকে ধর্মমূলক বারমাসীর পর্যায়ভুক্ত করেছেন । তিনি বলেছেন, ..."রাধার দুঃখের শেষ নাই । এমন ঘরে পরে জ্বালা গ্রাম্য রাধার মত বুঝি

আর কাহাকেও পোহাইতে হয় নাই । তিনি বারমাসীটির বিষয়বস্তু সম্পর্থে যে আভাস দিয়েছেন, তাঁর বক্তব্যে সেটি এরূপ ঃ "অতিমাত্রায় প্রেমের যাহা অবশ্যম্ভাবী পরিনাম তাহাই হইল । কৃষ্ণ গোকুল অন্ধকার করিয়া রাধার প্রাণ শূন্য করিয়া মথুরায় চলিয়া গেলেন । একদিন অক্রুর আসিয়া নিতান্ত নির্দয়ের মত রাধার প্রাণ হইতে যেন ছিনাইয়া কৃষ্ণকে লইয়া গেলেন/ কৃষ্ণ বিচ্ছেদে উন্মাদিনীবৎ হইয়া রাধা বারটি মাসের বার রকমের দুঃখের কাহিনী এই বারমাসী গানটিতে বিনাইয়া বিনাইয়া গাহিয়াছেন ।" অদ্বৈত মনে করেন, কোথাও কোথাও বারমাসীটির ভাষা সহজবোধ্যতাকে অতিক্রম করে উঁচু মানের হয়ে গেছে । "এই রাধার বারমাসী' গানটির ভাষা স্থানে স্থানে একটু উঁচু রকমের হইয়া যাওয়ায় ভাবের এবং সরলতার অমর্যাদা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় ।'

অদ্বৈত মল্লবর্মণ বলেছেন যে, বারমাসীটির রচয়িতার নাম পাওয়ার যায় না । এ বারমাসীটি তিনি গীত হতে লক্ষ্য করেছেন । পল্লীর মহিলারা কৃষ্ণের জন্মদিনে বিভিন্ন পরব উপলক্ষে সমবেত ভাবে নিজেদের উঠানে বা কৃষ্ণমন্দিরে গেয়ে থাকেন । এখানে বারমাসীটি একটি আধ্যাত্মিক মর্যাদা লাভ করেছে । ধর্মপ্রাণা পল্লীরমনীদের কেউ কেউ এই বারমাসীটি "কৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামের মত কণ্ঠস্থ করে রেখেছে । সংগ্রাহক অদ্বৈত যে একজন সংগ্রাহক মাত্র নন, পল্লীর মানুষদের সঙ্গে একাত্ম ছিলেন, তাঁর মতামত অনুধাবন করলে তা স্পষ্ট হয়ে উঠে ।

বারমাসীটির বিষয় বিন্যাস নিম্নরূপ ঃ

মাস	বারমাসীতে বিষয়	বিবিধ প্রসঙ্গ
কার্তিক মাস	রাইকে সম্বোধন করে রাধা বলছেন যে, কার্তিক মাসে বাঁশির সুরে তার চিত্ত চমকিত হয়। প্রাণ দগ্ধহয় তার। কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত হয়ে রাধার কলঙ্ক সীমাহীন হল। তারপদ ধ্রুবপদ যুক্ত হয়েছে।	প্রথমে ধ্রুবপদ রয়েছে চার পংক্তির, অক্রুর নিদারুণ হয়ে রাধার নিকট থেকে কৃষ্ণকে হরণ করে নিল। কার্তিক মাসের শুরুতে ও শেষে ধ্রুবপদ একই রকম কিন্তু এর পর ধ্রুবপদের সংগে আরো একটি পংক্তি যুক্ত হয়েছে, যা ধ্রুবপদের প্রথমেই বসেছে।
অগ্রহায়ণ মাস	অগ্রহায়ণ মাসে রাধা বন্ধুহারা হয়েছেন বলে রাইকে বলছেন। রাধা নিজেকে অভাগিনী বলে মনে করছেন। পথের দিকে তাকিয়ে তার অশ্রু ঝরছে। পৌষের তিন দিনও চলে গেছে। কৃষ্ণ কবে আসবেন।	ধ্রুবপদের আগে যুক্ত পদটি হস্র 'কৃষ্ণপ্রেমে মইলাম ওগো রাই'। তারপর যথারিতি অন্যান্য পংক্তি যুক্ত হয়েছে।

পৌষ মাস	গাছের ডালে পৌষ মাসে ফুল ফুটেছে। বনফুলের মালা গেঁথে কার গলায দেবে সে। মাটির বিছানা মাটিতেই পড়ে রইল। মালা বাসি হয়ে গেল। প্রাণের কৃষ্ণ অজ বিদেশী হয়ে গেল।	প্রকৃতির সঙ্গে সাদৃশ্য রক্ষা করে রাধার কৃষ্ণ বিরহ ক্রমে ক্রমে গভীরতায় গমন করছে।
মাঘ মাস	ভূমি-একাদশী মাঘমাসে পালিত হয়। রাধা গঙ্গা-ভাগিরথীতে স্নানের জন্য যায়। নিষ্ঠুর কালিনীর জল রাধা আর দেখতে রাজী নয়। যেখানে তার প্রাণের কৃষ্ণ গেছেন, সেখানেই তিনি যাবেন।	রাধার স্নান, কালিন্দীর জল প্রভৃতি প্রসঙ্গ এনে একে ধর্মীয় রূপ প্রদানের দিকটি এখানে পরিলক্ষিত হয়।
ফাল্গুন মাস	ফাল্গুন মাসে দোল হয়। গোকুলে কৃষ্ণনেই—দোল কি করে পালিত হবে। আবির কুমকুম সব মাটিতে ফেলে চোখের জলে মাটি লেপন করবে রাধা।	কৃষ্ণ সম্পর্কিত অনুষ্ঠানের সঙ্গে সাদৃশ্য তৈরীর চেষ্টা এখানে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু একে অতিক্রম করে রাধার মনোবেদনা গাঢ়তর হয়ে উঠে ।
চৈত্রমাস	চাতক পাখী চৈত্র মাসে বাসায় বসে থাকে। কৃষ্ণ নাম জপ করতে করতেচোখ ভিজে উঠে । পাপিষ্ঠ চাতক পাখি যেন না ডাকে নিষ্ঠুর কৃষ্ণের নাম সে কানে শুনবেনা।	এখানে কৃষ্ণ-রাধা মর্ত্যের মানব-মানবী। ঐশ্বরিকতা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ।
বৈশাখ মাস	রাধাকে একাকিনী ফেলে গেছে কৃষ্ণ। কোথাও হয়তো কোন সঙ্গিনীর সন্ধান পেয়েছে সে। দুচোখের জল চোখেতেই শুকিয়ে যাক। গুণবান কৃষ্ণ তার জন্য কি রেখেছে যে তাকে দেখতে যাবে।	রাধা এখানে অভিমান প্রকাশ করেছে। কৃষ্ণের প্রতিই তার সব অভিমান পুঞ্জীভূত হয়েছে।
মাস	জ্যৈষ্ঠ মাসে শরীর অসুস্থ হয়েছে। রাধার প্রাণ কত দুঃখসইবে। দয়া করে তারা যেন কৃষ্ণের পদচ্ছায়া দর্শন করায় তাকে।	কৃষ্ণের প্রতি এখন অভিমানের বদলে রাধার আকুতি তীব্র হচ্ছে।
আষাঢ় মাস	রথের সংবাদ নেবার জন্য কৃষ্ণ আসবে এমন আশা ছিল। কপালের কি দুঃখ লিখন, কৃষ্ণ গুণনিধিকে রাধা জীবিত থাকতে আর পাবেনা।	রাধা কৃষ্ণের জন্য এত ব্যাকুলা যে জীবিত কালে তাকে পারে না এমন শঙ্কাই তার বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে।

শ্রাবণ মাস	শ্রাবণ মাসে বর্ষণ হচ্ছে। কৃষ্ণতো সাঁতার জানেনা। সে আসবে কি করে। ফলহীন কদম্ব ফুল তুলে আনবে রাধা যত্ন সহকারে । এফুল দেখলে কৃষ্ণকেই মনে পড়বে।	বৈষ্ণব কবিদের ভাবনা বারমাসীতে প্রভাব বিস্তার করেছে। ধর্মীয় বাতাবরণ আগ করে বারমাসীটি প্রেম ভাবনা ও হৃদয় বেদনাকে তীব্র রূপ দিয়েছে।
ভাদ্র মাস	ভাদ্র মাসে রাধা স্বপ্ন দেখেছে, মনে হচ্ছে যেন নারায়ণ এসেছে। মাস ব্যাপী ভেবে চিন্তে কাটল রাধার । মাটি ভাসেও না তল ও হয় না। বি করে আসবে কৃষ্ণ।	স্বপ্নের মধ্যে আশা আকাঙ্খা পুরণের বাসনা প্রকাশিত হয়েছে মাত্র।
আশ্বিন মাস	আশ্বিন মাসে উদ্ধব দেশে এল। ডাক দিয়ে রাধা কৃষ্ণের খবর জানতে চায়। (কৃষ্ণ ভাবে ভাবিত হয়ে রাধা তখন প্রকৃত পক্ষে স্বপ্ন মগ্ন) রাধার প্রাণ প্রতিমা কৃষ্ণ কেমন আছে-তারই বর্ণনা শুনতে চায় উদ্ধব ঠাকুরের কাছে।	ধ্রুবপদের বদল ঘটেছে। নতুন দুটি পংক্তি, তোমরা যদি করগো দয়া, দেহ মোরপদ ছায়া সইগো দারুণ অক্রুর মসনে।' তার পর অন্যান্য পংক্তি যুক্ত হয়েছে ও বারমাসীটি সমাপ্ত হয়েছে।

অনুরূপ রাধার বারমাসী বিভিন্ন সময়ে বাংলার বিভিন্ন লোকগায়কদের দ্বারা গীত হয়েছে । লোককবিদের গানকে পরবর্তীকালে কবিরা তাদের কাব্যে স্থান দিয়েছেন । ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টচার্য তাঁর গবেষণা গ্রন্থে চারটি বাধার বারমাসীর উল্লেখ করেছেন । তিনি পর্ববিভাজনে এদের মধ্যযুগীয় বা সাহিত্যিক বারমাস্যা বলেছেন । প্রথমটিকে স্পষ্টতঃ রাধার বারমাসী বলে উল্লেখ করলেও অন্যান্যগুলি শুধুমাত্র বারমাসী শিরোনামে চিহ্নিত করেছেন । কবিরা হলেন যথাক্রমে লোচন দাস, গোবিন্দ দাস (১৬শ শতাব্দী), গোবিন্দ চক্রবর্তী (১৬শ শতাব্দী), বলরাম দাস (১৬-১৭ শতাব্দী)। এরা সবাই বৈষ্ণব পদকর্তা । তাঁদের রচিত বারমাসীগুলি একমাত্র লোচন দাস ভিন্ন সবাই ব্রজবুলি ভাষায় রচনা করেছেন । এগুলি বৈষ্ণব কবিতার বিপুল ভাণ্ডারে নতুনত্ব এনেছে ।

আতোয়ার রহমান রচিত গ্রন্থে একটি রাধার বারমাসীর উল্লেখ রয়েছে । তিনি এ বারমাসীটিও চট্টগ্রাম থেকে সংগ্রহ করেছেন । লক্ষ্যনীয় বিষয় হল এই বারমাসীটি তুলনায় আকৃতিগত দিক দিয়ে ক্ষুদ্র । তাছাড়া দুটির বিষয় বস্তুর মধ্যেও মিল নেই । এই বারমাসীটি শুরু হয়েছে এইভাবে

জয় জয় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নিত্যানন্দ ।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধা গোবিন্দ ।।

এখানে কোন ধূয়া বা ধ্রুবপদ ঘুরে ফিরে আসেনি – যা অন্যান্য বারমাসীগুলির ক্ষেত্রে হয়েছে । অদ্বৈতের সংগৃহীত বারমাসীটির ধ্রুবপদ এরূপঃ

দারুণ অক্রুর সনে কি বাদ হইল ।
দারুণ অক্রুর সনে কি বাদ হইল ।
গুণের মাধব হইরা নিল ; সইগো
দারুণ অক্রুর সনে —(ধুয়া)

আবার পরে নতুন পংক্তি যুক্ত হয়ে ধ্রুব পদে বৈচিত্র্য এসেছে । যেমন "কৃষ্ণপদে মইলাম ওগো রাই পদটি । মনে হয় বাদ্যযন্ত্র সহযোগে এই বারমাসীটি আসরে গীত হতো । আতোয়ার রহমান সংগৃহীত বারমাসীটি শুরু হয়েছে মাঘ মাস দিয়ে ।

মাঘেতে করে কেশব মথুরা গমন ।
কৃষ্ণছাড়া অন্ধকার সারা বৃন্দাবন ।।'

পক্ষান্তরে অদ্বৈতের বারমাসীর সূচনা এভাবে —

কার্ত্তিক মাসেতে রাইগো মুরলীব তান ।
চইমক্যা উঠে রাধার চিত্ত দগধে পরান ।
কৃষ্ণ প্রেমে সইলাম আমি রাই,
দারুণ অক্রুর মনে ।।

আতোয়ার রহমান তাঁর সংগৃহীত বারমাসীটি সম্পর্কে বলেন, "এই গীত চৈতন্য পরবর্তীকালের রচনা, — অনুমান করবার কারণও রয়েছে । এরভাষার সাথে ষোড়শ শতকের বৈষ্ণব কবি বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবৎ এর ভাষার কিছুটা সাদৃশ্য আছে ।

অতি সংক্ষেপাকারে ভূমিকা প্রনয়ণ করে সীতার বারমাসীটি তুলে ধরেছেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ । তার আগে অবশ্য এই বারমাসীটির ভনিতা সম্পর্কে তিনি ভিন্নরূপ মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, "এই বারমাসীটির শেষে একটি ভনিতা আছে, তাহাতে মনে হয়, ছিরিধর বানিয়া বা শ্রীধর বনিক নামক কোন লোক ইহার রচয়িতা । তাহারা ছেলের নাম দেওয়া হইয়াচে প্রজাপতি । (ছিরিধর বানিয়া নারে প্রজাপতির বাপ) এই রকমভাবে ছেলের নাম জাহির করিবার যে কি অর্থ থাকিতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না । প্রসঙ্গত আলোচনা করা যেতে পারে যে, অসমীয় ভাষায় রচিত কন্যার বারমাসী শীর্ষক বারমাসীর ভনিতার সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে । ভনিতা দুটি পাশাপাশি একটি সারনীর সাহায্যে তুলে ধরা যেতে পারে ।

সারণী ঃ-

'সীতার বারমাসী,	'কন্যার বারমাসী'
সংগ্রাহক: অদ্বৈত মল্লবর্মণ	সংগ্রাহক ঃ হেমচন্দ্র গোস্বামী
বারমাসের তেরপদ লওরে নানিয়া	বারমাসর তের গীত লওরে গনিয়া
এই গীত বান্ধিয়া দিছে ছিরিধর বানিয়া।	ইতো গীত গাইছে কোন জয়ধন বানিয়া।
ছিরিধর বানিয়া নারে প্রজাপতির বাপ।	জয়ধন বনিয়া নোহে শ্রীধরর বাপ।
যেবা-শুনে সে-বা পায় শরীরের খন্ডে পাপ।।	গাঁও তার মুকুপতি হোরে শুনার খন্ডে পাপ।।

ভনিতা দুটিতে পার্থক্য অধিক নেই । আবার দুটি ভনিতা দুটি ভিন্ন বারমাসীর হলেও

সাদৃশ্য আমাদের বিস্মিত করে । তাহলে সীতার বারমাসীও অসমীয়া ভাষায় প্রচলিত ছিল হয়তো ।

আমাদের দেশে রামকথার ঐতিহ্য অত্যন্ত প্রাচীন । রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, রামায়ণ রচিত হইবার পূর্বে রামচরিত সম্বন্ধে যে সমস্ত আদিম পুরান কথা দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল তাহাদিগকে এখন আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না । কিন্তু তাহাদেরই মধ্যে রামায়নের একটা পূর্বসূচনা দেশময় ছড়াইয়া ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । এর পর গ্রন্থাকারে রামায়ন রূপলাভ করলেও মৌখিক ঐতিহ্যটি লুপ্ত হল না । দুটি ধারায় রামকথার ঐতিহ্য বয়ে চললো । প্রথমটি সাধারণ লোকসমাজে প্রচলিত মৌখিক ঐতিহ্যের ধারা । দ্বিতীয়টি গীতিকুশল পরিস্থিতি সচেতন শিক্ষিত গায়কদের দ্বারা পরিবেশিত রামায়নের ধারা। রামায়ন লিখিত হতে লাগলো বিভিন্ন ভাষায় । দেশের সীমানা ছাড়িয়ে সিংহল বার্মা কম্বোডিয়া, থাইল্যাণ্ড, কোচিন, চীন, মালয়, ফিলিপ, সুমাত্রা, জাভা, কোরিয়া, জাপান প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে রামকথা সমাদ্রত হয়ে উঠল । "A great inspiration in literature and art, through out the greater part of Asia." হয়ে উঠল রামকথা । একে আচার্য সুনীতি কুমার বললেন Dig-vijaya or world conquest' ডঃ মানস মজুমদার বলেন, "কথকতায়, ছড়ায়, প্রবাদে- প্রবচনে, ধাঁধায়, গানে লোকনাট্যে এই মৌখিক ঐতিহ্যের বহুবিচিত্র প্রকাশ" ঘটল রামকথার মৌখিক ঐতিহ্যের মধ্যে ।

ডঃ মানস মজুমদার বলেন, "বারোমাসী গানগুলি যুগপৎ প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্যে আমাদের বিস্মিত করে । ...বাংলার মাটি জল উৎসব আর পূজাপার্বণকে ঘিরেই এ বারোমাসীর উদ্ভব। অশোকবনে বন্দিনী সীতার বারোমাস্যাতেও প্রধান ভূমিকা নিয়েছে বাংলার পল্লী প্রকৃতি । পতি বিরহিনী সীতার প্রতি লোকবাংলার নিবিড় সহানুভূতি ও সহমর্মীতা এ গানের আদ্যান্ত লভ্য । পূর্বোক্ত বারমাস্যাদ্বয়ও কৌশল্যা বা রাম লক্ষ্মণ সীতার প্রতি লোকসমাজের সুগভীর শ্রদ্ধা-প্রীতি মমতা সম্ভূত । এ জাতীয় বারমাস্যা সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য নিঃসন্দেহে সমর্থনযোগ্যঃ They are rich in sincerity though not in craftmanship of composition." (বাংলার মৌখিক ঐতিহ্যে রামকথা) ।

রামকথার প্রাচীনত্ব সন্দেহাতীত । তাই রামকথায় বহুবিষয় মিথ্ রূপে স্বীকৃত । আবার রামকথার বিষয়কে কাহিনী-অনুতেও বিভক্ত করা চলে । ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত রামায়নের কাহিনীকে মোট উনসত্তরটি মোটিফে বিভক্ত বলে জানিয়েছেন । সেখানে সীতার অন্তর্বেদনা কোন কাহিনী বা মেটিফ নয় । আবার রামায়ন কাহিনীতেও সেই অন্তর্বেদনা গুরুত্ব লাভ করেনি। প্রকৃত পক্ষে রামকথা জানা ও উপলব্ধির পর সীতার অন্তর্বেদনা পল্লীবাংলার মানুষের অন্তরে গভীর রেখাপাত করেছিল । যা রামায়নে লিখিত হয়েছে তারপরও সীতার বেদনার পূর্নাঙ্গ রূপের যেন সন্ধান পায়নি গ্রাম বাংলার বৃহত্তর লোকসমাজ । তাই বারমাসী গান তাকে আরো হৃদয় স্পর্শ করে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে ।

অদ্বৈত সংগৃহীত বারমাসীটির বারমাসে সীতার দুঃখবর্ণনা একটি ছকের মাধ্যমে ব্যক্ত হচ্ছে।

সারণী ঃ

মাস	বারমাসীতে বিষয়	বিবিধ প্রসঙ্গ
বৈশাখ মাস	রামচন্দ্র রাজা হবেন, লোকমুখে প্রচারিত হচ্ছে। পাপিষ্ঠ ঈশ্বর ও দৈবের লিখন ভরতের হাতে রাজত্ব সঁপে দিয়ে রাম বনে যায়। ভরত কনিষ্ঠ হয়েও সিংহাসনের অধিকারী হয়। দেবতারা ভরতের জন্য বাসর সাজিয়ে দেয়।	'বৈশাখ মাসের দুঃখরে' এখানে ধ্রুবপদ। প্রতি মাসে, মাসের নাম পরিবর্তিত হয়েছে। রামায়ণের কাহিনীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রয়েছে । রাজা হবার আনন্দ বর্ণময় পুষ্পের সঙ্গে তুলনীয় হয়েছে।
মাস	পাশা খেলতে খেলতে সোনার হরিণ দেখে সীতা। হাতের পাশা মাটিতে রেখে হাত জোড় করে রামচন্দ্রকে সোনার মৃগ এনে দিতে বলে। শ্রী রাম লক্ষণ মৃগ বধ করতে গেলে, শূন্যগৃহ থেকে রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে যায়। দুষ্ট ও দুরাচারী রাবণ সীতাকে রথে তুলে লঙ্কায় নিয়ে যায়।	পংক্তি সংখ্যা এখানে তুলনায় বেশী। সীতা হরণের সঙ্গে সঙ্গে রামের বিচ্ছেদ বেদনা ও সীতার বিবিধ দুঃখ তীব্রতা পেতে শুরু করে। জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত সীতা প্রভু রামের সঙ্গে অতিবাহিত করতে পেরেছে । ধ্রুব পদে তার ইঙ্গিত রয়েছে।
আষাঢ় মাস	আষাঢ় মাসে গভীর বর্ষা শুরু হয়ে যায়। প্রভু রামচন্দ্র ও দেবর লক্ষ্মণের জন্য তার ভাবনা হচ্ছে। রাক্ষসের ঘরে কর্ম দোষে বন্দী হতে হয়েছে। প্রভুর উদ্দেশ্যে বলছে সীতা যে, তার না জানি কি দশা হয়।	রাম-লক্ষণের নিকট থেকে দূরত্ব সৃষ্টিই সীতার বিচ্ছেদ তীব্র করেছে। বরষার তীব্রতার সঙ্গে সীতার বিচ্ছেদের তীব্রতা তুলনীয় হয়েছে।
শ্রাবণ মাস	শ্রাবণ মাসে পাখিরা কলবর করে। তা শ্রুতিমধুর কিন্তু রামচন্দ্র কত দূরে রয়েছেন তা সীতার জানা নেই।	সীতার দুঃখ, সাগরের গভীরতার সঙ্গে তুলনীয় হয়েছে।
ভাদ্র মাস	সীতার কপালের দুঃখ লেখা যায় না। ভাবনা-চিন্তা করতে করতে সীতার শরীরের ঔজ্জ্বল্য ম্লান হয়ে গেছে। গুণের সাগর রামচন্দ্র কোথায় রয়েছে কে জানে।	সীতার ভাবনার তীব্রতা বোঝাতে ধ্রুবপদে তা ধৃত রয়েছে।

আশ্বিন মাস	সীতা স্বপ্ন দেখছেন যে হনুমান সমুদ্র লঙ্ঘন করে সীতার কাছে এসেছেন। তিনি হনুমানের কাছে রামচন্দ্রের কুশল সংবাদ জানতে চাইছেন।	বন্দীত্ব ও বিরহ যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন সীতা অস্থির । স্বপ্নের মধ্যে তার প্রকাশ ঘটেছে।
কার্ত্তিক মাস	প্রতিদিন রাবণ কল্পনা করে আসে (সীতাকে লাভ করার জন্য)। করুণা সদয় রামচন্দ্র যেন সীতাকে উদ্ধার করেন। আজ সীতার অবশ্য মৃত্যু লেখা রয়েছে।	পারিপার্শিক বাধা ও যন্ত্রণা সীতার জীবনযাত্রা দুঃসহ করে তুলেছে । পতিদেব রামচন্দ্রই তাকে উদ্ধার করতে পারেন।
অগ্রহায়ণ মাস	অগ্রহায়ণ মাসে শীতের প্রকোপ তীব্রতা পায়। প্রত্যেকের স্বামী নিকটেই আছে। তাই তাদের রাত সুখেই কাটে । জনম দুঃখিনী সীতার দুর্গতি অনেক।	বাস্তব প্রকৃতির সঙ্গে রামায়ণের অনুসঙ্গ যুক্ত হয়েছে এখানে।
পৌষ মাস	এ মাসে ফুল ঝরে পড়ে। কিন্তু দুঃখ ঘুচেনা । ইন্‌কুলের (?) মাটি দিয়ে শরীর লেপন করল। নদীর তরঙ্গ দেখে ফিরে আসতে হল। ফুল ফুটলে সুবাস রেরোয়। যে নারী স্বামী হীন তার ফুলে কি প্রয়োজন?	এখানে বক্তব্যে দুর্বোধ্যতা রয়েছে। ইন্‌কুলের মাটি ও নদীর তরঙ্গের পারস্পারিক সম্পর্কের বিষয় স্পষ্ট নয়।
মাঘ মাস	সীতা স্বপ্ন দেখছেন, শ্রী রামের চর সমুদ্র লঙ্ঘন করে এসেছে। মন্দোদরী রাবণকে বলেছেন তার কৃত কর্মের জন্য লঙ্কাপুরী নিজেই ধ্বংস করছে । সীতাকে প্রত্যাবর্তন করে রাবণ যেন রামের ভজনা করে। তাহালে রামের বানের হাত থেকে তার প্রাণ রক্ষা পাবে। সীতাকে আটকে রাখলে রক্ষা পাওয়া কঠিন । তাছাড়া চন্দ্র বাণে কুম্ভকর্ণ ও কাটা পড়বে।	রাবণকে এরূপ র্ভৎসনার বিষয়টি রামায়ণেও রয়েছে। তাছাড়া রামায়ণকে রামের ভজনা করার বিষয়টি রামায়ণে গুরুত্ব পেয়েছে। স্বপ্নদর্শণের এরূপ বিষয়টি গুরুত্ব লাভ করেছে।

ফাল্গুন মাস	পবন দেব শীত বাড়িয়ে দেন। লক্ষণের বানের আঘাতে কুমার ইন্দ্রজিত নিহত হন। ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতে লঙ্কা শূন্য হল। রাণী মন্দোদরী মাটিতে লুটিয়ে কাঁদেন।	সীতার দুঃখ বর্ণনা প্রাধান্য পায়নি। রামায়ণের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করতে গিয়ে সীতা এখানে স্থান পায়নি।
চৈত্রমাস	যুদ্ধে রাবণ রাজার পতন হল। এক লক্ষ পুত্র ও সোয়া লক্ষ নাতীর মৃত্যু হল। বংশে প্রদীপ জ্বালাবার কেউ আর রইল না। বনবাসের বার বছর, সেও শেষ হল। রামচন্দ্রের মাতা কৌশল্যা অযোধ্যায় বসে বসে কাঁদেন।	'বনবাসের বার বছর বিষয় টি অদ্বৈতের দৃষ্টিও আকর্ষণ করেছে। তাছাড়া, এখানে রামায়ণের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বর্ণিত হলেও সীতা প্রায় অনুপস্থিত ।
পবিশেষে	কনকচাঁপা ফুলের মধ্যে ও ধানের মধ্যে খাম শ্রেষ্ঠ । আর নারী শ্রেষ্ঠ সীতা ও পুরুষ শ্রেষ্ঠরাম । বারমাসে তের পদ পূর্ণ হল।	রাম-সীতার শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরা ও রামায়ণের বর্ণনা ধরা ও হয়তো বারমাসীর কবির উদ্দেশ্য ছিল। সেই সঙ্গে রামায়ণের কাহিনীকেও গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল।

আতোয়ার রহমান এক খানি সীতার বারমাসী সংগ্রহ করেছেন, সেটি ব্যতিক্রম ধর্মী । কেননা, তিনি বলেছেন, গীতটি চট্টগ্রাম অঞ্চলে সীতার দশমাসী নামে পরিচিত ।'' এই দশমাসীটির সঙ্গে অদ্বৈত সংগৃহীত বারোমাসীটির কোন কোন পংক্তিতে আশ্চর্য মিল পরিলক্ষিত হয়। একটি সারণীর সাহায্য গ্রহণ করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

সারণী : ৭ (স্রাত)

অদ্বৈতের সংগৃহীত " সীতার বারমাসী"	আতোয়ার রহমান সংগৃহীত "সীতার দশমাসী"
বৈশাখ মাসের দুঃখরে নানা পুষ্পময়। রামচন্দ্র হবেন রাজা সর্ব্বলোকে কয়।। আহারে পাপিষ্ঠ বিধি দৈবের লেখন। ভরতকে রাজত্ব দিয়া রাম যায়রে বন!	বৈশাখ মাসের দিনে নানা পুষ্পময়। রাম হলেন নরপতি সর্বলোকে কয়। তাহাতে পাষন্ড বিধি দৈবের লিখন। ভরতেরে রাজ্য দিয়া রাম গেলেন বন।
শ্রাবণ মাসের দুঃখরে বরিষা সমদ্দুর। নানা পইক্ষের কলবর রে শুনিতে মধুব।।	আষাঢ় মাসের দিনে বরিষা প্রচুর । পক্ষিগণ নাদ করে শুনিতে মধুর।

আষাঢ় মাসের দুঃখরে ঘন বরিষণ। কোথা প্রভু রামচন্দ্র দেবর লক্ষণ। কর্ম দোষে হইলাম বন্দী রাক্ষসেরি ঘর। নিস্তার না দেখি প্রভু কিবা গতি হয়।

শ্রাবণ মাসে দিনে ঘোর বরিষণ। কোথা রইলা দেব রাম দেবর লক্ষণ উদ্দেশ না পাই প্রভু কিবা গতি মোর। কর্ম দোষে বন্দী রইলাম রাক্ষসের ঘর।

আশ্বিণ মাসের দুঃখরে, দেখিলাম স্বপন। সমদ্দুর লঙ্ঘিয়া আইল পবন-নন্দন। কহকহ পবনপুত্র কহ সমাচার। কুশল কি আছে রাম কমল লোচন।

আশ্বিন মাসের দিনে দেখিলাম স্বপন। সমুদ্র লঙ্ঘিয়া আসে পবন নন্দন। কি কহিলাম কি শুনিলাম প্রভুর বিবরণ। আজ রাত্রি গোমাইলাম জুড়িয়া ক্রন্দন॥

বৈশাখ মাস থেকে মাঘ মাস পর্যন্ত এরূপ সাদৃশ্য পূর্ণ পংক্তি রয়েছে আলোচ্য দশমাসীটিতে। আতোয়ার রহমান যেখানে আরেকটি সীতার বারোমাসী সংগ্রহ করেছেন যেটি আলোচ্য বারমাসী ও দশমাসী কোনটির সঙ্গেই সাদৃশ্য যুক্ত নয়।

বারমাসীগুলির জনপ্রিয়তা বহু লোক কবিকে এরূপ বারমাসী রচনায় উৎসাহিত করেছিল। তাছাড়া মুখে মুখে বাহিত হতে হতে এগুলোর রূপ পালটেছে। কিন্তু ভাব ও বিষয় মোটামুটি ঠিক রয়ে গেছে। এই বারমাসীগুলির সাহিত্যধর্ম, চরিত্র বিশ্লেষণ, সমাজ ও ইতিহাস আলোচনার অবকাশ রয়ে গেছে। কিন্তু এখানে লোকসংস্কৃতির আশোক আলোচনা করা হয়েছে বলে অন্যান্য প্রসঙ্গ গুরুত্ব পায় নি।

সহায়ক গ্রন্থ পঞ্জী :-

১) ডঃ আসারফ সিদ্দিকী — লোকসাহিত্য (২য় খণ্ড), (১৯৮০)

২) ডঃ আতোয়ার রহমান — লোকসাহিত্যের কথা, (১৯৮৪)

৩) ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য — ভারতীয় সাহিত্যে বারমাস্যা (১৯৫৯),

৪) ডঃ বরুণ কুমার চক্রবর্তী — গীতিকা স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য (১৯৯৩),

৫) ডঃ মানস মজুমদার — লোক ঐতিহ্যের দর্পণে (১৯৯৩),

৬) ডঃ সুকুমার সেন — বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথমখণ্ড, পূর্বার্ধ) (১৯৭৮),

৭) ডঃ সুখময় মুখোপাধ্যায় — ময়মনসিংহগীতিকা, (১৯৮২),

৮) ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য — বাংলার লোকসাহিত্য

৯) ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত — সংযোগের সন্ধানে লোকসংস্কৃতি

১০) অদ্বৈত মল্লবর্মণ — বারমাসী গানও অন্যান্য, (১৯৯০)

" লোক সংস্কৃতি চিন্তা প্রসঙ্গঃ রবীন্দ্রনাথ"

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সব্যসাচী শিল্পস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিল্পের সব পথ ধরে অগ্রসর হয়েছেন। লোকসংস্কৃতি বিষয়ে তাঁর আগ্রহের অন্ত ছিল না। এর সুন্দর পরিচয় রেয়েছে তাঁর লোকসাহিত্য গ্রন্থখানিতে গ্রন্থটির বিষয়বস্তু চারটি প্রবন্ধ। সেগুলো যথাক্রমে ক. ছেলেভুলানো ছড়া ঃ ১, খ. ছেলেভুলানো ছড়া ঃ ২, গ. কবিসংগীত. ঘ. গ্রাম্য সাহিত্য। প্রবন্ধ চারটি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নিম্নরূপ ঃ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লোকসংস্কৃতি বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন একথার পর লক্ষ্যণীয় যে বিশাল রচনাবলীর মধ্যে ৭৪৯ পৃষ্টা থেকে ৮০৯ পৃষ্টা অর্থাৎ ৬১ পৃষ্টার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লোকসংস্কৃতি বিষয়ক চর্চা সীমাবদ্ধ থেকেছে। তথাপি, এই প্রবন্ধসমুহে তিনি লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন আবার প্রবন্ধগুলি (খ নং ছড়া সংকলন) কবিগুরুর ভাবনার প্রকাশ হিসাবে অমূল্য সম্পদ হয়ে রয়েছে।

তিনটি প্রবন্ধ ও একটি ছড়া সংকলন লেখার জন কবিগুরু সময় নিয়েছেন অন্ততঃ সাড়ে তিন বছর। আবার এই সময়ের মধ্যে লোকসংস্কৃতির বিশাল ভাণ্ডারকে তিনি সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রেখেছেন কেন, এ প্রশ্ন আমাদের মনে আসা অস্বাভাবিক কিছু নয়। আবার, একটি ছড়া সংকলন ছাড়া লোকসংস্কৃতির রসসমৃদ্ধ আলোচনার প্রতি তিনি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন অধিকভাবে। যে কারণে লোকসংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনা তার গণ্ডী ছাড়িয়ে নতুন শিল্প মাত্রা লাভ করেছে।

একজন লোকসংস্কৃতিবিদ্ প্রথমেই উপকরণ সংগ্রহে মনোনিবেশ করে থাকেন। এক্ষেত্রেও তার কোন ব্যত্যয় ঘটেনি। ছেলেভুলানো ছড়া ঃ ১ এর সূচনায় তিনি বলেছেন "বাংলাভাষায় ছেলে ভুলাইবার জন্য যে সব মেয়েলি ছড়া প্রচলিত আছে, কিছুকাল হইতে আমি তাহা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম"। লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের সাহিত্যমূল্য রয়েছে তা আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ ঘটিয়েছেন। আবার বলেছেন "আমাদের ভাষা এবং সমাজের ইতিহাস নির্ণয়ের পক্ষে সেই ছড়াগুলির বিশেষ মুল্য থাকিতে পারে .... কিন্তু তিনি সে সবের কাব্যরসের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। (ছেলে ভুলানো ছড়া ঃ ১/পৃষ্টা ঃ ৭৪৯)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন সংগ্রাহকের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। অর্থাৎ 'সংগ্রহ বিষয়টি লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তা কবিগুরুর জানা ছিল। তাহলে তার সংগ্রহের ভাণ্ডারটি স্ফীত হয়ে উঠতে পারেনি কেন ? এ জিজ্ঞাসার উত্তরও তিনি দিয়েছেন। কবিকে লোকসংস্কৃতির উপকরণের জন্য সংগ্রাহকের উপর সংগ্রহের ভার যাঁহারা লইয়াছেন তাহারা আমাকে লিখিতেছেন ---"প্রাচীনা ভিন্ন আজকালকার মেয়েদের কাছে এইরূপ কবিতা শুনিবার প্রত্যাশা নাই। তাহারা ইহা জানে না এবং জানিবার কৌতূহল ও রাখেনা।......... সুতরাং পাঁচটি ছড়া সংগ্রহ করিতে হইলে গ্রামের পাঁচজন বৃদ্ধার আশ্রয়

ক্রমিক নং	প্রবন্ধসমূহ	পৃষ্ঠা সংখ্যা	প্রকাশকাল
ক.	ছেলেভুলানো ছড়া ঃ ১	৭৪৯-৭৬৯	আশ্বিন -কার্ত্তিক ১৩০১
খ .	ছেলেভুলানো ছড়া ঃ ২	৭৭০-৭৮৭	মাঘ ১৩০১/কার্তিক ১৩০২
গ .	কবি সংগীত	৭৮৮-৭৯২	জ্যৈষ্ঠ ১৩০২
ঘ .	গ্রাম্য সাহিত্য	৭৯২-৮০৯	ফাল্গুন চৈত্র ১৩০৫

রবীন্দ্র রচনাবলী ঃ ৩য় খণ্ড ঃ সুলভ সংস্করণ ঃ পৌষ ১৪০২ ঃ বিশ্বভারতী লইতে হয় ”।

.......রবীন্দ্রনাথ সংগ্রাহকের কথা বিশ্বাস করেছেন । (ঐ পৃষ্ঠা ঃ ৭৯৪) । কিন্তু সংগ্রাহকের কথার সত্যতা সম্পর্কে আমরা সন্দিহান । ঐ সময়ে লিখিত সাহিত্য ততখানি পল্লবিত হয়ে উঠতে পারেনি । লোকজীবনে লোকসংস্কৃতির এসব উপকরণ প্রাণ চাঞ্চল্য প্রবাহিত রেখেছিল । প্রকৃতপক্ষে কবি যাদের নিযুক্ত করেছিলেন তারা তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না, লোকসংস্কৃতি বিষয়েও তারা আগ্রহী ছিলেন না । তিনি তাদের দায়িত্বহীনতার জন্য কবির লোকসংস্কৃতি বিষয়ে অনুরাগ ও শুভ সংকল্প ফলপ্রসূ হতে পারে নি ।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগতভাবেও লোকসংস্কৃতির উপকরণ সংগ্রহে আগ্রহী ছিলেন । তাঁর ব্যস্ততা হয়তো তাঁকে একাজে বাধার সৃষ্টি করেছে । তাঁর সংগ্রহ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, “....দশ বারো জন লোক একখানি ডিঙ্গি বাহিয়া আসিতেছে তাহারা সকলে মিলিয়া উচ্চকণ্ঠে এক গান ধরিয়াছে ....গানের কথাগুলি শুনিবার জন্য কান পাতিলাম, অবশেষে বারম্বার আবৃত্তি শুনিয়া যে ধুয়াটি উদ্ধার করিলাম ......” । সংগ্রহের পর তিনি সেই আবৃত্তির রস সমৃদ্ধ বিশ্লেষণও করেছেন ।

'ছিন্ন পত্রাবলীর একটি পত্রে (১১৯ সংখ্যক পত্র /৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪) তিনি লেখেন, “আজ সকালে বসে ছড়া সম্বন্ধে একটা লেখা লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম । বড়ো ভাল লাগছিল । ছড়ার রাজ্যে আইন কানুন নাই, মেঘরাজ্যের মতো ।” তাঁর এই মুগ্ধতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন 'ছেলে ভুলানো ছড়া ঃ১ এর কয়েকটি পংক্তিতে এইভাবে, “বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান' এই ছড়াটি বাল্যকালে আমার নিকট মোহমন্ত্রের মতো ছিল এবং সেই মোহ এখনো আমি ভুলিতে পারি নাই।” ছড়াগুলোকে তিনি বলেছেন শিশুসাহিত্য । মানুষের মনে আপনি সৃষ্টিশীল এই সাহিত্য সম্ভার সম্পর্কে তিনি নিজের ভাবনার প্রকাশও ঘটিয়েছেন এই প্রবন্ধটিতে । তিনি বলেছেন শিশুসাহিত্য। মানুষের মনে আপনি সৃষ্টিশীল এই সাহিত্য সম্ভার সম্পর্কে তিনি বলেছেন, ছড়াগুলোর মধ্যে যে সাহিত্য রস আছে তাকে আবিস্কার করাই লক্ষ্য । কিন্তু লোকসংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধগুলি অনুধাবন করলে দেখা যায়, লোকসংস্কৃতির উপকরণসমূহ ইতিহাস নৃতত্ত্ব, সমাজ বিজ্ঞান আলোচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, তা প্রবন্ধসমূহে স্বীকৃতি পেয়েছে । তবে একজন সমাজ বিজ্ঞানী, নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানী বা লোকশ্রুতিবিদ্ লোকসংস্কৃতির উপকরণসমূহ সংগ্রহ করার পর ঝাড়াই বাছাই-এর ক্ষেত্রে নিজের ইচ্ছাকে গুরুত্ব দিতে পারেন না । কিন্তু একজন লোকশ্রুতিবিদ্ হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঝাড়াই বাছাই এর ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রতার সাক্ষর রেখেছেন ।

যদিও এর জন্য তিনি পাঠকদের কাছে জবাবদিহি করেছেন । "আজ দুর্গার অধিবাস কাল দুর্গার বিয়ে " ছড়াটি উদ্ধৃতির পর একটি বিশেষ শব্দ ব্যবহারে তাঁর আপত্তির কথা বলেছেন । যে শব্দটি ভদ্রসমাজে উচ্চারণের উপযোগী নয় বলে মনে করেছেন তিনি । শেষে নিজে একটি নতুন শব্দ ব্যবহার করে পদপূরণ করেছেন । সৌন্দর্য আলোচনাই যেখানে উদ্দেশ্য, সেখানে তাঁকে অভিযুক্ত করা যায় না।

'ছেলে ভুলানো ছড়া ঃ ১ ছড়া সংগ্রহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি । তিনি একই ছড়ার বিভিন্ন পাঠ সংগ্রহ করেছেন । ছড়াগুলোর অন্তরের রসস্বরূপ উদঘাটনে প্রয়াসী হয়েছেন । উক্ত প্রবন্ধের সর্বশেষ স্তরকে তিনি বলেছেন, "আমি ছড়াকে মেঘের সহিত তুলনা করিয়াছি । উভয়েই পরিবর্তনশীল বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত বায়ুস্রোতে যদৃচ্ছভাসমান । দেখিয়া মনে হয় নিরর্থক । ছড়াও জড় জগতে এবং মানব জগতে এই দুই উচ্ছৃঙ্খল অদ্ভুত পদার্থ চিরকাল মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আসিতেছে। মেঘ বারিধারায় নামিয়া আসিয়া শিশু-শস্যকে প্রাণদান করিতেছে এবং ছড়াগুলিও স্নেহরসে বিগলিত হইয়া কল্পনা-বৃষ্টিতে শিশু হৃদয়কে উর্বর করিয়া তুলিতেছে । মানুষের অন্তর জগতে স্বতঃই সৃষ্টিশীল লোকসংস্কৃতির উপকরণ 'ছড়া' কোন শিল্পতত্ত্বের পথ ধরে জন্মগ্রহণ করেনি । আবার শিল্প শাস্ত্রের বাইরে থেকে শিশু মনে জগতে কল্পনার মেঘরাজ্যে তার বিচরণ ।" ছড়ার শিল্পতত্ত্বের এর থেকে রসসমৃদ্ধ আলোচনা আর কি হতে পারে ।

এই প্রবন্ধে মূলতঃ তিনটি কাজ তিনি সাধন করেছেন । প্রথমতঃ ছড়া সংগ্রহ, দ্বিতীয়ঃ বিন্যাস, তৃতীয়ঃ রসনিষ্ঠ আলোচনা । একজন লোকসংস্কৃতিবিদ্ তিনটি বিষয়কে অবশ্যই গুরুত্ব দেবেন । অর্থাৎ সংগ্রহের বিচারে বা সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে আমরা যত স্বল্পতার অভিযোগ করিনা কেন একজন গবেষক ঠিক একই পথ ধরে লোকসংস্কৃতি আলোচনা বা গবেষণা কাজে অগ্রসর হবেন, সন্দেহ নেই ।

'ছেলে ভুলানো ছড়া ঃ ২' এর ভূমিকা করেছেন রবীন্দ্রনাথ, রসশাস্ত্রের প্রবন্ধ দিয়ে। 'সদ্যঃকষর্ণে মাটি হইতে সে সৌরভটি বাহির হয় অথবা শিশুর নবনীত কোমল দেহের যে স্নেহোদ্‌বেলকর গন্ধ তাহাকে পুষ্প চন্দন গোলাপ জল আতর বা ধুপের সুগন্ধের সহিত এক শ্রেণীর ভুক্ত করা যায় না। এখানে লোকসংস্কৃতি বিষয়ে একটি মূল্যবান বক্তব্য সংযোজিত হয়েছে । তিনি বলেছেন, ...'ছড়াগুলি স্থায়ীভাবে সংগ্রহ করিয়া রাখা কর্তব্য সে বিষয়ে বোধ করি কাহারও মতান্তর হইতে পারে না । কারণ ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি ।" লোকসংস্কৃতির উপকরণগুলো মানুষের মনে, স্মৃতিতে ধরা থাকে। 'মাতৃভাণ্ডার হল সে সবের উৎকৃষ্ট আধার । কিন্তু ছড়ামাত্র নয় অন্যান্য সব উপকরণ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে একসময় স্মৃতির ভাণ্ডার ধরে রেখেছে এতকাল ধরে । কিন্তু "সামাজিক পরিবর্তনের স্রোতে ছোটোবড়ো অনেক জিনিস অলক্ষিতভাবে ভাসিয়া যাইতেছে । অতএব জাতীয় পুরাতন সম্পত্তি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে।"

একটি ছড়ার তিনি ভিন্ন পাঠ দেখিয়ে ও একই ভিন্ন পাঠ সহ একটি যথার্থ ছড়া সংকলন হয়ে উঠেছে "ছেলে ভুলানো ছড়া ঃ ২" । এই দুই অংশের ছড়া সমূহের একটি বিন্যাস নিম্নরূপ হতে

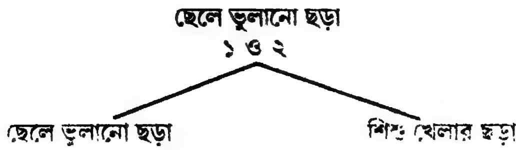
পারে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংগৃহীত ছড়াগুলির শ্রেণীভাগ সম্পর্কে এখানে সামান্য ইঙ্গিত থাকলেও শ্রেণী বিভাগ বা ছন্দবিচার আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। কবি চেতনায় লোকসংস্কৃতি আলোচনা এখানে লক্ষ্য মাত্র। কবি ছড়া সংগ্রহ ও বাছাই এর ক্ষেত্রে রুচির পরিচয় দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য যে মন্তব্য করেছেন তা নিম্নরূপ ঃ " রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নিজস্ব রস, রুচি ও সৌন্দর্যবোধ অনুযায়ীই প্রধানতঃ ছড়াগুলির সংগ্রহ করিয়াছিলেন; সে সকল ছড়া তাঁহার মতে অতিরিক্ত গ্রাম্যতা ভাবাপন্ন তারা তাঁহার সংগ্রহও আলোচনায় স্থান লাভ করিতে পারে নাই।" (বাংলার লোকসাহিত্য ঃ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য পৃষ্ঠা ঃ ১১০)।

লোকসংস্কৃতির উপকরণ সংগ্রহের সময় কয়েকটি বিষয় গুরুত্ব লাভ করে। উপকরণ সংগ্রহের স্থান, সরবাহকারীর বয়স, তার উচ্চারণ, মাথা নাড়া, কণ্ঠস্বর, বিরতি নেবার মুহূর্ত প্রভৃতি খুঁটিনাটি বিষয় একজন উপকরণ সংগ্রাহক গুরুত্ব সহকারে লক্ষ্য রাখেন। সর্বোপবরি হুবহু সংকলন ও প্রকাশের মূল্য তো একজন লোকসংস্কৃতি গবেষকের কাছে প্রত্যাশিত সত্য। ছড়া, লোককাহিনী প্রবাদ যাই হোক না কেন তার বর্তমান রূপটির গুরুত্ব অপরিসীম। কখনো কখনো আদিম পাঠও সংগৃহীত হতে পারে। এক্ষেত্রে সেগুলোর ভিন্ন ভিন্ন পাট রক্ষা করা আবশ্যক। কবিগুরু এই রসের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই' সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হলেও সব ক্ষেত্রেই যথার্থ গবেষকের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু একটি ক্ষেত্রে অন্ততঃ তার ব্যতায় ঘটেছে বলে মনে করেন ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়। শ্রী বরুণকুমার চক্রবর্তী রচিত 'বাংলা প্রবাদে স্থান-কাল পাত্র" গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংকলিত একটি ছড়ার উল্লেখ করেছেন। ছড়াটির উদ্ধৃতি সহ ডঃ সেনের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। এখানে ছড়াটি উল্লেখ করা গেল।

বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর নদী এল বান
শিব ঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যে দান।
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন এক কন্যে খান
আর কন্যে গোঁসা করে বাপের বাড়ির যান ।।

ডঃ সেন বলেন "অল্প বয়সে কবিতাটি বড়োর অনুযায়ী ঠিকই লিখেছিলেন। বেশী বয়েসে সম্ভবতঃ বন্ধুবর্গের সমালোচনার ফলে রবীন্দ্রনাথ দু'একটি শব্দ বদলেছিলেন। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর হল 'শিব ঠাকুরের, স্থানে 'শিবু ঠাকুরের' করা। রবীন্দ্রনাথের সমালোচকেরা শিবের তিন ভার্যার কথা জানেন না। রবীন্দ্রনাথও জানতেন না। সুতরাং ছড়ার শিব ঠাকুর নিশ্চয় মহাদেব শিব নন, কোন কুলীন বামুন শিব, শিবু ঠাকুর। ব্যাখ্যাটি মনোরম বটে। কিন্তু এখন বুঝতে পেরেছি যে এ ব্যাখা ঠিক নয়। ছড়ার নায়ক স্বয়ং শিবই কোন বামুন শিবরাম, শিবদাস বা শিবু ঠাকুর নয়। কেন নয়? শিবের যে তিন ভার্যা ছিল, তাই।

১ নং ছক ঃ



২ নং ছক ঃ

[illegible]	[illegible] ও ভাবের প্রাধান্য	[illegible] ধাত্রী দ্বারা রচিত	[illegible] ও সমাজবোধের পরিচয়বহ
শিশু খেলার ছড়া	ছন্দও তালের প্রাধান্য	কিশোর মতি ছেলে/মেয়েদের নিজস্ব রচনা	বক্তব্যে অসংলগ্নতা অর্থের ধারাবাহিকতা অনুপস্থিত

কে সেই তিন ভার্যা ?

এক, চণ্ডী যার এক নাম কেতকা, যাঁকে শিব বিহাহ করেছিলেন পিতা ধর্মঠাকুরের অনুরোধে। দুই, গঙ্গা, শান্তনু মুনির স্ত্রী রাঁধাবাড়ায় অত্যন্ত দক্ষ, মুনি পরিত্যাগ করায় শিব যাকে মাথায় স্থান দিয়েছিলেন । তিন, দক্ষের কন্যা সতী ও তার দ্বিতীয় জন্ম হিমালয়ের কন্যা পার্বতী । এরা দুজনেই স্বামীর উপর রাগ করে বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন ।

এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, অর্থাৎ গঙ্গা । এক কন্যে খান, অর্থাৎ চণ্ডী মূল গৃহিনী আর এক কন্যা সতী যিনি রাগ করে বাপের বাড়ি গিয়ে অভিমানে কায়োৎসর্গ করেছিলেন এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত পার্বতী যিনি স্বামী সংসারের দারিদ্র্যে জ্বালাতন হয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন নিজের পূজা-নৈবেদ্য সংগ্রহ করতে।''

লোকসংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে কবির কর্মধারা ও আগ্রহ বিন্যস্ত হতে পারে এইভাবে ঃ

(ক) তিনি নিজেই বাংলার লোকসংস্কৃতি উপাদান সংগ্রহে ব্রতী হয়েছেন

(খ) এ বিষয়ে পর্যালোচনা, ব্যাখ্যা ও বিচারে নিরন্তর প্রয়াসী থেকেছেন,

(গ) অন্যদের লোকসংস্কৃতি বিষয়ে উৎসাহ জুগিয়েছেন সর্বোপরি তাদের বই লেখাতে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং তাদের বই এব জন্য ভূমিকা রচনা করে দিয়েছেন ।

(ঘ) তাঁর বিভিন্ন সৃষ্টিকর্মে লোকসংস্কৃতি বিভিন্ন উপাদান সার্থকতার সঙ্গে ব্যবহার ঘটিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান সংগ্রাহকদের উৎসাহ জুগিয়েছেন। তাদের গ্রন্থ প্রকাশ করার জন্য সর্বোপরি তাদের জন্য আশীর্বাদ রচনা অথবা তাদের গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়েছেন । এরূপ কয়েকটি গ্রন্থ ও জ্ঞাতব্য তথ্যাদি নিম্নরূপ ঃ-

অনাদৃত ও অবহেলিত লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান ব্রতকথাকে বিষয় করে পরমেশ প্রসন্ন রায় সংকলন করলেন মেয়েলি ব্রত কথা গ্রন্থটি । এই সময়ের আগেও স্বতোপ্রণোদিত হয়ে

রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা', 'ভারতী', নব পর্যায়ের বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ছাপিয়ে দিচ্ছেন লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান । প্রকাশিত মেয়েলি ব্রতকথা সম্পর্কে তিনি লিখলেন "শ্রী যুক্ত পরমেশ প্রসন্ন রায় মহাশয় সঙ্কলিত মেয়েলি ব্রতকথা'র মুদ্রিতাংশ প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম ।

বহুদিন হইল সাধনা পত্রিকায় এই সকল গ্রাম্য সাহিত্য প্রকাশের জন্য উদ্যোগী ছিলাম, তখন এগুলিকে তুচ্ছ ও লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার অযোগ্য বলিয়া অনেকেই অনাদর করিতেন এই সাহিত্য যে স্বতঃসৃত নদীর ধারার মতো সুচির কাল হইতে বাংলার পল্লীগৃহের দ্বারে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে, শিক্ষা এবং আনন্দ ঘরে ঘরে বহন করিয়া দিবার এমন সহজবিহিত সুন্দর এমন চিরন্তন ব্যবস্থা যে আর কিছুই হইতে পারেনা এই সাহিত্যের মধ্যেই আমাদের পল্লীজীবন যাত্রার সরল মূলনীতিগুলি যে নানা আকারে সন্নিবেশিত হইয়া আছে এবং কালের পরিবর্তনবশতঃ এগুলি বিলুপ্ত হইয়া পরবর্তী অংশ পরের পৃষ্ঠায় গেলে দেশের পুরাবৃত্তের একটি প্রধান উপকরণ নষ্ট হইয়া যাইবে —স্বদেশের প্রতি একদা ঔদাসিন্যবশতঃ একথা তখন কেহ চিন্তা করিতেন না, এখন যে আমাদের সেই দুর্দিনের অবসান হইয়াছে, দেশকে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিবার জন্য আমাদের হৃদয়ে আগ্রহ জন্মিয়াছে, বর্তমান গ্রন্থ তাহারই সূচনা করিতেছে আর একখানি ব্রতকথার সংগ্রহ অল্পদিন হইল প্রকাশিত হইয়াছে ; কিন্তু তাহাতে কথাগুলি পুঁথির ভাষার লিখিত হওয়ায় তাহার রস নষ্ট হইয়াছে বর্তমান গ্রন্থে সেরূপ নিষ্ঠুরভাবে বিশুদ্ধি সাধনের চেষ্টা হয় নাই দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়াছি ।

আশা করি গ্রন্থকারের সংগ্রহ অধ্যবসায় পাঠকদিগের নিকট হইতে সমাদর লাভ করিয়া স্বদেশের অন্তঃপুরে নতুন নতুন সন্ধান ও আবিস্কারে সার্থক হউক ।"

লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান সাধনা প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশে কবির আগ্রহের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে । তিনি এদের বলেছেন 'গ্রাম্য সাহিত্য' । এ সবের প্রতি অনাদর তখন নয়, বর্তমানেও দেখা যায় । যার জন্য প্রবাহমান এই আচরনীয় অলিখিত সংস্কৃতি প্রবাহ আজ শুকিয়ে আসছে ক্রমশঃ । এসব উপাদান অবহেলা অনাদরে যে নষ্ট হতে দেয়া যায় না তা রবীন্দ্রনাথ এই 'পরিচায়িকাতে প্রকাশ করেছেন । এই লোকসংস্কৃতি সম্প্রতি আলোচনার জনপ্রিয় বিষয় হয়ে উঠলেও সুদীর্ঘকাল ধরে বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হয়ে গেছে । এই শূন্যতার বড় কারণেই হল লোকসংস্কৃতিকে অন্ত্যজ জ্ঞান করা এবং সে সবের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করা । তিনি এখানে অন্য একটি ব্রতকথার সংগ্রহের কথা বলেছেন । সেটি সম্ভবতঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'মেয়েলি ব্রত' (১৩০৩ বঙ্গাব্দ) বইটি ।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার রচিত 'ঠাকুরমার ঝুলি' এপর্যন্ত (১৯৮১) ৩০ বার ছাপানো হয়েছে । রবীন্দ্রনাথ ১৩১৪ বঙ্গাব্দে এই বইটির ভূমিকা লিখেছেন । চারটি ভাগে এতে রয়েছে ১৩টি লোককথা । রবীন্দ্রনাথ কৃত ভূমিকার অংশ বিশেষ নিম্নরূপ ঃ

পুস্তক	সংগ্রাহক/ রচনাকার	প্রকাশকাল	বিষয়
মেয়েলি ব্রতকথা	পরমেশ প্রসন্ন রায়	১৩০৩ বঙ্গাব্দ	ব্রতকথা সংকলন

ঠাকুরমার ঝুলি	দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার	১৩১৪ বঙ্গাব্দ	লোককথা সংকলন
বেড়াল ঠাকুরঝি	বিভূতিভূষণ গুপ্ত	১৩৩০ বঙ্গাব্দ	লোককথা সংকলন
কাঠের কাজ	লক্ষীশ্বর সিংহ	১৩৩২ বঙ্গাব্দ	কাঠকে কাজে লাগানোর পদ্ধতি

"ঠাকুরমার ঝুলিটির মত এত বড় স্বদেশী জিনিস আমাদের দেশে আর কি আছে ? কিন্তু হায় এই মোহন ঝুলিটিও ইদানীং ম্যাঞ্চেষ্টারের কল হইতে তৈরী হইয়া আসিতেছিল । এখানকার কালে বিলাতের Fairy Tales আমাদের ছেলেদের একমাত্র গতি হইয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছে । স্বদেশের দিদিমা কোম্পানী একেবারে দেউলে । তাঁদের ঝুলি ঝাড়া দিলে কোন কোন স্থলে মার্টিনের এথিক্স এবং বার্কের ফরাসী বিপ্লবের নোটবই বাহির হইয়া পড়িতে পারে, কিন্তু কোথায় গেল — রাজপুত্র, পাত্তরের পুত্র, কোথায় বেঙ্গমা-বেঙ্গমী , কোথায় সাতসমুদ্র তেরো নদী পারের সাত রাজার ধন মাণিক্য । পাল৷ পার্বণ যাত্রাগান কথকতা এ সমস্তই ক্রমে মরানদীর মতো শুকাইয়া আসাতে বাংলাদেশের পল্লীগ্রামে যেখানে রসের প্রবাহ নানা শাখায় বহিত সেখানে শুষ্ক বালু বাহির হইয়া পড়িয়াছে । ইহাতে বয়স্ক লোকের মন কঠিন স্বার্থপর এবং বিকৃত হইবার উপক্রম হইতেছে । তাহার পরে দেশের শিশুরাও কোন পারে আনন্দের রস হইতে বঞ্চিত হইল ।তাহাদের সায়ংকালীন শয্যাতল এমন নীরব কেন ? তাহাদের পড়াঘরের কেরোসিন দীপ্ত টেবিলের ধারে যে গুঞ্জনধ্বনি শোনা যায় তাহাতে কেবল বিলাতী বানান বাহির বিভীষিকা । মাতৃদুগ্ধ একেবারে ছাড়াইয়া লইয়া কেবলি ছোলার ছাতু খাওয়াইয়া মানুষ করিলে ছেলে কি বাঁচে ।"......

আপন সংস্কৃতির প্রতি চরম অবহেলা এবং জাতির প্রাণ ভোমরাকে আবিস্কার করতে না পারার মধ্যে যে দীনতা রয়েছে তা এখানে প্রকাশ পেয়েছে । লোকসংস্কৃতি এতকাল অবহেলার পাত্রই হয়ে রয়েছে । আর এই অবহেলার ফলে যুগ-যুগান্ত ধরে প্রবাহমান সংস্কৃতির ধারা এসে তলানীতে ঠেকেছে । এর চেয়ে দুঃখজনক আর কি হতে পারে । এ যুগের শিশুরা আর রূপকথা শোনে না । যন্ত্রসভ্যতার কারণে আর অন্ধ পরানুকরণে সে সব উপাদান প্রায় হারিয়ে গেছে ।

'বেড়াল ঠাকুর ঝি' গ্রন্থখানি কুড়িটি লোককথার একটি সংকলন গ্রন্থ । সংগ্রাহক বিভূতিভূষণ গুপ্তের এই বইটি প্রকাশিত হয় ১৩৩০ বঙ্গাব্দে । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বইটির ভূমিকা রচনা করে দেন । তিনি বলেন ঃ 'রূপকথা মেয়েদের মুখে মুখে যেমন শোনা যায় ঠিক তেমনি লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে । এগুলি পড়িলেই বুঝা যাইবে, এ সমস্তই অখ্যাত নাম্নী মেয়েদেরই রচনা, তাহাদেরই প্রতিদিনের ঘরকান্নার হাঁড়ি কুঁড়ির অন্তরের কথা ।তাছাড়া ইহার মধ্যে মানমানবের যে প্রকৃতি পরিচয় পাওয়া যায় তাহারও আধার এই বাংলাদেশের গ্রামের অন্তঃপুরে । ....
"সংগ্রাহক বিভূতিভূষণ গুপ্ত যথার্থ সংগ্রাহকের দায়িত্ব নিয়ে লোককথাগুলি সংকলন করেছেন। আবার লোককথাগুলির ভিন্ন পাঠও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জানা ছিল । মেয়েদের মুখ থেকে অথবা গল্প কথকের মুখ থেকে হুবহু তুলে এনে লিপিবদ্ধ করা যে একজন সংগ্রাহকের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জানা ছিল । গল্পের রূপভেদ সম্পর্কে সচেতন থাকাও লোকসংস্কৃতি পঠন পাঠনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । এই ক্ষুদ্র ভূমিকাটিতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দুটি প্রকাশ

করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

১৩৩২ বঙ্গাব্দে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লক্ষীশ্বর সিংহ রচিত 'কাঠের কাজ' বইটির ভূমিকা লিখেছেন। কাঠে লোকশিল্পীদের হাতের কাজ শুধুমাত্র লোকশিল্প তথা লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত নয়, সমাজতত্ত্ব নৃতত্ত্ববিদ প্রমুখ বিভিন্ন বিদ্যাশৃঙ্খলার গবেষকগণ এই কাঠে খোদিত কাজকে আলোচনার বিষয় করে নিয়েছেন। আপাতদৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ রচিত এই গ্রন্থের ভূমিকায় লোকসংস্কৃতি বিষয়ে কোন বক্তব্য নেই। তিনি লেখেন, "বিদ্যাশিক্ষায় আমাদিগকে মানুষ করিয়া তুলিবে এই কথাই খাঁটি। কিন্তু পুঁথি পড়া মানুষই যে পুরা মানুষ তাহা বলা যায় না। অথচ এ সম্বন্ধে আমাদের বিদ্যাবিভাগের লজ্জা নাই। তাই দীর্ঘকাল সে আমাদের কানে মন্ত্র দিয়া আসিয়াছে যে ভদ্রলোককে পুরা মানুষ হইতে হইবে না। ...."

কাঠের কাজ বললে শুধুমাত্র সাদামাটা ঘরদোর বা আসাবাবপত্রাদি নির্মাণ করা নয় রবং কাঠের দরজার অলংকরণ দেবমন্দির নির্মাণ, কাঠের সিংহাসন পুতুল তৈরী বাদ্যযন্ত্র তৈরী কাঠের মুখোশ তৈরী প্রভৃতি কাজকে বোঝায়। এছাড়াও রয়েছে আরো অনেক শিল্পকর্ম যা একসময় লোকশিল্পী একান্তে নিষ্ঠা ও চরম ধৈর্য্য সহকারে সম্পাদন করেছেন। যা পরবর্তী কালে মানুষের ইতিহাস রচনার সহায়ক হয়েছে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের এই বই -এর ভূমিকা রচনা এ দিকটিতে মনে রেখেই রচিত হয়েছে।

১৩১১ বঙ্গাব্দের ১৭ই চৈত্র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ছাত্রদের নিয়ে গঠিত পরিসদ শাখার ছাত্রসভায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভাষণ প্রদান করেন। পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে ছাত্রসভায় তিনি মৌখিক ভাষণ প্রদান করেন। উক্ত ভাষণ অনুলিখন করেন উক্ত ছাত্রসভার ভূতপূর্ব ছাত্র সভ্য শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু। নব পর্যায়ের বঙ্গদর্শন পত্রিকা (১৩১৬ বঙ্গাব্দ/৯ম বর্ষ/পৌষ সংখ্যা)য় মনোমোহন বসু অনুলিখিত রবীন্দ্র বক্তৃতা মুদ্রিত হয়। বঙ্গদর্শন লিখেছেন, ভূতপূর্ব ছাত্রসভ্য শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু এম. এ. রবীন্দ্রবাবুর বক্তৃতার নোট লইয়াছিলেন তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

বক্তৃতায় কবিগুরু যা বলেছেন তার পূর্ণ উদ্ধৃতি এখানে অনাবশ্যক। তবে কিছু কিছু উদ্ধৃতি ও আলোচনার সাহায্যে রবীন্দ্র দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় তুলে ধরা যেতে পারে।

(১) "কাল বদলাইয়া গিয়াছে। এখন ছাত্রেরা গৌরবের সহিত দেশের ভাষা ইত্যাদি আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কয়েক বৎসর পূর্বে এমন সময় ছিল যে দেশের ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রাদেশিক বা গ্রাম্য শব্দ সংগ্রহ করা ছড়া এবং পুরাতন পুথি সংগ্রহ করা ইত্যাদি কার্য প্রায় সকলেই লজ্জাজনক মনে করিতেন। যাহা হউক, সেই পুরানো ভাবের পরিবর্তন হইয়াছে।

(২) ছাত্রসভ্যেরা ইচ্ছা করিলেই বঙ্গদেশের নানা স্থান হইতে এমনকি নিজ নিজ গ্রাম হইতে জেলা হইতে এই মিউজিয়াম স্থাপনের উপযোগী নানারূপ বস্তু সংগ্রহ করিতে পারেন। মুদ্রা ঘট ইত্যাদি বহুবিধ শিল্প কার্যাদি নানারূপ পণ্যজাত দ্রব্যাদি --যাহা বিশিষ্টরূপে বঙ্গদেশের এ সকলই সংগ্রহীত হইতে পারে।

(৩) সংগ্রহযোগ্য আর একটি বিষয় --যাহা অনায়াসে হইতে পারে তাহা এই, বঙ্গদেশের ছোট নগর ও শহর এমনকি অনেকগুলি গ্রামের মধ্যে কতকগুলি আধুনিক কতকগুলি পুরাতন। সেইগুলির সম্বন্ধে ছোট ছোট ইতিহাস এখন হইতে সংগ্রহ করিলে ভবিষ্যতে ইতিহাস লেখকদের অনেক সুবিধা হইবে ' ....

(৪) 'আর একটা যেটা আমার বিশেষ ঔৎসুক্যের বিষয়। সেটা ছোট ছোট নূতন ধর্মপ্রচারকদের জীবনী ও বক্তব্য বিষয় সংগ্রহ করা। সমাজের মধ্যে তাঁহারা কি বলিতে এসেছেন কি বলছেন এটা জানা উচিত এইগুলি সংগ্রহ করিতে পারিলে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মমত প্রচলিত হইতেছে অজ্ঞাতে ও অলক্ষ্যতে যে সকল শক্তি সমাজের মধ্যে কাজ করিতেছে তাহা অনেকটা বুঝা যাইবে।

(৫) ....যদি ছাত্রসভ্যরা এখন হইতে দেশের চারিদিকে দেশের মাটির দিকে এখন হইতে দেখিতে শেখেন তাহা হইলেও এইরূপ অনুরাগ থাকিয়া যাইবে।

লোকসংস্কৃতি একটি পৃথক বিদ্যাশৃঙ্খলা হলেও অন্য কোন বিদ্যাশৃঙ্খলা সঙ্গে বিরোধ নেই। সম্ভবতঃ কোন বিদ্যাশৃঙ্খলা নিজস্ব জগতে একক শ্রেষ্ঠ নয়। অন্য বিদ্যাশৃঙ্খলার সাহায্য তাকে নিতেই হয়। কবিগুরুর এই ভাষণে মাটির কাছাকাছি চলে যাবার জন্য তিনি ছাত্রসমাজকে আহ্বান জানিয়েছেন। লোকসংস্কৃতির মুখ্য আধার হল গ্রাম। সেখানে লোকজীবনে প্রয়োজনীয় বা আনন্দের সৃষ্টি শিল্পসমূহ সংগ্রহের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা, মুদ্রা যদিও ইতিহাস রচনার আধার কিন্তু লোকজীবনে প্রয়োজনীয় বা আনন্দের সৃষ্টি শিল্পসমূহ সংগ্রহের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা, মুদ্রা যদিও ইতিহাস রচনার আধার কিন্তু লোকজীবনে ব্যবহৃত সাংস্কৃতিক দিকটি উদঘাটনে সক্ষম। নৃবিজ্ঞান মানুষের জন্ম থেকে শুরু করে পৃথিবীতে তার প্রতিষ্ঠা ও বিস্তৃতির কথা তুলে ধরে। সেখানে মানুষের সমাজ ধর্ম ভাষা আর ধর্ম প্রচেষ্টার বিভিন্ন দিককে প্রাথমিক ও প্রধান কাজরূপে তুলে ধরে নৃবিজ্ঞান। লোকসংস্কৃতিও একই ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হলেও এখানে মানুষের মনের গতিশীলতাও সমান গুরুত্ব লাভ করে।

ধর্মপ্রচারকদের জীবন ও ধর্ম ভাবনাকে তুলে আনার কথাও রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে বলেছেন। প্রসঙ্গতঃ এখানে তিনি স্পষ্টতঃ লালন ফকিরকে উদাহরণ হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন। ভারতবর্ষেব মনের ইতিহাস ও সংস্কৃতি লালন ফকিরের জীবনধারার মধ্যে ফুটে উঠেছে। পল্লীজীবনের রস নিংড়ে লালন ফকিরের সংগীত ধারা অদ্যাবধি মানুষের মনকে সজীব রেখেছে। কবিগুরু লালন ফকিরকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছেন মাত্র নয়, তাঁর অন্তরও লালন গীতিরসে সিক্ত হয়েছে। এমন অনেক সাধক গ্রাম বাংলার মানুষের অন্তরে সংস্কৃতির যে বীজ বপন করেছেন ও পল্লবিত হবার পথ নির্দেশ করেছেন, সে সব মহান মানুষদের সাহিত্য কর্ম ও জীবন কবিগুরুর কাছে গুরুত্ব লাভ করেছে। কবিগুরু তাই ছাত্রদের কাছে ভাষণে সে সব মহান মানুষদের শক্তির সঙ্গে মানুষদের পরিচয় ঘটানোর দায়িত্ব অর্পন করেছেন ছাত্রদের প্রতি।

কবির এই আহ্বান মানুষের অন্তরে লীন হবার জন্য, আর অন্তরের গহীন থেকে উপাদান সংগ্রহ করে সেগুলোকে সম্পদের শ্রেষ্ঠত্বে আসন প্রদানের জন্য। এ দায়িত্ব পালন করবে

ছাত্রসমাজ। এখানে ছাত্রসমাজকে ব্যাপক অর্থেও প্রয়োগ করা যেতে পারে । কবির অন্তরের এই উদাত্ত আহ্বান ধ্বনিতে হয়েছে তাঁর সমগ্র রচনা সম্ভারে ।

বাউল গান, লৌকিক মেলা, লোক উৎসব প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহের কথা আমাদের অজানা নয় । তিনি বরাবর চেয়েছেন "এই ছড়াগুলি স্থায়ীভাবে সংগ্রহ করিয়া রাখা কর্তব্য সে বিষয়ে বোধ করি কাহারও মতান্তর হইতে পারে না ।" (ছেলে ভুলানো ছড়া ঃ ২/পৃষ্ঠা ঃ৭৭০) । শুধুমাত্র ছড়ার ক্ষেত্রে নয়, লোকসংস্কৃতি সমস্ত উপকরণের ক্ষেত্রেই তাঁর ভাবনা সমান সত্য ।

মোটকথা রবীন্দ্রনাথ বাংলার লোকসংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থের ভূমিকা রচনা, আশীর্বাদ রচনা, বক্তৃতা ও লোকসাহিত্য গ্রন্থ লিখেই ক্ষান্ত থাকেননি, লোকসংস্কৃতির সঞ্জীবনী সুধা সাঙ্গীকৃত করেছিলেন আপন অন্তরে । যা তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেছে । যার প্রভাব পড়েছে তাঁর গল্প কবিতা নাটক তথা সৃষ্টির বিভিন্ন ধারায়। লোকসংস্কৃতি বিভিন্ন উপকরণ নিজের মধ্যে গ্রহণ করে আপন স্বকীয়তায় যা তিনি রচনা করেছেন সেখানে লোক উপাদানসমূহ অস্পষ্ট নয় ।

তথ্যপঞ্জী ঃ

১) লোকসংস্কৃতি গবেষণা' সম্পাদক ডঃ সনৎ কুমার মিত্র
পত্রিকার নিরবচ্ছিন্ন সংখ্যা (বিশেষতঃ তৃতীয় পঞ্চম বর্ষের ড° ক্ষেত্রগুপ্ত, ড' সনৎ কুমার মিত্র, ড° আশিষ বসুর প্রবন্ধ গুলি)

২) বাংলা প্রবাদে স্থান কালপাত্র ঃ ডঃ বরুণ কুমার চক্রবর্তী

৩) রবীন্দ্র রচনাবলী

রবীন্দ্র সৃষ্টিতে লোক সংস্কৃতির প্রভাব

একজন লোকশ্রুতিবিদ্ প্রথমে লোকসংস্কৃতি-বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য বা উপকরণ সংগ্রহে সচেষ্ট হন। এরজন্য তাঁকে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়।

এ বিষয়ে প্রচেষ্টা ও তাদের রূপায়নকে দুটি ভাগে বিন্যস্ত করা যায়।

প্রথমতঃ প্রত্যক্ষ প্রয়োগ এবং পরোক্ষ প্রয়োগ।

রবীন্দ্র সাহিত্যের সমৃদ্ধতম রচনার যুগ যখন চলছিল সে সময়েই রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ করছিলেন। কাব্যরচনার ক্ষেত্রে 'সোনার তরী', 'মানসী'র যুগ, কথা সাহিত্যের দিক দিয়ে 'গল্পগুচ্ছ'র যুগ, নাট্য রচনার দিক্ দিয়ে রাজারাণী, বিসর্জন, চিত্রাঙ্গদা রচনার যুগ চলছিল। তিনি গ্রাম্য সঙ্গীত, লালন সঙ্গীত, অন্যান্য লোকগায়কদের সঙ্গীত সংগ্রহ করছিলেন। আবার ছেলে ভুলানো ছড়াও সংগ্রহ করছেন, সেসঙ্গে বিভিন্ন লোককথার সঙ্গেও পরিচিত হচ্ছেন। লোকজীবনে আচরিত প্রথা,

প্রত্যক্ষ প্রয়োগ ঃ বা প্রচেষ্টা	উপাদান সংগ্রহ লোকসংস্কৃতি বিষয়ে আগ্রহে জানিয়ে পত্র রচনা ভাষণ প্রদানকালে লোকসংস্কৃতি বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তৃত / সংক্ষিপ্ত আলোচনা লোকসংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থের ভূমিকা প্রণয়ন 'লোকসাহিত্য' শীর্ষক গ্রন্থ প্রণয়ন
পরোক্ষ প্রয়োগ	গল্পে কবিতায় গল্পধর্মী সৃষ্টিতে নাট্য সৃষ্টিতে

পার্বণ প্রভৃতি বিষয়ও তাঁর আগ্রহের বিষয় হয়ে উঠছিল। সেসময় 'সাধনা' পত্রিকায় পৃষ্টায় তাঁর লোকসংস্কৃতি সম্পর্কিত লেখাও প্রকাশিত হচ্ছিল। সোনার তরী কাব্যগ্রন্থে স্থান পেল, তাঁর রচিত কবিতা বিম্ববতী, রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে, নিদ্রিত, সুপ্তোত্থিতা ইত্যাদি, গল্প গুচ্ছের গল্প একটি আষাঢ়ে গল্প, অসম্ভব কথা প্রভৃতির মধ্যে লোকসংস্কৃতির উপকরণ স্থান করে নিচ্ছিল। আবার রবীন্দ্র জীবনের কোন কীর্তিই বিচ্ছিন্ন নয়। বরং একটি অখণ্ড যোগসূত্র দ্বারা এদের আবদ্ধ বলা যায়। একটি বিশেষ পর্বে লোকসংস্কৃতি সমৃদ্ধ জগতে রবীন্দ্র মননে যে প্রেরণার সঞ্চার করেছিল, বিভিন্ন সময়ে সৃষ্টির ক্ষেত্রে লোকজগতে থেকে আহরিত উপকরণ সবিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছিল।

বিনয় ঘোষ মহাশয় তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার লোকসংস্কৃতি' শীর্ষক রচনায় ১৯১৫-১৬ সালের শীতকাল শিলাইদহে পদ্মার চরে বোটে কবির সঙ্গে কবি মোহিতলালের একটি সাক্ষাৎকারের ঘটনার বর্ণনা করেছেন। সাক্ষাৎকালে মোহিতলাল দেখেন যে তাঁর ঘরের একপাশে কয়েকখানা বেঞ্চির উপর নানা বিচিত্র দ্রব্য -সম্ভার সাজানো রয়েছে। মোহিতলালের কৌতূহল লক্ষ্য করে কবি বলেন, 'আমি কিছুদিন যাবৎ একটা বিষয়ে বড় উদ্বিগ্ন বোধ করিতেছি ; বাংলার নিজস্ব আর্ট আইডিয়া ক্রমেই বিদেশী প্রভাবে নষ্ট হইয়া যাইতেছে আর কিছুদিন পরে আমাদের খাঁটি দেশীয় শিল্পের নিদর্শনগুলি লোপ পাইবে। তাই আমি এইসকল নমুনা সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি।' (মোহিতলাল মজুমদার ঃ রবি প্রদক্ষিণ (১৯৫৬) -পৃষ্ঠা ১৭৪)। মোহিতলাল আরও লিখেছিলেন, "চাহিয়া দেখিলাম এক জায়গায় কয়েকটি মাটির ঘরে মডেল তাহাদের খড়ের চালের বিবিধ স্টাইল লক্ষণীয়; বুঝিলাম কবি ওই ঘর-ছাওয়ার মধ্যেই যে শিল্প চাতুর্য আছে, তাহাই বাঙ্গালীর নিজস্ব বলিয়া গৌরববোধ করেন। পাশেই কতকগুলি কাঁথা রহিয়াছে, কতকগুলি 'শিকা'ও বোধ হয় ছিল, রজ্জু শিল্পের নিদর্শন বলিয়া তাহাও সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু সবচেয়ে আকর্ষণ করিল --মোটা ব্রাউন পেপারের একটি 'তাক' যেগুলিতে আলপনার নানা নক্সা অতি সরল-স্থূল রেখায় অঙ্কিত হইয়াছে। এগুলির প্রতি কবির মমতা যেন কিছু অধিক, ইহাই বাংলার প্রকৃতিরূপা গৃহলক্ষ্মীদের স্বহস্তরচিত কারু সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। .... আলপনা শিল্পকে ধরিয়া রাখিবার এই কৌশলও অভিনব বলিয়া মনে হইল ---কবির প্রাণের ঐকান্তিক আগ্রহ যেন তাহাতে ব্যক্ত হইয়াছে"। (ঐ -পৃষ্ঠা ১৭৪-১৭৫)।

লোকশিল্প সংগ্রহের প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ও শিয়ালদহে অবস্থানকালে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির সাহায্য নিয়েছেন। দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে একপত্রে তিনি লিখেছেন, "চাটগাঁ অঞ্চলে মেয়েলি শিল্প যা কিছু প্রচলিত সংগ্রহ করে দিতে পারবেন ? ওরা লক্ষ্মীপূজা, বিবাহ প্রভৃতি উপলক্ষে যে সমস্ত আলপনা এঁকে থাকে, সেইগুলি কোন শিল্পপটু মেয়েকে দিয়ে কাগজের উপর আলতার এঁকে থাকে সেইগুলি কোন শিল্পপটু মেয়েকে দিয়ে কাগজের উপর আলতার রঙে আঁকিয়ে পাঠাতে পারেন ? খাঁটি সেকেলে জিনিস হওয়া চাই। শিকে, কাঁথা প্রভৃতি গৃহস্থালীর শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করতে চাই। আর একটি জিনিস চাই --- চাঁটগা অঞ্চলে যত বিভিন্ন রীতির কুঁড়েঘর আছে তার ফোটো বা অন্য কোন রকমের প্রতিকৃতি। আপনার ছাত্রদের লাগিয়ে দিলে এটা দুঃসাধ্য হবে না। জনসাধারণের মধ্যে মাটির, কড়ির, বাঁশের বা বেতের শিল্পকাজ কি রকম চলিত আছে ভাল করে খোঁজ নেবেন। আমরা বাংলার প্রত্যেক জেলার থেকে এই সমস্ত গণশিল্প সংগ্রহ করতে ব্রতী। আপনার নিজের জেলার প্রতিও দৃষ্টি রাখবেন। (বিশ্বভারতী পত্রিকা ঃ কার্তিক পৌষ ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ)।

পর পর দুটি উদ্ধৃতির মধ্যে লোকসংস্কৃতি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ, সর্বোপরি এবিষয়ে তাঁর সুস্পষ্ট জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি অন্যকেও এবিষয়ে উৎসাহিত করেছেন। তারই একটি উল্লেখ করার মতো দিক হল, লোকসংস্কৃতি বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থের ভূমিকা তিনি লিখে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি গ্রন্থ ও তাদের লেখকেরা হলেন ঃ (১) মেয়েলি ব্রতকথা (১৪০৩ বঙ্গাব্দ) --পরমেশ প্রসন্ন রায়, (২) ঠাকুরমার ঝুলি (১৩০৩ বঙ্গাব্দ) --দক্ষিণারঞ্জন

মিত্র মজুমদার, (৩) বেড়াল ঠাকুর ঝি (১৩৩০ বঙ্গাব্দ) ---বিভূতিভূষণ গুপ্ত (৪) কাঠের কাজ (১৩৩২বঙ্গাব্দ) ----লক্ষ্মীন্দর সিংহ ।

তিনি লোকসংস্কৃতির উপকরণ সংগ্রহের জন্য ছাত্রদের কাছে ভাষণ প্রদান করেছেন । লোকসংস্কৃতি বিষয়ে ছাত্রদের আগ্রহে সৃষ্টি করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল । তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন, ... 'ছাত্রসভ্যেরা ইচ্ছা করিলেই বঙ্গদেশের নানা উপযোগী নানারূপ বস্তু সংগ্রহ করিতে পারেন । মুদ্রা, ঘট ইত্যাদি বহুবিধ শিল্প কার্যাদি নানারূপ পণ্যজাত দ্রব্যাদি --যারা বিশিষ্ট রূপে বঙ্গদেশের এ সকলেই সংগৃহীত হইতে পারে'।

রবীন্দ্রনাথ 'লোকসাহিত্য' শিরোনামে নিজে কলম ধরলেন লোকসংস্কৃতি বিষয়কে পাঠকের সামনে তুলে ধরার লক্ষ্যে । তিনি তাঁর ছড়া সংগ্রহ ছাড়াও প্রবন্ধগুলোতে সংগৃহীত ছড়ার রসালোচনা করেছেন । সর্বোপরি সমাজ-বিজ্ঞানের প্রয়োগ কৌশলও তাঁর প্রবন্ধে করেছেন । সংগৃহীত ছড়াগুলোর প্রকৃতি পরিচয় দিতে গিয়ে লোকসাহিত্যের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতির আলোচনাকে স্পর্শ করে গেছেন । এ প্রসঙ্গে লোককোবিদ্ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য এক প্রবন্ধে বলেছন, "রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্য সংগ্রহ যত অসম্পূর্ণই হোক তাহার উপর ভিত্তি করিয়া তিনি লোকসাহিত্যের যে বিচার করিয়াছেন, তাহা কোন দিক দিয়াই অসম্পূর্ণ বলিয়া নির্দেশ করিবার উপায় নাই । তিনি ইহার মূল সুর ও তত্ত্বটির সন্ধান পাইয়া ছিলেন বলিয়া দেশের নহে, সর্বদেশের লোকসাহিত্য সংগ্রহ ও বিচারের ভিত্তিস্বরূপ হইতে পারে।"

বিভিন্ন প্রবন্ধেও লোকসংস্কৃতি বিষয়ে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় রেখেছেন কবি । এ প্রসঙ্গে 'কালান্তর' গ্রন্থের অন্তর্গত 'লোকহিত' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, "আমরা যদি আপনার উচ্চতার অভিমানে পুলকিত হইয়া মনে করি যে, ঐসব সাধারণ লোকদের জন্য আমরা লোকসাহিত্য সৃষ্টি করিব তবে এমন জিনিস আমদানী করিব যাহাকে বিদায় করিবার জন্য দেশে ভাঙ্গা কুলা দুর্মূল্য হইয়া উঠিবে । ইহা আমাদের ক্ষমতার নাই "। .... লোকসংস্কৃতি মূলসুরটি তিনি উপলব্ধি করে স্বতঃসৃজনশীল সংস্কৃতির উৎস সম্পর্কে এরূপ উক্তি করেছেন । লক্ষ্যনীয় হল, আলোচ্য বিষয় ছাড়াও লোকসংস্কৃতির অপরাপর শাখা সম্পর্কে তার সুস্পষ্ট ধারণাকে প্রত্যক্ষভাবে কোথাও ঘটাননি । ছড়া, লোকসঙ্গীত - লোকসংস্কৃতির সব উপকরণই তিনি সংগ্রহ করেছিলেন । প্রত্যক্ষভাবে এসবের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে না গিয়ে অন্তরে গ্রহণ করেছেন এবং পরবর্তী সৃষ্টিতে এমনভাবে মিশিয়ে দিয়েছেন যা লোকসংস্কৃতির বলয় থেকে উঠে এসে উচ্চ বলয়ের সৃষ্টিরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে । অথচ অভ্যন্তরে রয়েছে লোকসংস্কৃতির প্রাণকণা । তাঁর বিভিন্ন সৃষ্টিকর্মে লোকযানের প্রত্ন প্রতিমা (Arehetype) লুকিয়ে রয়েছে, তাঁর সৃষ্টির কোন ধারা থেকেই তা বাদ পড়েনি ।

মিথ্ বা লোকপুরাণ (Myth), লোককথা (tale) রূপকথা যে নামেই ডাকা হোক্না কেন তাহল লোকসংস্কৃতির সমৃদ্ধতম শাখা । এর সংজ্ঞা নিরূপণ করে শ্রেণীবিভাজন ও বহুতর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা-সমালোচনা করেছেন লোকসংস্কৃতিবিদ্‌গণ । এসব কাল্পনিক অ্যাখ্যান যা মনোরঞ্জন ও কৌতূহল মেটানোর উপকরণ হিসাবে মানুষকে তুষ্ট করেছে, সমাজ বাস্তবতাই হল এদের অন্তর্লীন সত্তা । এরূপ কাহিনীর সূচনা যেভাবে ঘটে রবীন্দ্রনাথও একটি প্রবন্ধ লিখতে

গিয়ে অনুরূপভাবেই সূচনা করেছেন, 'রূপকথায় আছে, রাক্ষসের যাদুতে রাজকন্যা ঘুমিয়ে আছেন। যে পুরীতে আছে সে সোনারপুরী, যে পালঙ্কে শুয়েছেন সে সোনার পালঙ্ক ; সোনা মাণিকের অলঙ্কারে তাঁর গা ভরা। (পরিচয় গ্রন্থের 'সোনার কাঠি প্রবন্ধ; রবীন্দ্র রচনাবলী নবম খণ্ড ৬৩৩ পৃষ্ঠা)। 'বাংলার নবজাগরণ' এর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'বঙ্কিম আনলেন সাত সমুদ্র পারের রাজপুত্রকে আমাদের সাহিত্য রাজকন্যার পালঙ্ক শিয়রে। তিনি যেমনি ঠেকালেন সোনার কাঠি, অমনি সেই বিজয় বসন্ত, লায়লা মজনুর হাতির দাঁতে বাঁধানো পালঙ্কের উপর রাজকন্যা নড়ে উঠলেন। চলতি কালের সঙ্গে তাঁর মালাবদল হয়ে গেল। তারপর থেকে তাঁকে আর ঠেকিয়ে রাখে কে!'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ছোট গল্প বাংলা সাহিত্যের সম্পদ। প্রকৃতপক্ষে বাংলাসাহিত্যে ছোটগল্পের প্রতিষ্ঠা তো তাঁরই হাতে। সম্পত্তি সমর্পণ নামক গল্পে সঞ্চিত ধন সম্পত্তি রক্ষার জন্য যখ দেবার ঘটনা কাহিনী-কেন্দ্রে স্থাপিত। বাংলার গ্রামীণ মানুষের ধর্মীয় লোকচারকে আশ্রয় করে এই গল্প অসাধারণ জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এখানে গল্পের ঘটনা মুখ্য হলেও গল্পের প্রাণপ্রবাহে লোকজীবনের কোন বিশ্বাস্-সংস্কার যুক্ত হয়ে আছে। যক্ষ তো মিথের বিষয় কিন্তু গল্পের পাত্র পাত্রীদের কাছে মিথের পুনর্জন্ম নিষ্ঠুর বাস্তবে রূপলাভ করেছে। 'অতিথি' এমনই এক গল্প যেখানে গল্পে প্রধান চরিত্র তারাপদ মনের মুক্তির সন্ধানে রত। গল্পের আবেদন সংকীর্ণ গৃহবন্ধনে আবদ্ধ না থেকে অনন্তের মধ্যে পরি ব্যপ্ত হয়েছে। তারাপদ লোকউৎসব -লোকনাট্য-লোকনৃত্য যাত্রা পাঁচালি কথকতা-কীর্তনগান -রামায়ণের কুশলবের গান রথযাত্রা মেলার অন্তর্নিহিত সত্ত্বার মধ্যে মুক্তির সন্ধান করেছে। যেখানে তার সমগ্র সত্ত্বা 'রূপকথার সোনার কাঠির জগতে' প্রতিনিয়ত অস্থিরভাবে বিচরণরত। অনুরূপ একটি গল্পের নাম হল, 'একটি আষাঢ়ে গল্প'(রবীন্দ্র রচনাবলী/নবম/পৃঃ ৩১৪)। এটি এমন এক গল্প, যেখানে লেখায় রয়েছে লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত রূপকথার কিছু উপাদান। বাংলার রূপকথায় যেমন রাজপুত্র, বন্ধু-বনিকপুত্র, সাত সমুদ্র তের নদী পার হওয়া আর অজানা দ্বীপ রয়েছে, এ গল্পেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। অজানা দ্বীপের যারা বাসিন্দা, তারা অজ্ঞাত কারণে হারিয়েছে তাদের মনুষ্যত্ববোধ। এরকম শাপগ্রস্ত হবার ব্যাপার তো রূপকথাতে ঘটেই থাকে। লোককাহিনীতে দেখা যায় রাজপুত্র দুরুহ, দুঃসাধ্য ও কষ্টকল্পিত উপায়ে সে সব মানুষদের শাপমুক্ত করে। এরপরই তো থাকে সুখে ও আনন্দে দিনযাপনের কথা। এখানেও দেখা যাচ্ছে, সর্বসুখে কাহিনীর সমাপ্তি ঘটেছে। অবশ্য এর অভ্যন্তরে সামাজিক রূপকের দিকটিকে অবজ্ঞা করা যায় না। এ প্রসঙ্গে ডঃ ক্ষেত্র গুপ্তের একটি মন্তব্য, "একেবারে নতুন যুগের নতুন বিষয় ও রসের এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্বাদের লেখায় তিনি যখন বাংলা সাহিত্যকে ধনাঢ্য করে তুলেছিলেন তখন বাংলা লোকসাহিত্যের এই বিশেষ দিকে ফিরে তাকিয়েছেন এর দাম আছে। হয়তো তিনি আপ্রাণ বাংলা গল্পের একটি নিজস্ব রূপের সন্ধানী ছিলেন যার ভিত বাংলার লোককথা সার যোগাতে পারে।"

প্রকৃতির বুকে যখন ফসলের প্রাচুর্য, আকাশ ভরে নেমেছে বর্ষা তখন রবীন্দ্র কাব্যে ফসলের প্রাচুর্য। পণ্ডিতেরা বলেন, এই রবীন্দ্র বনস্পতি থরে থরে ফসলের সম্ভারে উপচে পড়ছে তখন। সেটি হল সোনার তরীর যুগ। কবির আত্মসম্প্রসারণ, আত্মসাক্ষাৎকারের শ্রেষ্ঠ সময়। সেসময়

কবি পরিচিত হচ্ছেন লোকসংস্কৃতি বলয়ে আবদ্ধ মানুষের অলিখিত বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে। অনুরূপ কয়েকটি কবিতা হল বিম্ববতী, রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে, নিদ্রিতা, সুপ্তোত্থিতা প্রভৃতি।

ডঃ সুকুমার সেন দেখিয়েছেন, 'বিম্ববতী' কবিতাটি গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয় সংকলিত জার্মান রূপকথা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, যে সংকলন ইংরেজীতে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। ডঃ সেন মনে করেন, কবি গল্পটির সামান্য রদবদল করে 'বিম্ববতী' কবিতায় রূপদান করেছেন। রানীর হাতে রয়েছে মায়াদর্পণ। রানী দর্পণ দেখে আপন মনে বলত,

'বলো তো মুকুর দেয়ালে খাড়া
এ চাকলায় কোন্ মেয়ে সুন্দরী বাড়া।

মায়াদর্পণ উত্তর দিত, তুমি রানী এ তল্লাটে সবার সেরা সুন্দরী। কিন্তু একদিন সদ্যোজাত এক তুষার-কন্যা হয়ে দাঁড়াল রানীর প্রতিদ্বন্দ্বীর। তুষার কন্যার সাত বছর বয়সে রানী জানতে পারলো তার থেকেও হাজার গুণ সুন্দরী ঐ তুষারকন্যা। রানীর ঈর্ষা শুরু হল। সে প্রতিহিংসা পরায়ণা হয়ে উঠল। তুষার কন্যাকে হত্যার জন্য সে চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু রানীর চেষ্টা সফল হল না।

গ্রীমের গল্পে এরপর রয়েছে বামনদের কথা, বিষাক্ত আপেল খেয়ে মৃত্যু, আপেল নিষ্কাশনে তুষার-কন্যার আবার বেঁচে উঠা এবং তার বিয়ে হল রাজপুত্রের সঙ্গে। সেই বিয়ে অনুষ্ঠানে মন্ত্রপূত জুতো পরে নাচতে গিয়ে রানীর পা পুড়ে গিয়ে তার মৃত্যু হল। কবি তাঁর কবিতায় নামকরণের পর নীচে লিখেদিলেন রূপকথা। বাংলা রূপকথার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ অবস্থান গ্রহণ করে ঈর্ষার প্রচলিত ছককে কবি কবিতায় প্রয়োগ করেছেন। সূচনায় মায়াদর্পণ বলছে —

রাজকন্যা বিম্ববতী সতীনের মেয়ে,
ধরাতলে রূপসী সে সবাকার চেয়ে,

বিষমাখা আপেল কবির কবিতায় বিষফুল মালায় রূপলাভ করেছে।
কবিতার অন্তিম স্তবকে কবি লিখেছেন —

ঘষিতে লাগিল রানী কনকমুকুর
বালু দিয়ে —প্রতিবিম্ব হইল না দূর।
মসি লেপি দিল তবু ছবি ঢাকিল না।
অগ্নি দিল তবুও তো গলিল না সোনা।
আছাড়ি ফেলিল ভূমে প্রাণপণ বলে,
ভাঙ্গিল না সে মায়াদর্পণ। ভূমি তলে
চকিতে পড়িল রানী, টুটি গেল প্রাণ —
সর্বাঙ্গে হীরকমণি অগ্নির সমান
লাগিল জ্বলিতে। ভূমে পড়ি তারি পাশে

কনক দর্পণে দুটি হাসিমুখ হাসে ।
বিম্ববতী, মহিষীর সতীনের মেয়ে
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে ।

এরকমই রূপকথা অবলম্বন করে অন্য একটি কবিতা হল 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে ।' এখানে রাজপুত্র ও রাজকন্যার পূর্বরাগের কাহিনী বিবৃত হয়েছে । রবীন্দ্রনাথ এখানে নিজস্ব কল্পনা বলয়ে সৌন্দর্যতৃপ্ত বিস্ময়ের প্রকাশ ঘটিয়েছেন, যা সোনারতরী পর্বের ফসল । কিন্তু কবিতা রচনার ক্ষেত্রে বাংলার লোকসংস্কৃতির উপকরণসমূহ, যেমন ঃ রাজপুত্র - রাজকন্যার শৈশবজাত পূর্বরাগ, সোনার পালঙ্ক, অভিজ্ঞান হিসাবে মুক্তার মালা প্রভৃতি অবশ্যই গুরুত্বহীন নয় ।

অনুরূপ একটি কবিতা হল 'সুপ্তোত্থিতা'। যেখানে রয়েছে রাজপুত্র-রাজপুকন্যার কথা । রাজপুত্র তার প্রেয়সীর সন্ধানে সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে বহু দেশ ঘুরে বেড়ায় । শেষে ঘুমন্ত পুরীর রাজকন্যাকে খুঁজে পায় । তাকেই নিজের প্রেয়সী গলায় পরিয়ে দেয় মালা ।

কবিতার পংক্তিগুলো যথাক্রমে —

(১) রাজার ছেলে ফিরেছি দেশে দেশে

সাত সমুদ্র তের নদী নদীর পার ।

(২) আমারি মতো আজি এ নিশিশেষে

ধরার মাঝে নূতন কোন্ দেশে

দুগ্ধ ফেন শয়ন করি আলা

স্বপ্ন দেখে ঘুমায় রাজবালা ।

(৩) অশ্ব চড়ি তখনি বাহিরিনু

কত যে দেশ বিদেশ হনু পার ।

(৪) সবাই যেথা অচল অচেতন

কোথাও জেগে নাইকো জনপ্রাণী ।

লোকসংস্কৃতির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে Archetype কথাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । যাকে বাংলায় প্রত্নপ্রতিমা অভিপ্রায়, কাহিনীরেণু বা চিত্রকল্পকণা বলা যায় । ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ্ ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত বলেন, যেহেতু বিভিন্ন কাহিনীরেণুর সমন্বয়ে আমাদের মগ্নচৈতন্যের স্তরে নানান লোককথার প্রতিভাস সৃষ্টি হয়, তাই কোনো মহৎস্রষ্টার সৃষ্টিলোক থেকে যদি এইসব অভিপ্রায়গুলিকে বিশ্লেষণ করে নিয়ে সেগুলির পুনঃসংশ্লেষ করলে —ঐসব কাহিনীর প্রত্ন -প্রতিমা তাঁর মনকে কেমনভাবে প্রেরণা জুগিয়েছে

তার হদিশ মেলে । তিনি বলেন, লৌকিক - অভিপ্রায় সম্বলিত রবীন্দ্র কবিতার সংখ্যা প্রায় একশত । তারই অনুসারে উল্লিখিত কবিতা তিনটির প্রত্ন -প্রতিমাগুলি নিম্ন রূপ ঃ

(১) **বিম্ববতী** --ক) নির্বাসিতা সপত্নী কন্যাকে হত্যার ব্যর্থ চেষ্টা,

খ) ঈর্ষিতা বিমাতার মৃত্যু

গ) যাদু আয়না

ঘ) রাজপুত্রের স্পর্শে মৃত কন্যার পুনর্জীবন

২) রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে —

ক) রাজপুত্র-রাজকন্যার বাল্যপ্রেম,

খ) সোনার খাট --রূপার খাট

৩) **নিদ্রিতা** -- ক) ঘুমন্ত পুরী,

খ) ঘুমন্ত সুন্দরী

গ) যাদু নিদ্রা ভঙ্গ

রবীন্দ্র সৃষ্টিতে লোকসংস্কৃতির প্রভাব শেষ পর্যন্ত বজায় ছিল । সেই প্রসঙ্গে তাঁর 'সে' গল্প সংকলনটি গুরুত্ব অপরিসীম । এর প্রকাশকাল ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ । একে ছোটগল্পের সংকলন বলা চলে । তবু এর ভাষা কখনো কখনো খামখেয়ালী প্রকৃতির । গল্পের পাত্র-পাত্রীদের কথা ও কাজ সঙ্গতিহীন । গল্পগুলিও আজগুবি ধরণের । এরাও যেন দুনিয়াছাড়া কাল্পনিক প্রাণী । এখানে কি রবীন্দ্রনাথ ছোটদের রূপকথা ব্যাপারটাকে সামনে তুলো আনতে চাইছেন ? বাংলা রূপকথার রূপ ও রীতিতে যে সম্ভবনা তাকে তিনি কাজে লাগাতে চান । যদিও একে ছোটদের জন্য বলা হচ্ছে কিন্তু পরিণত ও বয়স্ক মন ছাড়া একে উপভোগ করা সহজ নয় । উপকরণগুলো প্রাচীন, মিথের জগৎকে স্পর্শ করে ; কিন্তু এদের চয়ন ও বয়ন নতুন ।

'সে' গল্পসংকলন গ্রন্থ আলোচনা কালে অ্যান্টি-আর্ণে (Antee Aarne) প্রণীত টাইপ ইনডেক্স (Type-Index) প্রসঙ্গটি এসে পড়ে । ১৯৫৫-৫৮ সালে আর্ণে প্রণীত ছয়খণ্ডে Motif Index of Folk literature গ্রন্থগুলো প্রকাশিত হয় । একটি লোককাহিনীকে ভেঙে ব্যবচ্ছেদের পর এক বা একাধিক কাহিনী অংশ পাওয়া যাবেই । সেই কাহিনী অংশই হল সঠিক । বিশ্বের যে কোন প্রান্তের লোককাহিনীর মধ্যে মানসিক অভিপ্রায়ে মিল রয়েছে । লোককাহিনী একই সময়ে আঞ্চলিক ও বিশ্বজনীন । মোটিফ ইনডেক্স সেই মনকে ধরতে সাহায্যে করে । এর মাধ্যমেই মানব সমাজের হৃদয়ের অন্তর্নিহিত অভিন্নতা উপলব্ধি করা যাবে । ফিনল্যাণ্ড নরওয়ে আয়ারল্যাণ্ড গ্রেটব্রিটেন জার্মানী ইটালি ফ্রান্স বুলগেরিয়া সোভিয়েত রুমানিয়া আমেরিকা চীন মঙ্গোলিয়া জাপান প্রভৃতি দেশের মহান লেখকদের সৃষ্টি সম্ভারের মধ্যে মটিফ এর সন্ধান করা হয়েছে । বাংলা ভাষাতেও এ ধরণেবর কাজ কেউ কেউ শুরু করেছেন । লোকসংস্কৃতিকবিদ্ ড° দিব্যজ্যোতি মজুমদার 'সে' গল্পগ্রন্থটির টাইপ ও মোটিফের সন্ধান করেছেন।

ডঃ মজুমদার দেখিয়েছেন কি গভীরভাবে এই গল্প সংকলনটিতে লোকায়ত মানসিকতার প্রভাব পড়েছে । তিনি চৌদ্দ পরিচ্ছেদের এই গল্পসংকলনে একশত চৌষট্টিটি মোটিফ্ রেণুর

সন্ধান পেয়েছেন । একই মোটিফ্ বিভিন্ন পরিচ্ছেদে ঘুরে ফিরে এসেছে । ক্রম বিন্যাস করে তেমন ইনডেক্স সংখ্যা দাঁড়িয়েছে একানব্বইতে । কয়েকটির উদাহরণ দেওয়া যায় যেমন ঃ

১) এ. ২১.১--নারী ও পুরুষ সৃষ্টিকর্তা

২) এ. ১২৩.২.১.২--চতুর্মুখ দেবতা

৩) এ. ১২৩.৫.১ ---বহুভূজ দেবতা

৪) এ ১২৪.১ ---অগ্নিলোচন দেবতা

৫) এ. ১২৪.৭ -হস্তিমুখ দেবতা --গনেশ প্রভৃতি ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাটক গীতিনাট্য, প্রহসন রচনার মধ্য দিয়ে নাট্যরসের বিচিত্র প্রবাহ সৃষ্টি করেছিলেন । নানা বিষয়, নানা প্রকরণ নানা ভাব ও ভাবনা নিয়ে বৈচিত্র্যময়তা লাভ করেছে নাটক গুলি । ঈশ্বর মানুষ প্রকৃতি সীমা-অসীম যন্ত্রদানব নানা সমাজসমস্যা ও সামাজিক রঙ্গব্যঙ্গ ও উপস্থিত । নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ এত কিছুর পাশাপাশি অত্যন্ত সচেতনভাবে, বিশেষ সচেতনতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রামীণ মানুষের মেজাজ, রুচি, ও প্রাণসত্ত্বা উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করেছেন। তাঁর রচিত ৪৮ (আটচল্লিশ) টি নাটকে সর্বত্র বিভিন্নভাবে লোক উপকরণের ব্যবহার আমাদের বিস্মিত করে । এ প্রসঙ্গে ডঃ সনৎ কুমার মিত্র, লোকসংস্কৃতিবিদ্ এর একটি মন্তব্য এরূপ --- "মহীরুহ যত বড় হয় সে তত বেশি করে মাটির গভীর থেকে গভীরতর প্রদেশে, বহুদিকে তার শেকড় চালিয়ে দেয়, সবলে মাটি মাকে আঁকড়ে ধরে থেকে নীল আকাশ সমুদ্রে হৃদয়কে অবগাহন-স্নানে নিয়োজিত করে । মহীরুহ স্বরূপ আমাদের কবি নাট্যকারের ক্ষেত্রে এমনটিই ঘটেছে ।"

লোকসংস্কৃতি ঃ উত্তরাধিকার ঃ কবি সুকান্ত

বিষয় যদি হয় 'লোকসংস্কৃতি ঃ উত্তরাধিকার ঃ কবি সুকান্ত,' তবে পাঠক মাত্রই চমকিত হবেন, কেননা সুকান্তর সৃষ্টি ধারায় লোকউপকরণ রয়েছে কি, যা আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠতে পারে? বরং কবি বিষ্ণু দের রচনায় তাঁর দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি প্রবল আসক্তি, কবি সুধীন্দ্র দত্তর কবিতায় পুরান-চরিত্রের বা শব্দের প্রত্যক্ষ আচরণ অথবা আভিধানিক অর্থকে পরিত্যাগ করে তার থেকে পাওয়া ব্যঞ্জনার ব্যবহার, বুদ্ধদেব বসুর রচনাতেও লোকজীবনের সংস্কৃতির প্রতিভাস মেলে। তাছাড়া, জীবনবোধের অতলান্ত ব্যাপ্তি যে কবির কাব্যের ছত্রে ছত্রে ধৃত রয়েছে, তিনিও, জীবনানন্দ দাশ, বহু ভাবে ও ভাবনায়, চিন্তা ও চেতনায়, বাণীর প্রকাশনায় বার বার চলে গেছেন লোকবৃত্তের অভ্যন্তরে। রসবোদ্ধারা মনে করেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সমর সেন এমন কি সুভাষ মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত এই প্রসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন অনায়াসে।

কবি বিষ্ণু দে'র কবিতায় প্রবাদ প্রবচনের প্রসঙ্গ যেমন এসেছে, তেমনি রূপকথার মায়ালোক থেকে তিনি উপমাও সংগ্রহ করেছেন। যেমন ঃ পৌষমাস কা জনার, তাই এই ব্যাপ্ত সর্বনাশ।' প্রবাদ /এবারের বর্ষা) বড়োর প্রেম নেহাৎ বালু (প্রবাদ/ ১৯৪২,) হাঁউ খাঁউ রূপতরাসী বোলে (রূপকথা/পাস্তভূত), 'কত কন্যাকে জীয়ায় সোনার কাঠি' (রূপকথা/সূর্যমুখীর প্রাণ)। ছড়ার ব্যবহারও রয়েছে তাঁর কবিতায় এভাবে এক কন্যা রাধেঁন বাড়েন, এক কন্যে খান, খেয়ে দেয়ে বিলেতে গিয়ে জানান পেন্‌সন। (ছড়া)

কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর কাব্যগ্রন্থ গুলিতে ব্যাপকভাবে পৌরানিক চরিত্র, বিষয় এবং শব্দ কবিতার শীর্ষনামে, যেমন ঃমহাশ্বেতা, উর্বশী, যযাতি, কবিতার অভ্যন্তরে যেমন রাবন, ইন্দ্র, শিব, কালী কুবের, নারদ, ব্রহ্মার মানসপুত্র ইত্যাদির প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। তাছাড়া অসংখ্য বিষয় ও ঘটনার পরোক্ষ উল্লেখ, যেমন ঃস্মারক অঙ্গুরীয়, দক্ষযক্ষ, পরিজ্ঞাত, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার কবি তাঁর কবিতায় নির্দ্বিধায় করেছেন। আবার বুদ্ধদেব বসুর 'দ্রৌপদীর শাড়ীর অন্তহীনতার চিত্রপ্রতিমা, কবির অনুভূতিতে একটি সুস্পষ্ট তথা সুগভীর প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। দুঃশাসন দ্রৌপদীর বসন খুলে নিচ্ছে --আর অন্যদিকে কৃষ্ণ সেগুলি যোগাচ্ছেন, এই যে মিথ, তাকে কবি বুদ্ধদেব গ্রহণ করেছিলেন। কবির ভাষায় —

দুঃশাসন করিল পন
দ্রৌপ্রদীর শাড়ি ।.........
আশায় দাঁত চিবিয়ে ছোঁড়
দ্রৌপদীর শাড়ি ।......
মুষলধারে সাহস টানে
দ্রৌপদীর শাড়ি ।......
মন্ত্র-পড়া অন্তরাল

দিলনা তবু সারা
অসম্ভব দৌপদীর
অন্তহীন শাড়ি ।"

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য কি কখনো ছুঁতে চেয়েছিলেন লোকজীবনের সংস্কৃতির আঙ্গিনা ? যে কবি বৃহত্তর জনসমষ্টি অর্থাৎ শ্রমিক, কৃষকতথা সমগ্র শ্রমজীবি মানুষের অব্যক্ত বেদনা সাম্যবাদী আদর্শে প্রতিবাদের বাণীতে বাজায় করে তুলেছিলেন । কবি চেয়েছিলেন, নিপীড়িত শ্রমজীবী মানুষেরা সোচ্চার হবে অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে । মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তিনি যেমন ব্যক্তি জীবনে সংগ্রাম মুখর ছিলেন, তেমনি তাঁর সৃষ্টিতেও সেটি প্রতিভাত হয়েছে । বৃহত্তর জনমণ্ডলীর বাণীকে নাগরিক মর্জির উপর প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী কবির সৃষ্টিধারায় লোকঐতিহ্য অনুসন্ধানের প্রয়াস তাই নিতান্ত সহজ নয় । আবার এটাও সত্য যে, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত লৌকিক কৃষ্টির অনুভাবনায় তিনি প্রবুদ্ধ হননি বললেই চলে । গণজীবনের সুখদুঃখের ভাবনায় ভাবিত কবি কিন্তু নাগরিক ও বুদ্ধিজীবী সুলভ মানসিকতা দিয়ে তাঁর কবিতায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন । কিন্তু আশ্চর্য হল, বৃহত্তর লোকজীবনবৃত্তের সংস্কৃতিকে কাব্যের উপাদান করার বিষয়টিকে তিনি তাঁর মানসিকতা ও মননে স্থান না দিলেও, তাঁর অবচেতন মনে লোকজীবনের সংস্কৃতির প্রতিভাস কোন না কোন ভাবে তাঁর সৃষ্টিতে স্থান করে নিয়েছে । প্রকৃতপক্ষে, প্রতিটি মানুষ যে সাংস্কৃতিক বলয়ে জন্মগ্রহণ করে তা যতই ঋদ্ধ হোক না কেন, লোকসংস্কৃতির প্রভাব সেখানে থাকবেই যা মানুষের রক্তকণিকায় মিশে যায় এবং আজীবন তাকে প্রভাবিত করে । কবিদের ক্ষেত্রে এই প্রভাব আরো বেশি প্রসারিত এবং গভীরশায়ী । তাই লোকসংস্কৃতির কোন উপকরণকে তাঁর কাব্যে তথা সৃষ্টিতে স্থান প্রদান সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন তিনি, একথাও বলা চলে না । বরং কোন কোন ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে তাঁর সচেতনতা আমাদের বিস্মিত করে ।

এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়, কবি সুকান্ত কবিতা রচনা করার ক্ষেত্রে নিজস্ব Poetic Diction (কবি ভাষার) সৃষ্টি করেছিলেন । অল্প লিখেও কবি এই কৃতিত্বের অধিকারী । কিন্তু রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি থেকে বা বিভিন্ন পুরান থেকে চরিত্র গ্রহণ করে, ভাবনা সঞ্চারী বাক্য প্রয়োগ করে, রূপকথার অনুসঙ্গ ব্যবহার করে কাব্য ভাবনায় লাবণ্য সৃষ্টি করেছেন, যা প্রকারান্তরে হয়ে উঠেছে লোকসংস্কৃতির বিষয়ভাবনার পরিচায়ক । এই পর্যায়ে কবিতায় ব্যবহৃত শব্দ ও বাক্যের আলোচনার মাধ্যমে কবির লোকায়ত ঐতিহ্য ভাবনার পরিচয় তুলে ধরা যেতে পারে ।

কবি সুকান্তর 'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থের 'বোধন' কবিতাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যাক। এখানে কবি বলেছেন —

'লোভের মাথায় পদাঘাত হানো —
আনো রক্তের ভাগীরথী আনো
দৈত্য রাজের যত অনুচর'........

তারপরই কবি বলেছেন

তোমার ফসল তোমার মাটি
তাদের জীয়ন ও মরণ কাঠি

তোমার চেতনা চালিত হাতে ।..........

কিংবা,

স্বদেশ প্রেমের ব্যাঙ্গমা পাখি
মারণযন্ত্র বলে শোনো তা কি ?

এখানে যথাক্রমে ভাগীরথী, দৈত্যরাজ, জীয়ন ও মরণ কাঠি, ব্যাঙ্গমা পাখি, মারণযন্ত্র প্রভৃতি শব্দগুলো প্রয়োগের ফলে এটাই প্রমাণিত হয় যে, কবি লোকায়ত ঐতিহ্যের জগতে অনুপ্রবেশ করছেন । দৈব-দৈত্যের দ্বন্দ্ব ভারতীয় লোকপুরানের বহুচর্চিত বিষয় । 'ভগীরথ' একটি পুরাণ চরিত্র, যিনি গঙ্গাকে মহাদেবের জটাজাল থেকে মুক্ত করে মর্ত্যভূমিতে প্রবাহিত করিয়েছিলেন । জীয়ন কাঠি ও মরণ কাঠি শুধুমাত্র বাংলার লোককথায় (Tale) নয়, পৃথিবীব্যাপী প্রচলিত বিভিন্ন লোককথায় কোন না কোনভাবে এটি ব্যবহৃত হয় । আন্তর্জাতিক সূচক অনুসারে আলোচ্য কাহিনী অনুগুলি বিন্যস্ত করলে পাওয়া যায় ঃ

প্রকরণ-উপজীব্য	টাইপ	সূচক সংখ্যা (Motif Index)
জীয়নকাঠি-মরণকাঠি	মৃত	ই. ৬৪.১.১
ব্যাঙ্গমা পাকি	জীবনজনও (সত্যদ্রষ্টা পাখি)	বি. ১৩১.
মারণ যন্ত্র	ঐন্দ্রজালিকতা /যাদু	ডি. ৯০০.

'ছাড়পত্র' কাব্যের 'খবর' ও 'এই নবান্নে' কবিতা দুটির দুটি পংক্তির উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে । যথা ঃ (১) কে আর মনে রাখে নবান্নের দিনে কাটা ধানের গুচ্ছকে ? (খবর) (২) পৌষ পার্বণে প্রাণ কোলাহলে ভরবে গ্রামের নীরব শ্মশান।' (এই নবান্নে)

উদ্ধৃত পংক্তি দুটিতে 'নবান্ন' ও 'পৌষপার্বণ' বাঙ্গালী জীবনের গুরুত্বপূর্ণ লোক-উৎসব । কৃষি-সভ্যতা পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ফসল আগমনের সম্পর্কযুক্ত অনুষ্ঠানের আনন্দে মত্ত হয়। বাঙ্গালী জীবনে অনুরূপ দুটি শষ্য কেন্দ্রিক তথা উর্বরতা কেন্দ্রিক উৎসব হল নবান্ন পৌষপার্বণ। আবার দু'টির মধ্যে সময়ের দূরত্ব থাকলেও পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এই দুটি উৎসব ।

'ডাক' কবিতায় কবি একটি ক্রীড়া প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন । আবার ক্রীড়া প্রসঙ্গ যখন এল তখন 'মিঠে কড়া' কাব্য গ্রন্থের 'আজব লড়াই' কবিতার একটি পঙক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে।

(১) শেষ করব এ রক্তের হোলি খেলা (ডাক)
(২) ডাংগুলি খেলা নয়, গুলির সঙ্গে খেলা (আজব লড়াই)

আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যায়, ফাল্গুন মাসের দোল বা হোলি সারা দেশের একটি উৎসব । এই উৎসবের সঙ্গে পৌরাণিক প্রসঙ্গ যুক্ত করে একটি ধর্মীয় আবরণ দেয়া হয়েছে । হোলি

আদিতে কৃষি সমাজের পূজা ছিল । ভাল শষ্য উৎপাদনের কামনায় নরবলি ও নৃত্যগীত ছিল এই পূজা ও উৎসবের অঙ্গ । এরপর ক্রমে নরবলি পশুবলিতে রূপলাভ করে এবং হোমযজ্ঞ এর অঙ্গীভূত হয় । কিন্তু হোলির সঙ্গে প্রধানত ঃ যে উৎসবের যোগ তা বস্তু বা মদন বা কামোৎসবের। কবি এখানে রক্তের হোলি খেলা' যে বিশেষ প্রসঙ্গে এনেছেন, তা প্রকারান্তরে আদিম নিষ্ঠুর নরহত্যার অনুষঙ্গ বহন করে পঙক্তিকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে ।

অধুনা বিলুপ্ত একটি লোকক্রীড়া হল 'ডাংগুলি খেলা'। এক দেড়হাত লম্বা গাছের ডালের একটি লাঠি --এর নাম হল ডাং । এই ডাঙ্গেরই সমান ব্যাস বিশিষ্ট ইঞ্চি চারেক লম্বা একটি ডালের টুকরো এর নাম গুটি বা গুলি । দুয়ে মিলে ডাং গুলি খেলা । একজন খেলোয়াড় একটি ছোট লম্বা ধরণের গর্ত থেকে ডাং দিয়ে খোঁচা মেরে গুলিকে দূরে পাঠাবে । বিপক্ষ খেলোয়াড় 'গুলি' মাটিতে পড়ার আগে লুফে নিতে পারলে দান ছেড়ে দিতে হবে । আর যদি গুলি দূরে গিয়ে পড়ে তবে ডাং দিয়ে গুলি থেকে গর্ত পর্যন্ত দূরত্ব খেলোয়াড় মাপবে । এই মাপের যার দূরত্ব বেশী, সে জয়ী হবে ।এই মাপে জন্য যে শব্দ প্রযুক্ত হয় তা হল, গায়্যা, দুইয়া, তেনা, চারা, পাঞ্জা, চৈল, বৈল, কদম, গুট । কোথাও আবার সাত বেজোড় সংখ্যার মাপ রয়েছে । এই শব্দ বা সংখ্যা গুলো কি আদিম জাতি কৌমগুলি গণনার একক ? ডাংগুলির সঙ্গে কি আধুনিক ক্রিকেটের কোন সাদৃশ্য রয়েছে ? নতত্ত্ববিদেরা মনে করেন, কবি সুকান্ত 'আজব লড়াই' কবিতায় ডাংগুলি খেলাকে গুলির সঙ্গে খেলব অর্থাৎ মৃত্যুর বিরুদ্ধে লড়াই এর প্রতি তুলনায় ব্যবহার করেছেন । যেখানে ডাংগুলি নিছকই সামান্য বিষয় হিসেবে প্রতিপন্ন হয়েছে ।

সূচনা ('ঘুম নেই') কবিতাটিতে রামায়ণের সুখ্যাত অহল্যা চরিত্রটিকে কবি সচেতনভাবে স্থান দিয়েছেন । অহল্যাকে কেন্দ্র করেই কবিতাটির সূচনা, অগ্রগতি ও পরিণতি । সঙ্গত কারণেই 'রাম' নামটিও কবিতার পংক্তিতে স্থান লাভ করেছে । লক্ষ্মনীয় যে 'অহল্যা' পদটি কবিতায় সাতবার ব্যবহার করেছেন কবি । যা অন্য কোন কবিতার ক্ষেত্রে ঘটেনি । দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে, গুরুপত্নী হয়েও অবৈধ সংসর্গে লিপ্ত হবার কারণে স্বামী দেবর্ষি গৌতমের অভিশাপে দেবী অহল্যা পাথরে পরিনত হয়েছিলেন ।তাকে মুক্তির জন্য শ্রীরামচন্দ্রের আগমনকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল । তাঁর পাদস্পর্শে পাষাণ অহল্যার মুক্তি ঘটেছিল । সমাজতাত্ত্বিকেরা অবশ্য একে ভিন্ন দৃষ্টি ভঙ্গীতে বিচার করে থাকেন । রামায়ণ লোকপুরাণ সৃষ্টির কাল হল কৃষিসভ্যতা পত্তনের কাল । শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন কৃষিসভ্যতার পৃষ্টপোষক । সমকালীন জনক রাজাকেও তাই জমিতে হাল কর্ষনে রত দেখা যায় । শ্রীরামচন্দ্র দক্ষিণ ভারতভূমির অহল্যা তথা বন্ধ্যা মাটিতে কৃষি সভ্যতার সূচনা ঘটিয়েছিলেন । কবি সুকান্ত এই কবিতায় অহল্যা পৌরাণিক চরিত্রটির সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন । তাছাড়া মাটিকে মা সম্বোধন করার মধ্যে 'সর্বপ্রাণবাদ' (animism) এব ধারণার প্রয়োগ করেছেন কবি । 'কৃষকের গান' কবিতায় (ছাড়পত্র) 'এ মাটির গর্ভে আজ আমি ....' প্রভৃতি পংক্তি অনুরূপ ভাবনার দ্যোতনাবাহী ।

'চিরদিনের' কবিতাটির কয়েকটি পংক্তির উল্লেখ করা যেতে পারে । কবি বলেছেন ঃ

গোয়ালে পাঠায় ইশারা ....
রাত্রি এখানে স্বাগত সান্ধ্য শাঁখে

কিষাণকে ঘরে পাঠায় যে আলপথ ;
বুড়ো বটতলা প রস্পরকে ডাকে
সন্ধ্যা সেখানে জড়ো করে জনমত । .....
কৃষক বধূরা ঢেঁকিকে নাচায় পায়ে
প্রতি সন্ধ্যায় দীপ জ্বলে ঘরে ঘরে ।

কৃষকের বাড়িতে গোয়াল থাকে, সেখানে গরু বাঁধা হয় । গোয়াল হল 'লোক ভাষা'। গ্রামের বটতলা, যেখানে প্রতি রাতে বসত সান্ধ্য আসর, আজ তা আর দৃশ্যমান নয় । সেখানে লোকসঙ্গীত, কীর্তন, পালাগান যে হতনা তা নয় । আবার কোন চাষী বা গ্রামবাসীরা সমস্যার সমাধানে বসত লোক আদালত । ঢেঁকি বাংলার লোকজীবনে ব্যবহৃত একটি যন্ত্র যা লোকশিল্পীদের হাতে তৈরী হত । এর সাহায্যে ধান থেকে চাল করা হয়। মেয়েরা ঢেঁকির একদিকে পা লাগায় । অন্যদিকে গোলার সামনে বসে থাকা একজন মহিলা, গোলার নীচে রাখা ধান উল্টে-পাল্টে দেয় । গোলার ক্রমাগত আঘাতে ধান ক্রমশঃ চালে পরিণত হয় । ভারতীয় পুরানে দেখা যায়, নারদ মুনিবর ঢেঁকি অবলম্বন করে শূন্যে বা স্বর্গ-মর্ত্য - পাতালের যত্র-তত্র ভ্রমন করতেন । বক্তব্যের সমর্থনে কবিও দেবতাদের ভয়' শীর্ষক রম্য রচনায় একটি উক্তি করেছেন । এখানে নারদ বলছেন ঃ 'নারদ ঃ তথাস্তুর । আমার ঢেঁকিত তৈরী আছে । 'সন্ধ্যাবেলা দীপ জ্বালানো, উলুধ্বনি প্রদানের রীতি বা সংস্কার এখনো বংলার ঘরে বজায় রয়েছে । কবি সুকান্ত সাম্যবাদী চেতনার বাণী প্রকাশ করার অবকাশে কখনো কখনো পাঠককে লোকবৃত্তের অভ্যন্তরেও নিয়ে যেতে চেয়েছেন ।

'পঁচিশে বৈশাখের উদ্দেশ্যে' কবিতাটি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করেই নিবেদিত হয়েছে । আবার কবি তাঁর নিজস্ব ভাবনা বৃত্তের মাধ্যমে লাঞ্ছিত মানবতাকে তুলে ধরেছেন, সাম্যবাদী চেতনার জয়গান গীত হয়েছে । কিন্তু এখানেও কি কবি লোকসংস্কৃতি বলয়কে স্পর্শ না করে থাকতে পেরেছেন ? কবি বলেছেন ঃ

'আমি দিব্যচক্ষে দেখি অনাগত সে রবীন্দ্রনাথ ঃ'

'দিব্যচক্ষু' উচ্চারণমাত্র অনুষঙ্গ বাহিত হয়ে পাঠক উপনীত হন লোকপুরানের (Myth) আঙ্গিনায় । দেবদেবীদের দিব্যচক্ষুর অধিকারী হওয়া একটি স্বাভাবিক ঘটনা । মহাভারতের যুদ্ধ ঘটনার বর্ণনাকারী সঞ্জয় দেবতার বরে দিব্যচক্ষুর অধিকারী হয়ে ছিলেন । এ কবিতাতেই কবির আরেকটি পঙক্তি ঃ

'রামরাবনের যুদ্ধে বিক্ষত ভারত জটায়ু' ।

পরস্পর যুযুধান রাম- রাবন কবির দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন হলেও নিম্নবর্গের জটায়ুকে ক্ষত-বিক্ষত ভারতের প্রতিভূ হিসাবে তিনি তুলে ধরেছেন । আবার রামায়ণের একটি বিশেষ দৃশ্যও আমাদের মগ্ন চৈতন্যে পুরানের (Nature Myth) ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে । জটায়ু পাখি তার ডানা প্রসারিত করে সীতা অপহরণকারী রাবণকে বাধা প্রদান করলেও তার প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছিল ।

জটায়ু আসন্ন ভয়ংকর সংঘর্ষ উপলব্ধি করে নিজের জীবনের বিনিময়ে তাকে বাধা দিতে চেষ্টা করেছিল। তার সে প্রয়াস সফল হয়নি --রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পরই তা সমাপ্ত হয়েছিল। 'চিরদিনের শীর্ষক কবিতার দুটি পঙ্ক্তির উল্লেখ করা আবশ্যক। কবি লিখেছেন,

'রাত্রি হলেই দাওয়ার অন্ধকারে
ঠাকুমা গল্প শোনায় যে নাতনীকে,

কাহিনী কথকেরা প্রাক্ ইতিহাসের কাল থেকে শ্রোতাদের কাহিনা পরিবেশনের দায়িত্ব পালন করে এসেছে। মানুষ যখন লেখার যুগে পদার্পন করেনি, তখন কাহিনী কথকেরা স্মৃতি নির্ভর করেই কাহিনী পরিবেশন করেছে। কবির কল্পনায় হয়তো সেই অতীতের চিত্রই ধরা পড়েছে, যখন প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের সহায়ক তেলের অভাবে সুদীর্ঘকাল অন্ধকারে বসেই গল্প কথকদের কাহিনী পরিবেশন করতে হয়েছে।

'মদ্য' একটি বিশেষ পানীয়, আদিতে যা ঘরেই তৈরী হত। মদ্য এখন অনভিজাত, অভিজাত অনেকের কাছেই বিশেষ পানীয় হিসাবে মর্যাদা পায়। কোন কোন উপজাতি সমানে 'মদ্য' যে কোন শুভ অনুষ্ঠানে পরিবেশনের রীতি আছে। এটি একটি লোক পানীয়। পুরাণের যুগেও সোমরস পান করতেন মুনিঋষিরা। কবি কয়েকটি কবিতায় বিভিন্ন পংক্তিতে এই লোক পানীয়ের কথা বলেছেন।

১) আনমনা জানা পথ চলতে /পাই নাকো মাদকের গন্ধ। (বৈশম্পায়ন)
২) দুহাতে তীব্র সোনার মতন মদ, / যে সোনার মদ পান করে ধানক্ষেত (রৌদ্রের গান।
৩) গন্ধ এনেছে তীব্র নেশায়, ফেনিল মদির, (আলো অন্ধকার)

সংসার সম্পর্কে উদাসীন মানুষেরা গৃহত্যাগী হন --তাদের কাছে বিলাসিতা এমন কি বস্ত্র ধারণ পর্যন্ত বাহ্য বলে মনে হয়। শুধুমাত্র একখণ্ড বস্ত্র ধাবণ করেন তারা, যাকে বলা হয় 'কৌপীন'। কবি একটি কবিতায় লিখেছেন, 'তাই ভাবি আজ তবে আমি খুঁজে নেব কৌপীন' (মীমাংসা) বাউল সম্প্রদায়ের মানুষেরা মানবজীবন ও মানব দেহকে তাদের সাধনার মূল আশ্রয় মনে করে থাকেন। তারা দেবদেবীদের অস্তিত্ব অপেক্ষা মানুষে দেহভাণ্ডকে অধিকরতর গুরুত্ব প্রদান করে থাকেন তারা বিশ্বাস করেন, মনের মানুষ বা সাঁই আছেন দেহ খাঁচার ভিতর, ঠিক 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখির' মতো। কবি লিখেছেন ---আজ বাউল বেশে /ঘুচাব মনের ভুল নয়ন জলে,' (গীত গুচ্ছ) 'ঘুম নেই' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত মীমাংসা কবিতাটি পাঠে পাঠক চলে যান রূপকথার জগতে, যেখানে বন্দিনী রাজকুমারী আসবে সাতসমুদ্র তের নদী পার হয়ে। যদিও কবিতার বিষয় ও ভাব (অপরাপর কবিতার মতোই) ভিন্ন খাতে গড়িয়ে গেছে। কিন্তু সুকান্তের এসব লোক উপকরণ থেকে আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি কবি লোকজীবনের সংস্কৃতি সম্পর্কে উদাসীন বা নিতান্ত অজ্ঞ ছিলেন না। তাঁর কয়েকটি কবিতার পংক্তি এরূপ ঃ

আজকে হঠাৎ সাত সমুদ্র তের নদী
পার হতে সাধ জাগে মনে,

হায়, তবু যদি
পক্ষপাতের বালাই না নিয়ে পক্ষীরাজ ....
আর আমি বুঝি দৈত্য দলনে সাগরপার
হতাম; দানবের দায়ে সব আঁধার ।
মত্ত যেখানে দৈত্যে দৈত্যে বিবাদ ভারী ঃ
হানাহানি নিয়ে সুন্দরী এক রাজকুমারী ।

রূপকথার জগতে কবির অনুপ্রবেশ এবং রূপকথার উপকরণ, কবি বিশ্বস্ত ভাবে ব্যবহার করেছেনে। এই কবিতাতেও কবি সাম্যবাদী আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করেছেন সত্য কিন্তু লোককথা এখানে বাহন হয়ে উঠেছে । এই কবিতার অন্য দুটি পংক্তি ঃ

আমি একজন লুপ্তগর্ব রাজার তনয় ....
তাও হ'ত তবে পক্ষীরাজের অভাবভারী ।

কবি উল্লিখিত পংক্তি গুলিতে কয়েকটি আন্তর্জাতিক মোটিফ্ রয়েছে। সেগুলি বিন্যস্ত করা যায় এভাবে ঃ

প্রকরণ উপজীব্য	টাইপ	মোটিফ্
সাত সমুদ্র তের নদী	শিকলি মটিফ	কোড ৭১.৫.
পক্ষীরাজ ঘোড়া	জীবজন্তু	বি. ৪১.২
দৈত্য নিহত হল	রাক্ষস ও দৈত্য	পি. ৫১২.১
রাজকন্যাকে রাক্ষস	বন্দীত্ব এবং	আর ১১.১
অপহরণ করে	নির্বাসন	আর ১১.১

'পূর্বাভাস' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত পরিবেশন' কবিতার কয়েকটি পংক্তি এরূপ ঃ

'জড়ভরতের দল বসে আছে পার্কের বেঞ্চিতে,
পবিত্র জাহ্নবী তীরে প্রার্থী যত বেকার যুবক ।

এখানে জড়ভরত একটি পৌরাণিক চরিত্র, যিনি বাণপ্রস্থে গিয়েও হরিন ছানার প্রতি স্নেহের আকর্ষণে বাধা পড়েন । মৃত্যুকালেও হরিণছানার চিন্তা করতে করতে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল । পরবর্তী জন্মে সংসার-মায়া কাটানোর জন্য এবং ঈশ্বর সাধনার জন্য জড়ের মত থাকতেন । ''জাহ্নবী' শব্দটি গঙ্গাদেবীর পৌরাণিক অনুসঙ্গ বহন করে আনে । এই কবিতারই শেষ পংক্তি দুটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

সুপ্রাচীন গুরুভক্তি আজো আনে উন্মত্ত লালসা ।.....
রাম আর রাবণের উভয়েরই হাতে তীক্ষ্ণকশা ।

এখানে 'সুপ্রাচীন গুরুভক্তি' হয়তো আরুনির গুরুভক্তি বা একলব্যর গুরুভক্তির স্মৃতিবাহিত হয়ে কবির মনে স্থান গ্রহণ করেছে ।

'অভিযান' (পৃঃ ১৯৭) রম্যনাটিকাটিতে পুরানের অনুষঙ্গবাহী চরিত্র গুলি তির্যক প্রতিভাসরূপে ব্যবহৃত হয়েছে । কখনো কখনো আবার চরিত্রগুলোর সংলাপে লোকবৃত্তের উদ্ভাস আমরা প্রত্যক্ষ করি। এখানে যে চরিত্রগুলো কবি অঙ্কন করেছেন, সেগুলো হল উদয়ন, ইন্দ্রসেন (ইন্দ্র'র সঙ্গে সেন যুক্ত হয়েছে) তাছাড়া স্থাননাম বৈজয়ন্ত বললে 'এক যে ছিল জাতীয়' রূপকথার রাজত্বে উপনীত হতে হয় ।

'সূর্যপ্রণাম' (উদয়াচল) শিরোনামাঙ্কিত সুদীর্ঘ কবিতায় নামকরণ স্মরনাতীত কালের লোকবৃত্তের ব্যঞ্জনা বহন করে আনে । আবার স্মরনাতীত কালের লোকবৃত্তের প্রত্যক্ষ উদ্ভাস পরিলক্ষিত হয়। পর্বগুলি যথাক্রমে --আগমনী, আবির্ভাব, বরণ, মঙ্গলাচরণ, মিনতি, শেষ মিনতি, বিদায় । সূর্য প্রণাম হিন্দুধর্মের দেববন্দনার রীতিতে বিনস্ত করা ও অন্যান্য লোকবৃত্তের অনুষঙ্গ কবিতার রয়েছে । কবিতার কয়েকটি পংক্তির উদ্ধৃতি নিম্নরূপ ঃ

১) তিমির ভেদি ভুবন-মোহন আলোর রেশে,
২) নৃত্যে কাঁপুকে চিত্ত মোদের নটরাজোর নর্তনে
৩) পিলু বারোয়োঁর সুর তখনও রজনীগন্ধার বনে,
৪) সেই ধূ ধূ করা তেপান্তরের মাঠ,
৫) রামধনু রথে /বিদায়ের পথে /আসছে বেগে,
৬) ঝুলন পূর্ণিমাতে নীরব নিঠুর মরণ সাথে -
৭) রথের সাতটি ঘোড়া উঠল / হ্রেষা রবে চঞ্চল হয়ে,

'হরতাল' গল্প সংকলনের অন্তর্গত 'লেজের কাহিনী' সোভিয়েত লোককথা (Tale) এর অনুবাদ । এখানে স্পষ্টতঃই সুকান্ত লোকসংস্কৃতির জগতে সরাসরি অনু প্রবেশ করেছেন । 'দেবতার ভয়' গল্পে লোকবৃত্তের তির্যক প্রতিভাস পরিলক্ষিত হয় সত্য, কিন্তু লোকপুরাণের উপকরণ কবি এখানে গ্রহণ করেছেন । ইন্দ্র, ব্রক্ষ্মা, নারদ, অগ্নি, বরুণ, পবন, মহাদেব, বিষ্ণু প্রমুখ দেবতা চরিত্র তথা বিষ্ণুর বিশেষ অবস্থানের কথা কবি বলেছেন, যার দ্বারা কবির ঐতিহ্য প্রীতির পরিচয় মেলে । 'অপ্রচলিত রচনার 'ব্যর্থতা' কবিতার দিকে দৃষ্টি ফেরালে কয়েকটি পংক্তিতে লোকবৃত্তের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় ।

১) পক্ষপাতের বালাই না নিয়ে পক্ষীরাজ
২) তা হলে না হয় আকাশ বিহার হত সফল
৩) জনারণ্যে কি রাজকন্যার নেই কো ঠাঁই ?
৪) হে রাজকন্যা, দৈত্যপুরীতে বন্দী থেকে
৫) দৈত্যশালায় পাথরের ঘর, পালক খাট
৬) সোনার শিকল নেই, আমাদের মুক্ত আকাশ
৭) সোনার কাঠির সোনা নেই, আছে ধানের গোলা,

কবি সুকান্ত তাঁর বিভিন্ন কবিতায় প্রবাদ- প্রবচনের ব্যবহার ঘটিয়েছেন । এতে অবশ্য কবি

স্বাধীনতা প্রদর্শন করেছেন। এসব প্রবাদ প্রবচন বাংলায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তবে এখানে কবির নিজস্বতাও রয়েছে।

১) দেব প্রেম আর পাব কলসীর কানা (বিক্ষোভ)
২) আকাশের সাথে প্রণয়ের কথা (গীতিমালা, ১৮ নং গীত)
৩) ঘরে আমার চাল বাড়ন্ত (খাদ্য সমস্যার সমাধান)
৪) বাঘের উপর দেয়া হল /ছাগল পালনের কথা (অভিযান)
৫) চোরের পকেট কাটা সাক্ষী, /বলছ বৃহৎ বৃহৎ বাক্য (ঐ)
৬) কাটিসনে কুমীরের খাল (ঐ)
৭) শক্তের ভক্ত (বুদ্বুদমাত্র)
৮) নৃত্যে মোদের চিত্ত কাঁপুক, নটরাজের নর্তনে (সূর্যপ্রণাম)
৯) পৃথিবী উন্মত্ত যবে তুমি এলে সেজে (ঐ)
১০) পিলু বারোয়াঁর সুর তখনও রজনীগন্ধার বনে (ঐ)
১১) আঁধার যেন দৈত্যসম আসছে বেগে (ঐ)
১২) রামধনু রথে /বিদায়ের পথে/ উঠিল যেতে (ঐ)
১৩) সবুরে মেওয়া ফল দাতাস্ (পত্রগুচ্ছ)
১৪) চোখে বিশেষ এক ধরণের ফুল দেখা (চোখে সরষে ফুল দেখা) (ঐ)

এছাড়া লোকপ্রভাবিত উল্লেখযোগ্য কিছু পংক্তি নিম্নরূপ ঃ

১) কালির কলঙ্ক চিহ্ন রেখে দেবে মুখে
২) সামনে দাঁড়ায়ে মৃত্যু কালাপাহাড়
৩) ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়
৪) ক্লীবতার কাছে নেই ঋণ
৫) প্রলয় সুরে নাট্যশালা ভরিয়ে তোলে গানে
৬) দরদে তারার চোখ কাঁপে মিটিমিটি
৭) তোমার রথের সাতটি ঘোড়া উঠল হ্রেষারবে

কোন ধর্মীয় গণ্ডী কবির কাছে অনাকাঙ্খিত ছিল। এক চিঠিতে কবি তাঁর বন্ধু অরুনাচল বসুকে লিখেছেন "কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় দেখলাম, যা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ছাত্র নিবাস মূলক বিশ্ববিদ্যালয়। আর দেখলাম গান্ধীজি পরিকল্পিত ভারতমাতার মন্দির। দুটোতেই ভালালাগার অনেক কিছু থাকা সত্ত্বে ধর্মের লেবেল আঁটা বলে বিশেষ ভাল লাগল না। (চিঠিপত্র, ২০/১১/১৯৪৪)। আবার কবির বন্ধুবর অরুনাচল বসুকে লিখিত প্রথম পত্রটির (২৪ পৌষ, ৪৮) শীর্ষে লেখা রয়েছে 'শ্রীরুদ্রশরণম'। বন্ধুরকে লেখা (জুন, ১৯৪১) অপর পত্রে সৎসঙ্গ শরনম্ ও বন্ধুকে সম্বোধন রয়েছে "শ্রী শ্রী ১০৮ অর্নবস্বামী গুরুজী মহারাজ সমীপেষু"। পাদটীকায় যদিও বলা হয়েছে, 'শ্রী অর্নব' অরুনাচলের তৎকালীন ছদ্মনাম স্বামী গুরুমহারাজ পদবী সংযোজন হিন্দু সংস্কারের প্রতি কবির পরিচিতি অপেক্ষাও তাঁর হাস্যরস সৃষ্টির অনায়াস দক্ষতার কথাই

আমাদের মনে করিয়ে দেয় । এই পর্বেই নিজেকে তিনি বলেছেন, 'দাসানুদাস সেবক'।

কবিতা রচনার শুরু থেকেই কবির লেখনী থেকে আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতে জ্বলন্ত লাভা সদৃশ বাণী নির্গত হচ্ছিল ।

কবি বলেছেন ঃ

'যে শিশু ভূমিষ্ঠ হল আজ রাত্রে
তার মুখে খবর পেলুম ঃ
সে পেয়েছে ছাড়পত্র এক,
নতুন বিশ্বের দ্বারে তাই ব্যক্ত করে অধিকার
জন্মমাত্র সুতীব্র চিৎকারে ।'

প্রতিবাদের বাণী যেভাবেই বাঙ্ময় হয়ে উঠুক না কেন, চোখের সামনে যে নিপীড়িত মানুষেরা, সেই বৃহত্তর জনমণ্ডলীর সংস্কৃতির জগৎকে কবি তাই বর্জন করতে পারেননি চিরতরে । যে কারণে কোন না কোন ভাবে সে সব লোক উপাদান কাব্য ধারায়, রম্যনাট্য, পত্রাদিতে স্থান লাভ করেছে । লোক উপাদান সমূহ, যেগুলি কবির কবিতায় স্থান পেয়েছে, তার একটি তালিকা প্রস্তুত করা যেতে পারে ।

লোকসংস্কৃতির পর্ব /উপপর্ব	ব্যবহৃত উপকরণ সমূহ
লোকপানীয়	মদিরা
লোকবেশ	কৌপিন, বাউলবেশ
লোকবাদ্য	ঢাক, ডঙ্কা, পাঞ্চজন্য ধ্বনি (শঙ্খধ্বনি)
লোকক্রীড়া	হোলি খেলা, ডাংগুলি খেলা
লোকগীত	ছাদ-পেটানোর গান
লোকযাদু	দিব্য কথা, মারণচন্দ্র, জীয়নকাঠি-মরণকাঠি, যাদুদণ্ড, মন্ত্র, আলৌকিক গান
লোক যন্ত্র	ঢেঁকি, লাঙ্গল, হাতুড়ি, কাস্তে, ছুরি, কুঠার, শক্তিশেল (বান) হাঁড়িকাঠ
অনুষ্ঠান বিষয়ক ও অন্যান্য	নবান্নের দিনে, পৌষপার্বণ, আগমনী, বরণ, মঙ্গলাচরন, ঝুলন-পূর্নিমা, বানপ্রস্থ, বটতলা সান্ধ্য আসর,
লোক শব্দ	দেওয়ালির, দীপান্বিত, ফল্গুস্নান, গোয়াল
লোকসংস্কার	সন্ধ্যায় দীপ জ্বলে, মঙ্গলঘট (স্থাপন),
লোক প্রভাবিত প্রসঙ্গ	মৃত্যুর সমুদ্র, বৈশাখঝড়, অমরাবতী, মুক্তির শ্যামল তীর, সংসার সিন্ধু বজ্র সৃষ্টির উৎসব, নির্জন হাট, বিষকন্যা মহাকাল, শ্মশান ক্রন্দন, শ্মশানের চিতা,

অলৌকিক গান, সুপ্রাচীন গুরুভক্তি, বৈরাগ্যের ভান,
ভিক্ষার ঝুলি, সুধার পাত্র, রামধনু, কলির সন্ধ্যা,
জ্যোতিষ শাস্ত্র, স্বর্গ, মুখীপুড়ী, দুধের ছেলে, সংসার
সিন্ধু, মৃত্যু কালাপাহাড়, এচোঁড় পাকা, পূজা পদ্ধতি,
আলোয়া-যৌবন, নারদের ঢেঁকি, তথাস্তু

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য মার্ক্সবাদী আদর্শকে সামনে রেখে কাব্য রচনা করেছেন। মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কবির ভানভাবনা কবিতার বিষয়বস্তু। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ফ্যাসীবাদীদের চরম তাণ্ডব ও আগ্রাসনলীলা, সাম্রাজ্যবাদীদের শোষন প্রক্রিয়া, দেশে দাঙ্গা, মন্বন্তর, মানুষের আর্ত হাহাকার কবি সুকান্ত বেদনার সঙ্গে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি গভীর আত্মপ্রত্যয় নিয়ে চরম অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছিসেন। তাঁর কাব্যের গতিপ্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যাবে, কাব্য ভাবনা বাঁকের মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। লোকসংস্কৃতির জগৎ কবির মননে অধিকতর স্থান দখল করছিল ক্রমশঃ। (কবিতা রচনার কোন কোন তারিখ কবিতার সঙ্গে যুক্ত নেই। তাই রচনাবলীতে ধারাবাহিক বিন্যাসকে লক্ষ্য রেখেই এ মন্তব্য করা গেল)। বিভিন্ন পৌরাণিক বিষয়ও ঘটনার পরোক্ষ উল্লেখ (allusilon) সুকান্তের ঐতিহ্যপ্রীতিকে আমাদের সামনে তুলে ধরে। Passion and lyric এর মধ্যে সুসাম্য স্থাপনের দক্ষতা যে সুকান্তের ছিল তা সুকান্তের কবিতা পাঠে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। নিজস্ব রস সংস্কার ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন, প্রতিবাদী চেতনা থেকে কবি কখনো বিচ্যুত হনান ---'মানুষ্যের জন্য শিল্প' এই প্রত্যয় তাঁর অন্তরে বদ্ধমূল ছিল। কিন্তু যাদের জন্য এ সৃষ্টি, তাদের সংস্কৃতির বৃত্তকে স্পর্শ করার সুতীব্র বাসনা যে কবি মানসে ক্রমশঃ দানা বাঁধছিল তা উপলব্ধিতে জাগ্রত হয়। সুকান্তের কবিতার বৈশিষ্ট্য, ছন্দ প্রয়োগের বিশিষ্টতা, কবিতায় রবীন্দ্র প্রভাব কাব্য রচনার ক্ষেত্রে গতিপরিবর্তন প্রক্রিয়া নিঃসন্দেহে লোক সংস্কৃতির জগতের প্রভাব আমাদের নতুন করে ভাবায়।

উল্লেখ পঞ্জী

১) সুকান্ত সমগ্র (সারস্বত লাইব্রেরী) ১৯৮৮ (ত্রয়োদশ মুদ্রণ)

২) লোকসাহিত্য ---আসরাফ সিদ্দীকী(মুক্তধারা, বাংলাদেশ,)

৩) লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা -যাবতীয় সংখ্যা (সম্পা, ড॰ সনৎ কুমার মিত্র)



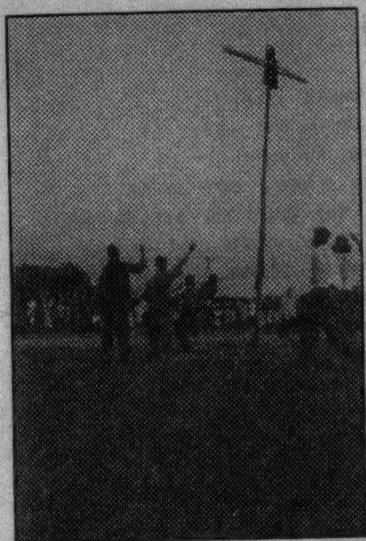




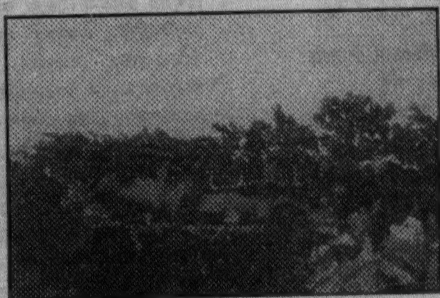
শোভারাম সরকার সন্ন্যাসী ও অর্দ্ধনারীশ্বর প্রতিমা ।



শোভারাম সরকার সন্ন্যাসী একজন ভক্ত্যার হাতে লৌহ-শলাকায় বিদ্ধ করছেন



পিঠে বড়শী বিঁধিয়ে একজন ভক্ত্যাকে চড়কে ঘোরানো হচ্ছে। ছবি ঃ লেখক



দায়ের উপর শুয়ে রয়েছেন চড়ক ভক্ত্যা সাচনী দাশ ছবিঃ লেখক



দুর্গাচরণ সন্ন্যাসী চড়ক সম্পর্কে লেখকের কাছে চড়ক সম্পর্কিত তথ্যাদি পেশ করছেন। ছবিঃ লেখব



'গড়িয়া' দেবতা ক্রমে মূর্তিরূপ পাচ্ছেন।